Contents

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহ.)

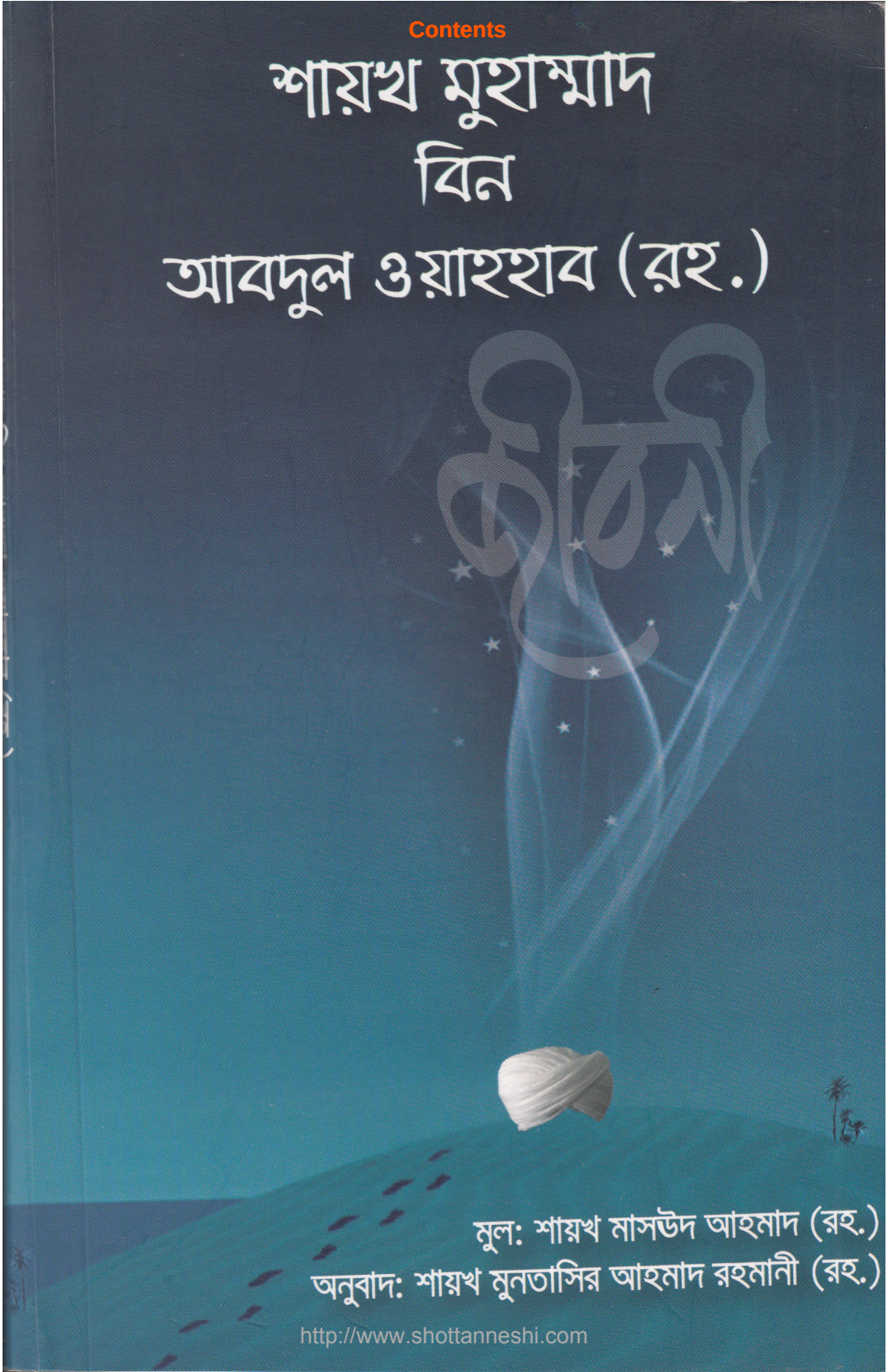

মুল: শায়খ মাসউদ আহমাদ (রহ.)
অনুবাদ: শায়খ মুনতাসির আহমাদ রহমানী (রহ.)

http://www.shottanneshi.com

Contents

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হ)

মূলঃ
আল্লামা মসউদ আলম নদভী

অনুবাদঃ মুন্‌তাসির আহমদ রহমানী

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

http://www.shottanneshi.com

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

মূল: আল্লামা মসউদ আলম নদভী

অনুবাদ: মুন্‌তাসির আহমদ রহমানী

দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০১৫

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

সর্বস্বত্ব: অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

মূল্য: ১২০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স.

২/১, তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

http://www.shottanneshi.com

উৎসর্গ

পিতৃতুল্য মুরব্বী ও পরম হিতৈষী আল্লামা মাওলানা হোম্মাদ আকরম খাঁ সাহেবের নামে-

যাঁর পিতৃস্নেহ অন্তঃসারশূন্য এই দ্বীন-সেবকের জীবনের দিক-দিশারী হয়েছে, যাঁর পরামর্শ ও অভিভাবকত্ব আমার মধ্যে লিখন ও পঠনের উৎসাহ বর্ধিত করেছে এবং যাঁর প্রতিষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় বাংলা দৈনিকের সম্পাদকীয় লেখার যোগ্যতায় পৌঁছিয়েছে।

তাঁরই নামে ভক্তি সহকারে আল্লাহর জন্য অকিঞ্চনের শ্রমের ফল উৎসর্গ করার গৌরব লাভে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

দীন সেবক-
মুন্‌তাসির আহমদ রহমানী

http://www.shottanneshi.com

مقدمة

الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام والصلوة والسلام على رسوله الذي خلص الدعوة إليه – وبعد :

ولقد اقبضت حكمة الباري سبحانه ان قيض للإسلام منذ عهد الرسالة دعاة مصلحين من أصحاب الغر الميامين الذين كان لهم قصب السبق في الذب عن حياض الإسلام والدفاع عن السنة المطهرة ومن هؤلاء الدعاة الإمام المصلح مجدد القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن عبد الوهاب- تغمده الله بشابيب رحمته- الذي قام بدعوة إصلاحية عظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة، وذلك حينما عمت البدع والمنكرات والبسب الوحدانية ثوب الخرافات وكثر قشور الصوفية وطوائف الفقراء حتى طغت وطمت في الجزيرة العربية وانتشرت فيها وتهافت عليها الناس تهافة الفراش على النار

وقد نجحت دعوة الشيخ – فلله الحمد على ذلك – التي كانت تستهدف على ضرورة العودة للكتاب والسنة الصحيحة وحققت أثارا عظيمة رغم كثرة أعدائها ومعارضيها اثناء قيامها واثمرت ثمرات عظيمة بمساعدة الحكومة السعودية – حفظها الله من كيد الأعداء- بحيث لم تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المقضلة، وللأسف ان دعوة الشيخ مع انتشارها على ارجاء العالم وربوع البلاد قد خفيت لدي كثير من المسلمين بسبب مقاومتها من قبل أعدائها الذين وقفوا في طريقها جهلا

http://www.shottanneshi.com

عنها وعن حقيقتها وعنادا على الداعية واهدافها السامية لتعصبهم البغيض، وكذلك ان طريقة أهل التصوف تسيطر على هذه الارض، ومعظم الحكام والمسئولين على أوهام سمعوها من الأدعياء الجهلاء مما لا صلة لها مع هذه الدعوة والداعية- فمثل هذه الظروف الصعبة – نرى ان لهذا الكتاب (حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رح) الذي قام بتاليفه الأستاذ مسعود عالم الندوي باللغة الأردية ونقله إلى اللغة البنغالية فضيلة شيخ الحديث بمدرسة الحديث بداكا العاصمة والمدير المساعد للجريدة اليومية "أزاد" الصادرة من عاصمة بنغلاديش في اللغة المحلية الأستاذ منتصر أحمد الرحماني يكون أثرا ملموسا في إزالة الشبهات التي تثار على هذه الدعوة السلفية من قبل أعدائها الجاهلين المغرضين الذين أوهنوا شوكة الإسلام والمسلمين وقووا أعداء الدين – فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

والله سبحانه وتعالى أسئل أن ينفع بهذه الترجمة المسلمين ويجعلها كاصلها وأن يجنبنا وسائر إخواننا المهتدين بما يفعله سواد الناس ودهما، العامة من البدع والمحثات ويرزقنا التمسك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة فهما مصدر كل عز وفلاح ونجاح في الدارين إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبد المتين عبد الرحمن السلفي مبعوث رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض إلى بنغلاديش	تحرير: ١٩/٨/١٩٨٣م

http://www.shottanneshi.com

ভূমিকা

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব বর্তমান জগতে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। বৎসর দু' পূর্বে সউদী আরবের রাজধানী রিয়াযে তাঁর জীবন, কর্ম ও অবদানের উপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, এতে মুসলিম জাহান ও বহির্বিশ্বের খ্যাতনামা পন্ডিতবর্গ ও বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন এবং শায়খের সংস্কারমূলক তৎপরতা, তাঁর সাফল্য এবং অবিস্মরণীয় অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করে তাঁদের উপলব্ধিজাত সপ্রশংস বক্তব্য রাখেন। কিন্তু চিরদিন এমনটি ছিল না। আজকার দিনে তিনি অভিনন্দিত অথচ তিনি ছিলেন বহু নিন্দিত।

এখন এটা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনের মূল কথা ছিল ইসলামের প্রাথমিক মৌল শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন, কুরআন ও সুন্নায় তওহীদ-ভিত্তিক যে শিক্ষা এবং জীবন বিধান বিধৃত রয়েছে, মুসলিম সমাজ বাইরের নানা প্রকার অপপ্রভাব এবং সৃষ্ট বিভ্রান্তির ফলে তা হতে অনেক দূরে অপসৃত হয়ে ঘৃণিত অনাচার ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে তাদের প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। ইসলামের জন্মভূমি ও লীলা নিকেতন আরব দেশেও তওহীদ-বিরোধী ভাবধারা মুসলিম জনমনে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে। তারা ওলী আওলিয়াদের মাযারকে কেন্দ্র করে শির্ক ও বিদআতের জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। কোন কোন বৃক্ষ পর্যন্ত সম্মানের বস্তু ও পূজার বেদীতে পরিণত হয়। ইসলামের রুকন আরকান ও শরীয়তের বিধি-বিধান পরিত্যাগ করে মুসলমানগণ তাবীজ-কবজ ও তাসাউফের সম্মোহনে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়। তারা ফকীর দরবেশদের তন্ত্রমন্ত্র ও ভেলকীবাজীর শিকারেও পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় এমনি তমসাচ্ছন্ন এক পরিবেশে আরবের এক উষর অঞ্চল–নজদ প্রদেশ আল্লাহর রহমতের প্রতীকরূপে জন্মগ্রহণ করলেন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব। উপযুক্ত উসতাযের নিকট কুরআন ও হাদীসের প্রাণ-সঞ্জীবনী শিক্ষায় দীপ্ত এই তেজস্বী অগ্নি পুরুষ হিজরী অষ্টম শতকের মুজাদ্দিদে ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রাম-মুখর জীবনের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি তাঁর সম্মোহিত ও বিভ্রান্ত দেশবাসীকে সর্বপ্রকার শির্ক ও বিদআত পরিহার এবং খালেস তওহীদ ও নির্ভেজাল সুন্নার অনুসরণের আহবান জানান। তাঁর এই আহবানে তিনি অকুণ্ঠ সহায়ক এবং অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষকরূপে প্রাপ্ত হন এক ঐতিহ্যবাহী রাজশক্তিকে। আলে সউদ নামে

http://www.shottanneshi.com

প্রসিদ্ধ এই রাজবংশ তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও সকল প্রকার বিরোধিতার মুকাবেলায় দুর্জয় পণ ও দুর্ধর্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেন। কলম ও তলোয়ারের সংযোগ, জ্ঞান-বিস্তার ও সংগ্রাম-সাধনার সম্মেলনের ফলে এই সংস্কার আন্দোলন শনৈঃ শনৈঃ সমগ্র আরব ভূমিতে প্রাধান্য স্থাপন এবং মুসলিম জাহানে প্রভাব বিস্তার করে চলে। এই সাফল্য অবলোকনে মুসলিম জাহানের পীরভক্ত ও কবর-পূজকের দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। অপর দিকে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমিকা ও বিপ্লবী অগ্নিমন্ত্র এবং তার অভিবিত সাফল্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দর্শনে তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংরেজ ও ফরাসী এবং তুরস্কের সুলতান ও মিসরের খেদিব ও পাশাগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এদের সমবেত চক্রান্ত এবং আক্রমণমূলক তৎপরতার ফলে নব জাগ্রত এই ইসলামী শক্তির অগ্রগতি সাময়িকভাবে ব্যাহত এবং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আরব রাজ্যসহ সমগ্র মুসলিম জাহানে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তার প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে দুরভিসন্ধিমূলক জঘন্য মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হয়। ফলে মুসলিম জগতে, বিশেষ করে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে অর্থাৎ আজকের বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে তথাকথিত ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ওয়াহ্হাব একটি গালি এবং ওয়াহ্হাবীয়ত একটি ঘৃণা এবং ত্রাসের বস্তুতে পরিণত হয়।

কিন্তু মিথ্যা দীর্ঘদিন সত্যকে ঢেকে রাখতে পারে না। সত্যের জ্যোতিঃ মিথ্যার অন্ধকারকে ভেদ করে অবশেষে দেদীপ্যমান হয়ে উঠে। একই শাশ্বত নিয়মে সত্যের কিরণচ্ছটায় মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তাঁর কুরআন ও হাদীস-ভিত্তিক চিন্তাধারা ও কর্মকান্ড সম্পর্কে স্বার্থবাজদের সৃষ্ট কুজ্ঝটিকা অনেকটা অপসারিত হয়। এক্ষণে বহু নিন্দিত 'দাজ্জাল'(!) মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব একজন সত্যিকার মুজাদ্দিদে ইসলাম এবং বিপ্লবী সংস্কারকরূপে বহু নন্দিত। তাঁর রচিত আকীদামূলক এবং সংস্কার সংক্রান্ত মূল্যবান গ্রন্থাবলী পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত এবং তাঁর কর্মময় ও সংগ্রামমুখর জীবনালেখ্য বিরচিত ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার ফলে মিথ্যা অপসৃত ও সত্য প্রতিভাত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

উপমহাদেশে উর্দু ভাষায় তাঁর গ্রন্থাদির অনুবাদ ছাড়াও তাঁর প্রমাণসিদ্ধ ও দলীল-নির্ভর জীবনালেখ্য রচনা ও প্রকাশনার কাজ বহু পূর্বেই শুরু হয়েছে। বাংলা ভাষায় এত দিন পত্র পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে

http://www.shottanneshi.com

ছিটাফোঁটা আলোচনা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়নি। অতি সম্প্রতি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই বিপ্লবী অগ্নিপুরুষের প্রকৃত ঈমান, আকীদা, শিক্ষা ও অবদান এবং তাঁর আন্দোলনের সঠিক পরিচিতি, তাঁর গতিধারা, সাফল্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন প্রমাণ-নির্ভর ও তথ্যমূলক জীবনী গ্রন্থ এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। অথচ এখন তাঁকে সঠিকভাবে জানার এবং তাঁর আন্দোলন অবহিত হওয়ার একটা কৌতুহল এবং এতে প্রেরণা লাভের বাসনা এই দেশের জ্ঞান-পিপাসু ও ইসলাম-কর্মীদের মধ্যে জাগ্রহ হয়েছে।

অত্যন্ত প্রয়োজন মুহূর্তেই আমাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও সহযোগী দৈনিক আজাদের সহকারী সম্পাদক এবং ঢাকাস্থ মাদরাসাতুল হাদীসের প্রধান মুদার্‌রিস জনাব মওলানা মুনতাসির আহমদ রহমানী এই প্রয়োজন পূরণের জন্য এগিয়ে এসেছেন।

প্রায় দেড় যুগ পূর্বে পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেবের উৎসাহ প্রেরণায় তিনি হিন্দুস্থানের প্রখ্যাত আলিম, লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক ও গবেষক মরহুম মওলানা মসউদ আলম নদভীর সুলিখিত "মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব- এক মায়লূম ও বদনাম মুসলেহ" এই বহু বিশ্রুত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ শুরু করেন এবং তা ধারাবাহিকভাবে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হয়। এতদিন এই অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ দৈনিক আজাদের পৃষ্ঠাতেই শৃঙ্খলিত ছিল। এক্ষণে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হল- ফাল্‌হামদু লিল্লাহ।

এই গ্রন্থ পাঠে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতুহল নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহ্হাবিয়াত সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হবে– এ বিশ্বাস আমরা দৃঢ়ভাবে পোষণ করি। অধিকন্তু এক সাফল্য ধন্য ইসলামী বিপ্লবের অগ্রপথিকের এই জীবনালেখ্য ইসলাম-কর্মীদের কর্ম প্রেরণার উৎসরূপে প্রতিপন্ন হবে।

ইসলামী বিপ্লবের ঐতিহাসিক তথ্যমূলক এ ধরণের গ্রন্থের যত বেশী প্রচার হয় ততই মঙ্গল। আল্লাহ্ এ গ্রন্থের স্বনামধন্য মূল লেখক এবং তাঁর সাহসদৃপ্ত অনুবাদক ও প্রকাশককে তাদের সাধনা, শ্রম ও শুভ উদ্যোগের জন্য জাযায়ে খাইর প্রদান করুন! আমীন।

মুহাম্মদ আবদুর রহমান
সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত

http://www.shottanneshi.com

অনুবাদকের নিবেদন

১৯৩৯-১৯৪৫ সালে দিল্লীতে অধ্যয়নকালে শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের কিছু কিছু জীবনী পাঠ করার সুযোগ আমার হয়। ফলে তখনই আমি শায়খের কিছুটা অনুরক্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর বাংলা ভাষাভাষী জ্ঞানীগুণীদের কিছু লেখা দেখার সুযোগ ঘটে এবং তাতে শায়খ সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণার সমাবেশ আমার মনকে ব্যথিত করে তোলে এবং তার প্রতিকারের একটি ক্ষীণ আশা হৃদয়ে পোষণ করি। কিন্তু সুযোগ ও সময়ের অভাবে তা বাস্তবায়নের তওফিক লাভ হয়ে উঠেনি।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বাংলা-ভারত-পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও নেতা আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের সংস্পর্শে আসার আমার সুযোগ ঘটে এবং তাঁর বিরাট লাইব্রেরীর ক্যাটালগ তৈরী করার সময় শায়খের জীবনী (অনূদিত) গ্রন্থখানা আমার হস্তগত হয় এবং তাতে আমার মনের মণিকোঠায় লুক্কায়িত অনেক কিছু পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। বিশেষতঃ শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি এবং পক্ষে ও বিপক্ষের সকল ভ্রান্ত ধারণার সুষ্ঠু জবাব দেখে আমার মনে এটিকে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বিশেষ উপকারী মনে করে এর বঙ্গানুবাদের সংকল্প গ্রহণ করি এবং পিতৃতুল্য মুরব্বী মাওলানা সাহেবের পরামর্শ চাই। তিনি এই ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন, ফলে আল্লাহর নামে এর অনুবাদ শুরু করে দেই। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস হতে উক্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রমাণ পঞ্জী সম্বলিত শেষ অধ্যায় ছাড়া সমস্তই দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য যে, এই সময়ে আজাদের লেখা পাঠ করে কতিপয় বন্ধু চট্টগ্রাম ও গওহরডাঙ্গা, ফরিদপুর হতে কিছুটা আপত্তি ও কতিপয় প্রশ্ন তুলে চিঠি লেখেন। অনূদিত পুস্তকের পরিশেষে তার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হয়েছে।

আমার অর্থাভাব ও ব্যস্ততার জন্য এতদিন পর্যন্ত পুস্তকাকারে তা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি। ঢাকার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের আর্থিক সহযোগিতায় এখন তা সম্ভব হয়েছে। আমি সেই জন্য তাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও বইটির কোন কোন স্থানে

http://www.shottanneshi.com

কিছুটা ভুল রয়ে গেছে। তাই সহৃদয় পাঠক পাঠিকার খিদমতে তজ্জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে পরবর্তী সংস্করণে এটির সংশোধনের আপ্রাণ চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এ কাজে আমি যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছি তা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে আর ত্রুটি বিচ্যুতির সমুদয় দায় দায়িত্ব আমার।

পরিশেষে এই পুস্তকের আরবী ও বাংলা ভূমিকা লেখে দেয়ার জন্য পরম শ্রদ্ধেয় মওলানা আবদুল মতীন সালাফী ও জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারী, আরাফাত সম্পাদক মাওঃ আবদুর রহমান সাহেবের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিনীত
অনুবাদক

http://www.shottanneshi.com

লেখক পরিচিতি

আল্লামা মসউদ আলম নদভী বাংলা-পাক-ভারতের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের একজন। ভারতের বিশ্ববিখ্যাত নদওয়াতুল ওলামার তিনি ছাত্র ও বিশিষ্ট শিক্ষক এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলেম সৈয়দ সোলায়মান নদভীর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন।

পাটনার আওয়াঁ নামক গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলেম ছিলেন। পিতার দিক দিয়ে তিনি হানাফী মতাবলম্বী হলেও মাতার দিক হতে তিনি ছিলেন আহলে হাদীস। তাঁর নানা মওলানা আবদুস সামাদ বিশিষ্ট আহলে হাদীস আলেম ছিলেন। তিনি (গ্রন্থকার) একাধারে সুসাহিত্যিক ও লেখক ছিলেন। তিনি নদওয়া হতে প্রকাশিত আরবী সাপ্তাহিক (القضاء) এবং পাটনা হতে প্রচারিত আল হেলাল সাপ্তাহিকের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। কিছুদিন আরবী সাপ্তাহিকের সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি পালন করে গেছেন। আলোচ্য পুস্তক পাঠে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও বিশেষ পান্ডিত্যের পরিচয় পাঠক লাভ করবেন, সন্দেহ নেই। আমরা তাঁর এই মূল্যবান পুস্তক অনুবাদের সুযোগ লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বিনীত
অনুবাদক

http://www.shottanneshi.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
উৎসর্গ	3
ভূমিকা	6
অনুবাদকের নিবেদন	9
উপক্রমণিকা	17
গ্রন্থকারের নিবেদন	21
অনুবাদক পরিচিতি	23
প্রথম অধ্যায়	25
ব্যক্তিগত অবস্থা	25
মুসলিম সমাজের উন্নতির যুগে আরব উপদ্বীপ	25
মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের আবির্ভাব	26
ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের জন্মকালে মুসলিম জাহানের অবস্থা	27
ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের পূর্বে নজদের অবস্থা	29
জন্ম ও বংশ পরিচয়	31
প্রতিপালন বা শৈশব কাল	32
শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা	33
দাওয়াত ও তবলীগ	36
হিঃ ১১৫৭/১৭৪৪ সালে উয়ায়নায়	39
উয়ায়না হতে বহিষ্কার	42
দরঈয়ায় ১১৫৭-৮ হিঃ	45
আমীর মোহাম্মদ বিন সউদের সহযোগিতা	46
ভক্তদের প্রথম দল	47
ওসমান বিন মোআম্মরের দ্রুত অনুশোচনা	48
কর্মতৎপরতার যুগ	49
আন্দোলনের সম্প্রসারণ	50
ব্যাপক প্রচার	51
ইবনে দৌওয়াস ও অন্যান্য বিরোধীগণ	53

http://www.shottanneshi.com

Contents

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের ইন্তেকাল	55
একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য	55
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য	56
শায়খের সন্তান সন্ততি	57
একটি বৈশিষ্ট্য	67
দ্বিতীয় অধ্যায়	68
রাজনৈতিক প্রাধান্য	68
মোহাম্মদ বিন সউদ	68
হজ্ব নিষিদ্ধকরণ	69
আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ বিন সউদ	70
হজ্জ নিষিদ্ধ হওয়ার পর ১১৮৩ হিঃ/১৭৬৯ খ্রীঃ প্রথম হজ্জ	70
নজদের প্রথম প্রতিনিধি দল	71
দুর্ভিক্ষ ও হজ্জের সাধারণ অনুমতি ১১৯৭-১৭৮৫	73
নজদের দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল ১২০৪ হিঃ ১৭৫০ খ্রীঃ	74
নজদের তৃতীয় প্রতিনিধিদল	76
যুদ্ধের পর আপোষ (১২১৩ হিঃ)	78
১২১৩ হিজরীর হজ্জ	79
১২১৪ হিজরীতে হজ্জ	80
১২১৫ হিজরীর হজ্জ	80
১৮০২ খ্রীঃ ১২১৬ হিজরীতে কারবালা আক্রমণ	81
চুক্তিপত্র বাতিল ১২১৭ হিঃ	83
বিজয়ী বেশে মক্কা প্রবেশ	84
আমীর আবদুল আযীযের শাহাদাৎ (রজব ১২১৮ হিঃ)	86
সউদ বিন আবদুল আযীয ১২১৮-১২২৯ হিঃ	88
১৮০৬ খ্রীঃ এবং ১২২০ হিজরীতে পুনরায় মক্কা বিজয়	89
সউদের তৃতীয় হজ্জ ১২২১ হিঃ -১৮০৭ খ্রীঃ	90
হজ্জ ও সংস্কার	91

http://www.shottanneshi.com

Contents

বিষয়	পৃষ্ঠা
কতিপয় সংগ্রাম ও বিজয়	93
১২২৪ হিজরীতে রা'সূল খীমা	94
মিসরীয় আক্রমণঃ (১২২৬ হিঃ ১৮১১ খ্রীঃ)	95
সউদের ইন্তেকাল (১২২৯ হিঃ ১৮১৪ খ্রীঃ)	99
সউদের চরিত্র মহিমা	99
আবদুল্লাহ বিন সউদ বিন আবদুল আযীয হিঃ ১২২৯-১২৩৩ পর্যন্ত ১৮১৪-১৮১৮ খ্রীঃ	102
আপোষ ও প্রতারণা	103
মিসরে আবদুল্লার দূত	105
ইব্রাহীম পাশা	108
দরঈয়ার পতন	110
আবদুল্লাহ বিন সউদের পরিণাম	110
অন্যান্য লোকের পরিণাম	111
দরঈয়ার সর্বনাশ	114
বৃটিশ সরকারের মোবারকবাদ এবং সাহায্যের প্রস্তাব	114
দরঈয়া সম্পর্কে শোকগাথা	118
মিসরীয় বিজেতা	120
মোহাম্মদ আলীর প্রতারণা ও অত্যাচার	122
তৃতীয় অধ্যায়	124
শায়খুল ইসলামের গ্রন্থাবলী	124
১। কিতাবুত তাওহীদ	126
২। কশ্ফুশ্শুবহাত মিনাত্ তওহীদ	128
৩। আল অসুলুস সালাসাহ্ ও তাহার প্রমানাদি	129
৪। শুরুতে সালাত (شروط الصلاة) ও আরকানেহা	129
৫। আরবায়া কাওয়ায়েদ বা নীতিচতুষ্টয়	129
৬। অসূলে ঈমান	130
৭। কিতাবু ফযলিল ইসলাম	130

http://www.shottanneshi.com

Contents

বিষয়	পৃষ্ঠা
৮। কিতাবুল কাবায়ের	130
৯। নসীহাতুল মুসলেমীন	130
১০। সিত্তাতু মাওয়াযেয়া মিনাস সীরাতে	131
১১। সূরা ফাতেহার তাফসীরঃ সূরা ফাতেহার সংক্ষিপ্ত তফসীর।	131
১২। মাসায়েলুল জাহেলীয়াহ্	131
১৩। তফসীরুশ শাহাদৎ	131
১৪। আত্ তাফসীর আলা বা'যে সুওয়ারিল কুরআন	131
১৫। কিতাবুস্ সীরাত্	132
১৬। আল হাদয়ুন নববী	132
চতুর্থ অধ্যায়	133
দা'ওয়াত	133
রাজনীতির অপকারিতা	133
শায়খের মাযহাব	134
শায়খের আকীদা	137
তৌহীদ ও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ	141
১। বিপদ আপদের সময় আল্লাহ ছাড়া অপরকে আহ্বান করা অথবা আল্লাহর সাথে অপরের নামও উচ্চারণ করা	142
২। গাইরুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা	143
৩। তাওস্সুল	144
৪। ইস্তেআযাহ	146
৫। আল্লাহ ছাড়া অপরের কসম খাওয়া	147
৬। কবর যিয়ারত	148
পঞ্চম অধ্যায়	151
মিথ্যা বিবরণ ও অমূলক ভ্রান্ত অপবাদ	151
ওয়াহ্হাবীয়াত	151
সর্বপ্রথম অপবাদ রটনাকারী	155

http://www.shottanneshi.com

Contents

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্যান্য সমসাময়িক ও তাদের গালিগালাজ	156
অপবাদের দৃষ্টান্ত	157
(ক) নবুওতের দাবী	157
(খ) হাদীসের অস্বীকার	159
(গ) তকফীর ও মুসলিম হত্যা	160
(ঘ) সাধারণ ভিত্তিহীন বিবরণ	168
(ঙ) কুব্বায়ে নববীর বিধ্বস্তি বা রসূলুল্লার কবর ভাঙ্গার অপবাদ	169
জনৈক ওয়াকেফেহাল ইংরেজের সাক্ষ্য	170
একটি বিস্ময়কর অপবাদ	171
ষষ্ঠ অধ্যায়	172
গ্রন্থপঞ্জী ও সাহিত্য	172
পরিশিষ্ট	191
নজ্দ প্রসঙ্গে ভ্রান্ত ধারণা	191

http://www.shottanneshi.com

উপক্রমণিকা

।। এক ।।

কতই না বিস্ময়কর এই বিশ্ব-কারখানা! সৈয়দ আহমদ শহীদের ইমামত ও সংস্কার আন্দোলন এবং তাঁর সহকর্মীগণের জীবনী সঙ্কলনে ইচ্ছুক লেখক সহজেই তা সঙ্কলনে সাফল্যমন্ডিত হন। কিন্তু শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের জীবনী সঙ্কলনকারী সহজে সাফল্য লাভ করতে পারলেন না। এ বিস্ময়কর ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ১৯৩৫ সালে দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার দু জন ছাত্র (আলেম) হজরত সৈয়দ আহ্মদ শহীদ ব্রেলবী ও মওলানা ইছমাঈল শহীদ (রঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে একজন হযরত সৈয়দ ব্রেলবীর জীবনী সঙ্কলনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আর অপর ব্যক্তি বালাকোটের শাহাদৎ প্রাঙ্গন হতে শুরু করার ইচ্ছা করলেন।

উভয়ে একই সঙ্গে কাজ আরম্ভ করলেন। আমার পরম বন্ধু মওলানা আবুল হাসান সৈয়দ আলী হাসান নদভী (দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার তফসীর ও সাহিত্যের অধ্যাপক) অল্প দিনের মধ্যে তাঁর গ্রন্থ "ছীরতে সৈয়দ আহ্মদ শহীদ" প্রণয়ন সম্পন্ন করেন এবং তা যথাশীঘ্র প্রকাশিতও হয়। দেখতে দেখতে স্বল্প দিনের মধ্যে তাঁর দুই সংস্করণ শেষ হয়ে যায়।

আমিও যথা সময়ে কাজ শুরু করি। কিন্তু পদে পদে নানা বাধার সম্মুখীন হই। চলার পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠে। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যাঁরা ছিলেন অভিজ্ঞ বা প্রত্যক্ষদর্শী একে একে তাঁদের সকলেই আজ চিরনিদ্রায় শায়িত। শ্রোতাদের মধ্যে এখনও ভীতির সুস্পষ্ট চিহ্ন দেদীপ্যমান। তবে চেষ্টার বিরতি ঘটে নাই। অন্বেষণ ও তথ্যানুসন্ধানের প্রাথমিক নিদর্শনস্বরূপ অধুনালুপ্ত "আজযীয়া" সাময়িকীতে (শাবান ৫৮ হিঃ) 'আল হরকাতুল ওয়াহ্হাবীয়াতুস সিয়াসিয়াহ্' (الحركة الوهابية السياسية) শীর্ষক এবং পাটনা হতে প্রকাশিত আল হেলাল পত্রিকায় "ওয়াহ্হাবীয়ত একটি দ্বীনী ও রাজনৈতিক আন্দোলন" শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত এবং বিশেষ মহলে সমাদৃত হয়।

http://www.shottanneshi.com

আলোচনা ও পর্যালোচনাকালে নজদের ওয়াহ্হাবী আন্দোলন (যেমন সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে) সম্পর্কীয় আলোচনা বারংবার দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাতে এরূপ মিথ্যা বিবরণ ও অপবাদের বিপুল সমাবেশ দেখতে পাই, যাতে ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম হওয়ার উপক্রম ঘটে। সর্বাপেক্ষা সে মারাত্মক ভ্রান্তিতে শত্রুমিত্র উভয় পক্ষই পতিত হয়েছেন, তা হল তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা যে, পাক ভারতের "ওয়াহ্হাবী আন্দোলন" অর্থাৎ হজরত সৈয়দ সাহেবের সংস্কার আন্দোলন নজদের ওয়াহ্হাবী আন্দোলনেরই একটি শাখা মাত্র।

উভয় আন্দোলনের উৎস ও উদ্দেশ্য যে এক ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই এবং উভয় আন্দোলনের প্রবর্তনকারীরা কিতাব ও সুন্নতের পতাকাবাহী এবং একইরূপ কর্মতৎপরতার মোজাহেদ ছিলেন। তথাপি এটা চির সত্য যে, উভয় আন্দোলনের মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্ক নাই এবং একটি অপরটি হতে কোনরূপে উপকৃত হয়নি। উভয় আন্দোলন সম্পূর্ণ আলাদা এবং নিজ নিজ বিশেষ পরিবেশে প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়। কিতাব ও সুন্নতের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বানের মৌলিক ঐক্য সত্ত্বেও দু'টি আন্দোলন নিজ নিজ বিশেষ স্থানীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।

পূর্বেই বলেছি, নজদের সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে যে বিপুল পরিমাণ ভ্রান্তিকর বিবরণ দেখতে পাই, তাতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং এরই পরিণামস্বরূপ আলোচ্য পুস্তকটি দু' খন্ডে ভাগ করতে হয়। শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নজদীর জীবনী ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কীয় আলোচ্য অংশ পরিকল্পিত গ্রন্থের ১ম খন্ড আর দ্বিতীয় খন্ডে পাক ভারতের সংস্কার আন্দোলন ও জেহাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস[১] বিবৃত হবে। এতে সৈয়দ সাহেবের শাহাদাৎ বরণ (১৮৩১/১২০৬ হতে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের সকল তৎপরতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের পূর্ণ বিবরণ পেশ করার চেষ্টা করা হবে।

(দুই)

এ প্রসঙ্গে গোড়াতেই সুস্পষ্টভাবে বলে রাখা ভাল যে, নজদী ওয়াহ্হাবীয়ত অথবা পাক ভারতের আন্দোলনের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য

---

[১] হিন্দুস্তান কি পয়লী ইছলামী তাহ্রীক-পাক ভারতের প্রথম ইসলামী আন্দোলন।

http://www.shottanneshi.com

এই নয় যে, শুধু এই দু'টি আন্দোলনেই সত্য নিহিত ও সঙ্কুচিত অথবা বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থার ন্যায় এই দুই আন্দোলনকে আমরা কোন ফেক্হী নির্দিষ্ট মতাবলম্বী[২] অথবা সংস্থারূপে উপস্থাপিত করছি– যদিও উক্ত আন্দোলনের কোন উৎসাহী কর্ম্মী ও ভক্ত অনুরূপ ধারণা করতে পারেন। কিন্তু আমরা এরূপ সঙ্কীর্ণতা ও দলগত মনোভাবকে ইসলাম এবং মোসলমানের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক মনে করি। আমাদের মতে শুধু কেতাব ও সুন্নতের অনুসরণেই প্রকৃত সত্য নিহিত। আমরা কোন ফেক্হী গন্ডী এবং আদর্শগত সমষ্টিকে অথবা কোন দল বিশেষকে সত্য ও হেদায়াতের ঠিকাদার বলে স্বীকার করি না বরং আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা সুস্পষ্ট, যাঁরা যথাযথভাবে তাঁর অনুসরণ করবে তারাই সঠিক পথের সন্ধান এবং সফলতা লাভ করবে।

নজদ ও বাংলা-পাক-ভারতের এ দুটি জমাতের ইতিহাস প্রণয়ন এবং তাদের বিস্মৃতপ্রায় তৎপরতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, হিজরী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের এই দু'জন বিখ্যাত সংস্কারক এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের জীবনী আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। আমরা এও দাবী করছি না যে, উক্ত শতাব্দীদ্বয়ে শুধু এই দু' জন সংস্কারকই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বরং হিন্দুস্তানে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (১১১৪-১১৭৬) এবং ত্রিপলীতে মোহাম্মদ বিন আলী (সান্নুসী) (হিঃ ১২০২-১২৭৬/১৭৮৮-১৮৬০) স্ব স্ব সংস্কারের মাহাত্ম্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এখানে বলা যেতে পারে যে, সৈয়দ সাহেবের আন্দোলন মূলতঃ শাহ্ সাহেবের আন্দোলনের নূতন ও ব্যাপকতর সংস্করণ ছিল। কিন্তু একথা স্বীকার করে নিলেও সৈয়দ সাহেরের আন্দোলনের বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করার উপায় নেই। অনুরূপভাবে সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী (মৃতঃ হিঃ ১৩১৫/১৮৯৭ ইং) এবং আমীর আবদুল কাদের জর্যাঙ্গরীও (মৃতঃ হিঃ ১৩০০/১৮৮৩ ইং)

---

[২] অর্থাৎ আমরা ইমাম চতুষ্টয়ের তকলিদেই সত্য নিহিত বলে মনে করি না এবং দেওবন্দ, জামে আজহার অথবা নদওয়ার অধ্যাপকমণ্ডলী ও শেখগণের অনুসরণেই সত্য সুনির্দিষ্ট বলে বিশ্বাস করি না এবং নেতৃত্বকে কোন গোত্র অথবা দেশের উত্তরাধিকারী স্বত্ব বলেও মনে করি না।

http://www.shottanneshi.com

তাদের সংস্কার বৈশিষ্ট্যে বিপুল সংখ্যক লোকের আস্থাভাজন ও আনুগত্যের মর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন এবং তা যথার্থই ছিল।

অনুরূপভাবে নজদ এবং হিন্দুস্তানের এই জামাতকে আমরা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত (মা'ছুম) অথবা তাঁদেরকে ভুলভ্রান্তি-মুক্ত মনে করি না। নজদবাসীদের বাড়াবাড়ি ও গোড়ামীর অভিযোগ বন্ধুরাও করে থাকেন। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, এই জমাতগুলি অতি নিষ্ঠাবান ছিল। তাঁর শুধু আল্লার জন্য উত্থান করেছিলেন। মানুষের সাধ্যানুসারে তাঁরা শুধু ই'লায়ে কালেমাতিল্লাহর ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাদের তৎপরতা বিবেচনা করা উচিত। শুধু শোনা কথায় শত্রু ভাবাপন্ন লোকের, অজ্ঞ মণ্ডলবীদের এবং জাহেল সুফীদের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে একটা ভুল ধারণা পোষণ করা সত্যান্বেষী কোন মানুষেরই অভ্যাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

আলোচ্য পুস্তকে আমরা নিজের মত প্রকাশে যথা সম্ভব বিরত থাকার চেষ্টা করেছি। সাধ্যানুসারে অনুসন্ধান করে অধিক বিশ্বস্ত প্রমাণপঞ্জীর ভিত্তিসমূহ ও আকীদাগুলি সঙ্কলন করার চেষ্টা করেছি। এতে যতটুকু সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি তা আল্লাহর অনুগ্রহেই হয়েছে, অন্যথায় আমার ন্যায় একজন পুঁজিহীন ছাত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি একান্তই স্বাভাবিক।

পরিবেশেষ আমাদের সঙ্কল্প ও সাধনাকে নির্ভেজাল এবং এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টাকে কবুল করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার হুজুরে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি।

برنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

আমিন!

দ্বীনহীন
মসউদ আলম নদভী,

পাটনা
৮ই জামাদিউল উলা
১৩৬১ হিঃ

http://www.shottanneshi.com

গ্রন্থকারের নিবেদন

"ক"

শাওয়াল ১৩৫৯ হিঃ/নভেম্বর ১৯৪০ সালেই আমি এই পুস্তক সঙ্কলনের কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। কিন্তু শিক্ষকতার গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য অধিক সময় সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছিল না। মন্থরগতিতে কাজ অগ্রসর হচ্ছিল। ১৩৬০ হিজরিতে সওয়াল মাসে অর্থাৎ ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রস্তুত হয়ে যায়। অবশ্য প্রমাণপঞ্জীর (গ্রন্থরাজীর) অভাবে মোসাবেদা সমাপ্ত করার সাহস করতে পারিনি। বারংবার পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। যা হোক, সম্ভাব্য অন্বেষণ ও পরিশ্রমের পরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজী সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি, প্রমাণপঞ্জীর বর্ণনায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

যে সমস্ত শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ও বন্ধুরা গ্রন্থ সংগ্রহ অথবা তার অনুসন্ধানে আমাকে সাহায্য করেছেন, আমি আন্তরিকভাবে তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে জনাব ডাঃ আজিম উদ্দিন পাটনা; অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকরী , পাটনা; মাওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী নদভী, কলিকাতা; মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ দাউদ গজনবী, লাহোর; ডাঃ শেখ মোহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ্ লাহোর; ডাঃ মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ্ হায়দরাবাদ; শরফুদ্দীন ও তার সন্তানবর্গ, বোম্বাই; মওলানা আবদুল মজিদ হারিরী; বেনারস; অধ্যাপক মোহাম্মদ আকরাম নদভী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; হেকীম হাফেয ইউসুফ হাসান খান বেহার শরীফ, পাটনা; প্রমুখের আন্তরিক শুকরিয়া আদায় করা আমার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। বস্তুতঃ তাঁদের সহায়তা না পেলে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করা আমার পক্ষে দুস্কর হইত।

এখানে নজ্দী আলেম শেখ মোহাম্মদ ইমরান বিন মোহাম্মদ বিন ইমরানের (রিয়াজ-নজ্দ) নাম উল্লেখ করা একান্ত জরুরী। তিনি বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে এ পুস্তক প্রণয়নের সংবাদ পেয়ে প্রথমে পত্রযোগে প্রীতি সম্ভাষণ জানান। অতঃপর বেনারসের পথে পাটনা আগমন করেন এবং গরীবালয়ে দুই দিন অবস্থান করেন। তিনি একজন মধ্যম শ্রেণীর আলেম এবং শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের সংস্কারকৃত নজ্দের অধিবাসী ছিলেন। কেতাব ও সুন্নতের অনুসরণের যে উদ্দীপনা ও কর্মস্পৃহা সেই জামাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে শ্রুত হচ্ছিল অন্ততঃ

http://www.shottanneshi.com

Contents

হিন্দুস্থানে এই শ্রেণীর লোক অতি বিরল। আমি তাঁর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হই। পরবর্তী নজদী আলেমগণের ইন্তেকালের নির্দিষ্ট সাল তিনি তাঁর স্মৃতিপট হতে অতি বিশ্বস্ততার সাথে বর্ণনা করেন। আমরা যেখানে তাঁর বর্ণনার উপর নির্ভর করেছি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উল্লেখ করেছি।[৩]

"খ"

আলোচ্য পুস্তক পাঠকালে নিম্নবর্ণিত অনুরোধগুলোর প্রতি লক্ষ রাখলে সুখের কারণ হবেঃ

১। বরাতের দীর্ঘতা হতে নিস্কৃতির জন্য অনেক সময় শুধু লেখকের নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। প্রমাণপঞ্জী হতে গ্রন্থ নির্দিষ্ট করা যাবে।

২। হিজরী সাল ও খৃষ্টাব্দের মিলন ঘটানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু যেখানে দিবস এবং মাসের নির্দিষ্ট তারিখ জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর হয়নি সেখানে হিজরী সনের মোকাবেলায় দু'টি ইংরেজী সাল দেওয়া হয়েছে।

৩। যেখানে "শায়খুল ইসলাম" অথবা "শায়খ" বলে উল্লিখিত হয়েছে তাহতে শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবকেই বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে আলে-শায়খ দ্বারা তাঁর বংশধরকেই বুঝানো হয়েছে যদিও সে দলের পুস্তকে (Literature) শায়খুল ইসলামের উপাধি সাধারণতঃ ইমাম ইবনে তায়মিয়া (মৃঃ ৭২৮) সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। আরবী এবং ইংরেজির উদ্ধৃতির শাব্দিক অনুবাদ করা হয়নি। তবে আসল উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয় তৎপ্রতি সজাগদৃষ্টি রাখা হয়েছে।

৫। পাশ্চাত্য নামসমূহের উচ্চারণে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কুত্রাপি অনুরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তা হলে অনুগ্রহপূর্বক লেখককে অবহিত করা উচিত। যে কোন প্রকার সংশোধন আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

গ্রন্থকার–

---

[৩] ১৯৪১ সালে এই কথাগুলি লিখিত হয়। অতঃপর ১৯৪৯ সালে রিয়াদ সফরের সুযোগ হয়। সেখানে শেখ মোহাম্মদ ইমরানের সাথেও সাক্ষাৎ হয় । অন্যান্য আলেমগণের সাথে আলোচনাকালে জানতে পারি যে, জনাব শেখ ইমরানের বর্ণিত মৃত্যু সনের সব সঠিক নয় । এ সংস্করণে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে।

http://www.shottanneshi.com

অনুবাদক পরিচিতি

জন্মঃ ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৩ ইং; ধনেহরি, পোঃ ঐ, মৌজা সোনাপুর, থানা- সোনাই, মহকুমা- শিলচর, জিলা-কাছাড়, আসাম। পিতার নাম- শেখ ওসমান গনি (মরহুম), মাতার নাম- বিলাতুন্নেসা, পিতামহ- শেখ মোহাম্মদ হোসাইন (রহঃ)

শিক্ষা জীবনঃ

প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় পাঠশালায়, তৎপর সাংজারই ও বাঁশকান্দী কওমী মাদরাসায় আরবি ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞানার্জন, ১৯৩৮-৩৯ সালে শিলচরের উধার বন্দে দ্বীনী পৌছে দু তা'লীম গ্রহণ, অতঃপর ১৯৩৯ সালে শিলচরের উধার বন্দে দ্বীনী পৌছে দুই তা'লীম গ্রহণ, অতঃপর ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লী গমন। দিল্লীর প্রখ্যাত দ্বীনী মাসরাসা দারুল হাদীস রহমানীয়ায় ভর্তি এবং উক্ত মাদরাসার শেষ পরীক্ষায় ১৯৪৫ সালে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সনদ লাভ।

কর্মজীবনঃ

১৯৪৫-৪৬ সালে দিল্লীর ফইয়াজিয়া ও রিয়াজুল উলূম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা, ১৯৪৬ সালে (রমযান মাসের) পূর্বে দেশে প্রত্যাবর্তন এবং লাখাই মাদ্‌রাসা দারুল হুদায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্ম জীবনের সূচনা।

অতঃপর ১৯৪৮-৪৯ সালে বগুড়ার নগর আলয়া মাদরাসায়, জামালপুর জিলার নগর আলীয়া মাদরাসায় ১৯৫০ হতে ৫৫ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষকতা, অতঃপর ঢাকায় কাযী আলাউদ্দীন রোডস্থ নাজিরা বাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ।

ঐ বছরেই তদানীন্তন পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের দফতর পাবনা হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ায় তাঁর সভাপতি পরিচালক মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শীর সংস্পর্শে আগমন, ১৯৫৬ সালে তর্জমানুল হাদীস এবং ১৯৫৮ সালে আরাফাতের কাজে যোগদান, ১৯৬০ সালে আল-হাদীস প্রিন্টিং ও পাবলিশিং হাউজের ম্যানেজাররূপে দায়িত্ব পালন।

১৯৬১ সালে মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেবের সাহচর্যে আগমন এবং তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী রূপে তদীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৬২ সালে আজাদের সম্পাদকীয়

http://www.shottanneshi.com

বিভাগে যোগদান এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মফস্বল বিভাগে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন। ১৯৭৫ সালে তদানীন্তন সরকার কর্তৃক আজাদ বন্ধ করে দেওয়ার পর বংশাল জামে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে একটি কওমী মাদ্‌রাসা স্থাপনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন, অতঃপর মাদরাসাতুল হাদীসের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। মরহুম মওঃ কবীরুদ্দীন রহমানীর ইন্তিকালের পর বংশাল আহলে-হাদীস জামে মসজিদে ১৯৬৪ হতে১৯৭৭ সালে পর্যন্ত খতীবের দায়িত্ব পালন।

১৯৭৬ সালে দৈনিক আজাদ পুনঃ প্রকাশিত হলে ২৮/৩/৭৬ তারিখে পুনরায় সহকারী সম্পাদকরূপে আজাদে যোগদান এবং অদ্যাবধি উক্ত কার্যে নিয়োজত। অবসর সময়ে মাদরাসাতুল হাদীসের পরিচালনা এবং প্রতি শুক্রবার নাজিরা বাজার জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই সময়ে তিনি ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে মাদ্‌রাসা আলীয়া ঢাকা বোর্ডের আলেম ও ফাযেল পরীক্ষায় যোগদান করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

মওলানা মুন্‌তাসির আহমদ রহমানী একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠা লেখক এবং সফল অনুবাদক। মাসিক তর্জ্জুমানুল হাদীস, মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক আজাদ ও সাপ্তাহিক আরাফাত-এ তাঁর বহু সংখ্যক প্রবন্ধ এবং হাদীসের অনুবাদ (বলুগুল মারাম, ও বুখারী শরীফের নিয়মিত অনুবাদ) ছাড়াও তাঁর লিখিত ও অনূদিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়েছেঃ-

১। রামাযানের সাধনা, ২। আমালে হজ্জ, ৩। যাকাত দর্পণ (অনুবাদ) ৪। তাক্ বিয়াতুল ঈমান (সম্পাদনা) ও ৫। চেরাগে হেদায়াত এবং মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব।

মোদাব্বির হোসেন
১৪৩/১ দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা-১৭

http://www.shottanneshi.com

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তিগত অবস্থা

মুসলিম সমাজের উন্নতির যুগে আরব উপদ্বীপ

আরবের মরুভূমি যদিও দিবারাত্রির হাজার হাজার আলৌকিক ঘটনা দেখেছিল, কিন্তু এরূপ কোন দৃশ্য কখনও প্রত্যক্ষ করেনি যে, ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন আরবের মরুকণাগুলো একটি ভাস্বর সূর্যের (নবীর আবির্ভাবের) আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই স্বীয় চাকচিক্যে সমগ্র দুনিয়ার চক্ষুকে আলোকিত করে দিল এবং আরবের সর্বস্তরকে আলো বিকরণের কেন্দ্রে পরিণত করল। ঠিক সেই সময়ে যখন তারা পাহাড়-পর্বত ও জলস্থলকে আলোকিত করে তুলল, তখনই তারা আবার নিজেরাই এরূপ আলোহীন হয়ে পড়ল যে, সমগ্র জগৎবাসীর চক্ষুর আড়ালেই চলে গেল। এরূপ কেন হল? এ জন্য যে, সেই জাতি, যে আলোর দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েছিল, তারা মনে করল যে, আরবের সেই মরুকণার আলোর মোকাবেলায় তাদের আলো জগদ্‌বাসীকে নিস্প্রভ করতে পারবে না। সুতরাং তাদের পক্ষে অন্ধকারে আলোহীন থাকাই শ্রেয়।[৪]

এমনিতেই বনু উমাইয়া গোত্রের রাজত্বকাল হতেই হেজাযের (মক্কা-মদীনার) কেন্দ্রীয় মর্যাদা শেষ হয়ে গিয়েছিল, দামেশ্‌কের সুচতুর শাসক মন্ডলী পবিত্র হরমদ্বয়কে (মক্কা-মদীনা) পীরজাদাদের খানকায় পরিণত করেছিল। অতঃপর আবু মুসলিম খোরাসানীর তরবারী (১৩২ হিঃ সালে) আবরদের রাজনৈতিক ভাগ্যের চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছিল এবং তার দ্বারা যে আব্বাসী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হল, ধীরে ধীরে তাও অনারবীয় রাজতন্ত্রে পরিণত হল। মো'তাসিমের রাজত্বকালেই (২১৮ হিঃ/৮৩৩ ইং-২২৭ হিঃ/৮৪২ ইং) তুর্কীরা শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং তারাই অবশেষে রাষ্ট্রের মালিক মোখ্‌তার হয়ে বসে। তারপর অনেক উত্থান পতন ঘটে; নিকটে, দূরে বহু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও ধ্বংস হয়, কিন্তু তাতে অসহায় আরবদের কোন অংশই ছিল না।

---

[৪] সৈয়দ সোলায়মান নদভীঃ মাআরীফ, নভেম্বর ১৯২৪ ইং।

http://www.shottanneshi.com

মুসলমানদের উন্নতির এ স্বর্ণযুগে বাগদাদ ও কর্ডোভার শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশরের জামে আজহার, তিউনীসিয়ার জয়তুনা ও ফেজ নগরের মসজিদগুলো হতে জ্ঞান ও সাধনার (ইলম ও আমলের) ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হয়, তুরস্কের লোকেরা কুসতুনতুনীয়া (Constantinople) জয় করে সোলায়মান আ'যম (৯২৬-৯২৭ হিঃ/১৫২০-১৫৬৬ ইং) দায়না নামক স্থানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন এবং মোগলেরা বাংলা-পাক-ভারতের মাটি উলট পালট করে দেয়। কিন্তু আরবের উষ্ট্রচালকগণ তাদের সেই মরু প্রান্তরেই সুখের নিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকে। ওসমানী তুর্কিরা শতাব্দিকালব্যাপী হেজায ভূমিতে রাজত্ব করেছে, তার উন্নতিকল্পে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে; মিসরের রাজত্বের সিংহভাগ শুধু পবিত্র হরম শরীফদ্বয়ের সেবায় নিয়োজিত ছিল, হরমদ্বয়ের খাদেম ও মুতাওয়াল্লীদের জন্য মোটা অংকের মাসোহারা নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আরবের সেই অনুর্বর মরুভূমিতে কোন সময়েই জ্ঞানের ঝরণা প্রবাহিত হয়নি- হতে পারেনি। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, রাজত্বের কর্ণধার 'খলীফাতুল মুসলিমিন' নামে অভিহিত ছিলেন বটে, অথচ ঐশীবাণীর সেই অবতরণ কেন্দ্রেই সেই বাণীর বাহক পবিত্র কোরআনের ভাষায় স্থানে ছিল অন্য ভাষা– তাজ্জবের ব্যাপারই বটে। দুনিয়ার মোহ আর রাজত্বের অভিলাষ মানব সন্তানের দ্বারা কত কিছুই না করাতে পারে। পবিত্র হেজাযের কোর্ট-কাছারির সরকারী ভাষা তুর্কীই ছিল আর তুরস্কের নাগরিকেরাই সরকারী উচ্চপদসমূহ দখল করেছিলেন। পক্ষান্তরে বেচারা আরবেরা শুধু কবরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভিক্ষাবৃত্তি অথবা জাহেলী যুগের ন্যায় লুটতরাজেই নিমগ্ন থেকে গিয়েছিল।

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের আবির্ভাব

অবশেষে দুনিয়া যখন পুনরায় ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল, মুসলমানেরা কিতাব ও সুন্নতের পুণ্যাদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ল, এক আল্লাহর পরিবর্তে শত শত উপাস্য গড়ে নিল, মিশরে বদভী রেফায়ী, ইরাক ও হিন্দুস্তানে আবদুল কাদের জিলানী, মক্কা ও তায়েফে ইবনে আব্বাস এবং এ্যামানে ইব্নে উলওয়ানের নিকট মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য দোয়া-প্রার্থনা করা আরম্ভ হয়ে গেল[৫] এবং মুসলমানেরা সর্বপ্রকার

---

[৫] তাৎহীরুল এ'তেকাদ আন আদরানিল ইলহাদ; কৃত-মোহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল আমীরুস সানআনী ১০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

গাছ-গাছড়া ও প্রস্তর খন্ডের সামনে মস্তক অবনত করতে লাগল, তখন আকাস্মিকভাবে একজন যুগপ্রবর্তক মহা সংস্কারকের শুভ আবির্ভাব ঘটে সেই মরু প্রান্তরে। ফলে আরবের সেই মরুকণা যা অজ্ঞতা ও শির্কের সয়লাবে ভেসে গিয়েছিল- আবার চমকে উঠল। তয্কীর ও হেদায়াতের এ দীপ্ত সূর্য্য তার উজ্জ্বল কিরণরাশি তথায় বিকীর্ণ করতে লাগল এবং পুণ্যভূমি নজদ হতে তওহীদ ও সত্য বাণীর সুঘ্রাণে সমগ্র[৬] আরব ভূমি সুবাসিত ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। আমি এখানে শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের (আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুকম্পা বর্ষণ করুন এবং তাঁর কবরকে আলোকিত করুন) কথাই বলছি। তিনি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও জদ্দ জিহাদ দ্বারা তওহীদের বিস্মৃত পাঠ আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং যতদূর পর্যন্ত এ মর্দে মুজাহিদের পক্ষে আওয়াজ পৌঁছানো সম্ভবপর ছিল, ততদূর পর্যন্ত ন্যায় ও সত্যের এ পয়গাম তিনি পৌঁছে দিলেন।

ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের জন্মকালে মুসলিম জাহানের অবস্থা

হিজরী অষ্টম শতাব্দির শেষের দিকে মুসলিম জাহানের চিন্তা জগতের পতন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ইজতেহাদ ও গবেষণার দ্বারসমূহ পূর্ব হতেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মোতাআখ্খেরীন বা পরবর্তীদের রচিত গ্রন্থসমূহ ও তার টিকা টিপ্পনীতেই তৎকালিন আলেমগণের অধ্যাপনা ও পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাদের কর্মতৎপরতার অবস্থা আরও অধিক শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। অধিকন্তু দ্বাদশ শতাব্দির প্ররম্ভে সেই পতন এরূপ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, অমুসলিমদের যদি সাহাবাগণের পবিত্র যুগের সাথে সেই যুগের মুসলমানদের অবস্থা তুলনা করে দেখত, তা হলে তারাও বিস্মিত ও মর্মাহত না হয়ে পারতনা। বিখ্যাত মার্কিন লেখক ইষ্টাডর্ডের বর্ণনা অনুসারে তখনকার অবস্থা ছিল নিম্নরূপ:

(সেই যুগে) অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মাযহাবও অতি হীন অবস্থায় ছিল, তাসাউফের শিশুসুলভ কল্পনাসমূহের প্রাচুর্য্য নিখুঁৎ ইসলামী তওহীদকে ঢেকে ফেলেছিল, মসজিদগুলো নির্জন ও নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, মূর্খ জনসাধারণ মসজিদে আসতে ভয় করত; তাবিজ ও জপতপের ধাঁধায়

---

[৬] আরবী কবিতা সমূহে নজদের সুঘ্রাণের উল্লেখ বহুল পরিমাণ দেখা যায়। মাহমূদ শকরী আলুসী (মৃঃ ১৩৪২ হিঃ) স্বীয় 'নজদের ইতিহাস' গ্রন্থে এ সম্পর্কীয় বহু কবিতার উল্লেখ করেছেন। (৮-৯ পৃ:)

http://www.shottanneshi.com

পড়ে তারা বহু ফকির এবং মাতাল দরবেশদের শিকারে পরিণত হয়েছিল। ফলে তাদের উভয়ই সম্পূর্ণরূপে পর-নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। তারা বুজুরগানের মাজার জিয়ারতে গমণ করত এবং কবরে শায়িত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী ও অভিভাবক বিবেচনা করে তাদের কবরের পূজা করত। মূর্খ জনসাধারণ ধারণা পোষণ করে বসেছিল যে, আল্লাহ যেহেতু অতি মহান (আর তারা অতি অধম) সেহেতু কোন মাধ্যম ছাড়া তারা আল্লাহর এবাদত করতে পারে না। তারা কুরআন করীমের শিক্ষা শুধু বিস্মৃতই হয়নি, বরং তার বিরুদ্ধাচরণ করতেও দ্বিধা বোধ করত না। অধিকন্তু পবিত্র স্থানগুলো (মক্কা-মদীনা) পাপাচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হজ্জকে ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তা বিদ'আতের প্রাদুর্ভাব ও সংমিশ্রণে অতি নিকৃষ্ট অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলকথা এই যে, ইসলাম ধর্মের প্রাণশক্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি পুনরায় দুনিয়ায় আগমন করতেন তা হলে তিনি অনুসারীদের ধর্মদ্রোহীতার (তথা কবর পূজার) হিড়িক প্রদর্শন করে চরম অসন্তোষই প্রকাশ করতেন।[৭]

সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন একজন অমুসলিম লেখক তৎকালীন মুসলমানের আচরণের যে চিত্র অংকিত করেছেন, তা এমন নিখুঁৎ, সত্য ও যথাযথ ছিল যে, বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ আমীর শকীব আর্সালানের (মৃঃ ১৯৪৬ ইং) মতে কোন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন অভিজ্ঞ ইসলামী জ্ঞান বিশারদের পক্ষেও দ্বাদশ শতাব্দির মুসলমানদের দুরবস্থার সঠিক চিত্র এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করা সম্ভবপর হত না।[৮] এ সম্পর্কীয় অধিক আলোচনা বিরক্তিকর বিবেচিত না হলে নিজেদের দুর্ভাগ্যের আরও কিছুটা কাহিনী পাশ্চাত্যের অপর একজন পন্ডিতের ভাষায় শ্রবণ করুন। এ পন্ডিত মহোদয় লিখেছেনঃ-

"অষ্টাদশ শতাব্দির মুসলমানদের উদ্যমে দারুন ভাটা পড়েছিল তথাকথিত খলিফার প্রভাব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাজত্বের দক্ষিণাঞ্চলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ হচ্ছিল। এ্যামানবাসীরা আরও এক শতাব্দি পূর্বেই আনুগত্যের জোঁয়াল তাদের কাঁধ হতে অপসারিত করে ফেলেছিল। মক্কার

---

[৭] The new world of Islam (p. 25-26)

[৮] হারিরুল আলামিল ইসলামী (১) ২৫৯-২৬০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

প্রধান দলপতিগণ খৃষ্টানদের তুলনায় নিজেদের সর্দারগণের বিরুদ্ধাচরণ করতে অধিক উৎসাহ বোধ করত। বর্তমানে যে ঐক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে সেই সময় তার অনুভূতিও অতি অল্পই ছিল। আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রভূমি মক্কা নগরী পার্থিব আরাম আয়েশের শিকারে পরিণত হয়েছিল। তাক্ওয়া ও পরহেজগারী ছাড়া অন্যান্য সব কিছুর জন্য সেখানে সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল। অথচ হিন্দুস্তানে সেই সময়ে খৃষ্টানদের বিজয় ডঙ্কা বাজছিল এবং ইউরোপেও অমুসলিম শক্তিসমূহ তুর্কীদের মূলোৎপাটন করছিল। কিন্তু আরবে সেই সব ঘটনার অনুভূতি অতি অল্পই ছিল। ফরাসী, বৃটেন এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে বর্তমানে (১৯০৪ সালে) যে সাধারণ বিক্ষোভ ও ক্রোধ প্রদর্শিত হচ্ছে, সেই সময় তার অস্তিত্বও ছিল না। বস্তুতঃ যেখানে ক্রোধ নেই, সেখানে উদ্যমও থাকেনা– প্রচার প্রচেষ্টাতো দূরের কথা। (ফল কথা এই যে,) সেই সময় ইসলাম দ্রুত পতনোন্মুখ ছিল এবং এ সংস্কারের উত্তাল তরঙ্গ যা খৃষ্টীয় উনিশ শতকে আফ্রিকা ও চীনকেও প্লাবিত করে দিয়েছিল, সে সময়ে তার ভবিষ্যদ্বাণী করাও আদৌ সম্ভবপর ছিল না।[৯]

ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের পূর্বে নজদের অবস্থা

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দির প্রারম্ভে ইসলাম জগতের, বিশেষত: পবিত্র স্থানসমূহের যে অবস্থা ছিল, উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রভূমি নজদের অবস্থা তখন এ অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় ছিল। অতি সহজ করে বললেও বলতে হয় যে, নজদবাসীর নৈতিক পতন সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাদের সমাজে ভাল মন্দের কোন মানদন্ডই ছিল না। শতাব্দিব্যাপী শির্ক ও বিদ'আতে লিপ্ত থাকায় শির্কী আকীদাসমূহ তাদের অন্তরে এরূপ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের একটি বৃহৎ অংশ সেই সমস্ত অনাচারকেই আসল দ্বীন বা প্রকৃত ইসলামী আকীদা বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল এবং সত্য মিথ্যার বিচার বিবেচনা ছাড়াই তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসৃত নীতি-নৈতিকতা হতে নড়াচড়া করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

জাবিলায় (হানীফা উপত্যকায়) যায়দ বিন খাত্তাবের পূজা হচ্ছিল, দরঈয়াতেও কোন কোন সাহাবার নামে সংযুক্ত কবর ও গম্বুজগুলো

---

[৯] Hogarth: Penetration of Arabia.

http://www.shottanneshi.com

জনসাধারণের জাহেলী আকীদাসমূহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। গোবায়রা উপত্যকায় জেরার বিন আজদরের কবর বিদ'আতের প্রদর্শনীতে পর্যবসিত হয়েছিল। সর্বোপরি বলিদাতুল ফিদা নামক স্থানের একটি প্রাচীন বৃক্ষের সাথে যুবক যুবতীরা যে আচরণ ও অনুষ্ঠান করছিল তা বর্ণনা করতেও লেখনী অক্ষম। মোদ্দাকথা এই যে, সন্তান-বঞ্চিতা স্ত্রীলোকেরা সন্তান লাভের আশায় সেই বৃক্ষের সাথে আলিঙ্গন করত। দরঈয়ার নিকটবর্তী একস্থানে একটি গুহা ছিল, তাতে তখন অতীব লোমহর্ষক ও লজ্জাকর ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।[১০]

বিঃ দ্রঃ- ফেলবী ও ইবনে সাহমান মূলতঃ ইবনে গান্নামের গ্রন্থ হতে সম্বলিত।

পরিতাপের বিষয় এই যে, এ সবকিছু ধর্ম ও মযহাবের নামেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। পক্ষান্তরে যে কতিপয় ব্যক্তি ফিক্হা ও হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তারা সত্যপ্রচারের শক্তিই হারিয়ে ফেলেছিলেন। বস্তুতঃ নজদের এ শ্রেণীর আলেম সমাজ দুনয়ার অন্যান্য আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বৈকি!!

নজদের রাজনৈতিক অবস্থা তখন আরও অধিক ভয়াবহ ছিল। পারস্পরিক ঝগড়া কলহ এবং নৈতিক অধঃপতন চরম আকার ধারণ করেছিল। নজদের উত্তর কোণে (জবলে শিম্‌রে) তাঈ গোত্রের এবং হেসা অঞ্চলে খালেদ বংশের প্রতাপ ছিল এবং এরূপ মনে হয় যে, উয়ায়নার রাজশক্তি হেসার বনু খালেদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। দারঈয়াতে

---

[১০] নজদে অনুষ্ঠিত বিদ'আতসমূহের বিবরণ সকল ইহিহাসেই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিতভাবে অবগতির জন্য নিম্নলিখিত বইগুলো পাঠ করুন:-(ক) রওযাতুল আফকার ওয়াল আফহাম লে মুর্তাদে হা-লিল ইমাম ওতি'দাদে গযওয়াতে যাবিল ইসলাম, কৃত শায়খ হোসায়ন বিন গান্নাম (মৃঃ ১২২৫ হিঃ ৭-১৬ পৃঃ)

(খ) উনওয়ানুল মাজদে ফী তারীখে নজদ, কৃত-ওসমান বিন বিশ্‌র নজদী (মৃঃ ১২৮৮ হিঃ), ৬ পৃষ্ঠা। উল্লিখিত গ্রন্থ দু'টি নজদের ইতিহাস সম্পর্কে মৌলিক গ্রন্থরূপে পরিচিত।

(গ) আল হাদীয়াতুসসনীয়াহ্ ও তোহফাতুল ওয়াহ্হাবীয়াতুল নজদীয়াহ্, কৃত-সোলায়মান বিন সাহমান ঃ ৯-৪৭ পৃষ্ঠা, এবং তাবরিয়াতুশ্ শায়খায়নিল ইমামায়ন, কৃত-ঐঃ ৩-১৬১ পৃষ্ঠা।

(ঘ) ফেলবী কৃত Arabia (দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড সিরিজ) ৪-৫ পৃঃ। বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক খালেদ বিন মোহাম্মদ আল-ফরজ কৃত আলহজ্জঃ মক্কা মোকাররমা ৫ম খন্ড, ৪ পৃষ্ঠায় নজদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

http://www.shottanneshi.com

মোহাম্মদ বিন সউদ বিন মুকরিন গোত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। পক্ষান্তরে, দারঈয়ার নিকটবর্তী রিয়াজে দৌয়াসের আলাদা রাজত্ব কায়েম। ফলকথা নজদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রিয়াছতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।[১১]

জন্ম ও বংশ পরিচয়

চরম দুর্যোগপূর্ণ এ সময়ে এবং সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে উয়ায়নার[১২] একটি সুশিক্ষিত পরিবার ১১১৫ হিজরী মোতাবেক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) জন্ম গ্রহণ করেন।[১৩] তাঁর পিতামহ সোলায়মান[১৪] বিন আলী বিন মোশাররফ[১৫] (মৃতঃ১০৭৯ হি) স্বীয় যুগের বিখ্যাত আলেম ছিলেন।

---

[১১] ফেলবীঃ-৬-৭ পৃষ্ঠা আরবের বিভিন্ন অংশ বিশেষতঃ নজদের ভৌগোলিক অবস্থান অনুধাবন করা কিঞ্চিৎ মুশকিল ব্যাপার। কারণ তা আমাদের দেশের ন্যায় জেলা ও মহকুমায় বিভক্ত ছিল না। বর্তমান সময়ের পূর্বে সেখানে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঐক্যও বিদ্যমান ছিল না। সংক্ষিপ্ত কথায় বলা যায় যে, নজদের মোটা-মুটিভাবে তিনটি বৃহৎ অংশ ছিল, যথাঃ -(ক) উত্তর পশ্চিম অংশ যা মিম্মর নামে অভিহিত। তার বিখ্যাত নগর হচ্ছে হাইল (حائل) এবং আলকসর।

(গ) উত্তর-পূর্ব অংশ যা আলকসীম নামে পরিচিত। তার বিখ্যাত স্থানসমূহ হচ্ছে উয়ায়ানাহ্ ও বুরায়দাহ্।

(ঘ) দক্ষিণাংশঃ- একে আলআরিয বলা হয়ে থাকে। এর বিখ্যাত নগরী বর্তমান সউদী আরবের রাজধানী। একে জাবলে এমামাহ বলা হয়ে থাকে। মূলতঃ এ একটি পার্বত্য অঞ্চল এর পার্শ্ববর্তী সমতলভূমিকে ওয়াদীয়ে হানীফা ও এমামাহ্ বলা হয়। শায়খুল ইসলামের জন্মভূমি উয়ায়না এবং তাঁর আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি দরঈয়া এ উপত্যকায়ই অবস্থিত এবং তা নজদের কেন্দ্রতুল্য। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম ARABIA শব্দ (১) ৩৭১ এবং নজদ শব্দ (৩) ৮৯৩-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[১২] উয়ায়না (আইনের পেশসহ) আইনের তসগীর (ক্ষুদ্রা-কৃতি)। বর্তমানে একে বলদুশ্ শায়খও বলা হয়ে থাকে।

[১৩] ইবনে গান্নাম (১) ৩০ পৃঃ উনয়ানুল মাজ্দ (১) ১৩৮ পৃঃ। ইমাম সাহেবের পরবর্তী জীবনী লেখকদের মধ্যে আহমদ বিন জয়নী দহলাম কর্তৃক তার জন্ম সন ১১১১ হিজরী এবং আমীর শকীব আরছালান কর্তৃক ১১১৬ হিজরী বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে। কিন্তু আমরা একে নির্ভুল বলতে পারছি না। অনুরূপভাবে Hughes Dictionary of Islam ৬৫৯ পৃষ্ঠায়, আলফ্রেড ব্লেন্ট A pilgrimage to Najd (জমিমা) ২৫ পৃষ্ঠায়, জোয়ায়মের তাঁর Aribia the Cradle of Islam গ্রন্থে এবং অন্যান্য কোন কোন লেখক ইমাম সাহেবের জন্ম ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে ভুল। হোগার্থ (৭৩ পৃঃ) উল্লিখিত লেখকগণের প্রমাণপঞ্জির উপর নির্ভর করে তার জন্ম সন ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বলে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন।

[১৪] (ক) শায়খের পূর্ণ বংশ পরম্পরা নিম্নরূপঃ

http://www.shottanneshi.com

নজদের আলেমগণ কোন সমস্যার সম্মুখীন হলেই তাঁর নিকট হতেই মীমাংসা গ্রহণ করতেন। হজ্জের মসলা মাসায়েল সম্পর্কিত তাঁর রচিত গ্রন্থখানা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এমন কি আস্সাহবুল ওয়াবেলার বর্ণনানুসারে হাম্বলী মযহাবের অনুসারীরা সাধারণতঃ হজ্জ সম্পর্কীয় বিষয়ে এ কেতাবের উপরই নির্ভর করতেন- ১০৩ পৃঃ। ইমাম সাহেবের পিতৃব্য ইবরাহীম বিন সোলায়মানও একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন আলেম ছিলেন। ইবরাহীমের পুত্র আবদুর রহমানও (মৃঃ ১২৫৩ হিঃ) ফিক্হ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত উয়ায়নায় ও হোরায়মালার প্রধান বিচারপতির পদে সমাসীন ছিলেন। সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহহাব (মৃঃ ১২০৮ হিঃ) এবং তার পুত্র আবদুল আজীজ (মৃঃ ১২৬৩ হিঃ) শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। ১২৩৬ হিজরীতে মিসরীয়দের লুটতরাজকালে তিনি হোরায়মালায় অবস্থান করছিলেন। তাকে সেখানেই আটক করা হয়। তার প্রতি কঠোর নির্যাতন চলান হয়। তার গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করা হয় এবং অন্যান্য আসবাবপত্র লুণ্ঠিত হয় (উনওয়ানুল মাজদ (১) ২৩৬ পৃষ্ঠা)

প্রতিপালন বা শৈশব কাল

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব শৈশব কাল হতেই অতি মেধাবী এবং প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। দশ বৎসর অতিক্রম করার পূর্বেই তিনি কুরআন মাজীদের হাফেজ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার নিকট হম্বলী মযহাবের ফিকাহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন এবং শৈশব কাল হতেই প্রচুর হাদীস ও তফসীর গ্রন্থের অধ্যয়ন করতে থাকেন। পিতা

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব বিন সোলায়মান বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন রাশেদ বিন বুরায়দ বিন মুশাররফ- (খ) আসসাহ্বুল ওয়াবেলাহ আলা জরায়েহে হানাবেলায় (হস্তলিখিত পান্ডুলিপি, পাটনা) এ গোত্রের নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের অবস্থা পাওয়া যায় (১) সোলায়মান বিন আলী বিন মোশাররফ ১০৩ পৃঃ (২) ইবরাহীম বিন সোলায়মান বিন আলী (৮-৯ পৃঃ) (৩) আবদুল ওয়াহ্হাব বিন সোলায়মান বিন আলী, সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, আবদুল আজীজ বিন সোলয়মান (মৃতঃ ১২৬৩ হিঃ) ১৭১-২ পৃঃ;) (৪) আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব বিন মুশাররাফ (মৃঃ ১১২৫ হিঃ) ১৭২ পৃ.।

[১৫] মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের পূর্বে তার গোত্র আলে মুশার্‌রফ নামে অভিহত ছিল। বর্তমানে আলে শায়খ নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

http://www.shottanneshi.com

আবদুল ওয়াহ্হাব স্বীয় পুত্রের মেধাশক্তি এবং বিচক্ষণতা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হতেন। তিনি বলেছেন, মোহাম্মদের অধ্যাপনাকালে তাঁর বিচক্ষণতা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি নিজেও উপকৃত হয়েছেন। শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব তার পুত্রের জ্ঞান প্রতিভায় এরূপ প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, অল্প বয়সের বালক হলেও তিনি ইমামতি করার জন্য তাকেই অগ্রসর করে দিতেন। ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব তরুণ বয়সেই দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং হজ্জ পর্বও সামাধা করেন। এ সময়ে তিন দুই মাসকাল মদীনায় অবস্থান করে উয়ায়নায় প্রত্যাবর্তন করতঃ পুনরায় পিতার নিকট জ্ঞান আহরণে মনোনিবেশ করেন। প্রয়োজনীয় নোট গ্রহণ ও তথ্যমূলক পুস্তকাদি তিনি এরূপ নিষ্ঠার সাথে নকল করতেন যে, একই বৈঠকে বিশ পঁচিশ পৃষ্ঠা লিখে তবেই উঠতেন।[১৬]

শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব প্রকৃতভাবেই অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন, ধর্মপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। নজদের পার্শ্ববর্তী শহর-বন্দর ও গ্রামাঞ্চলের নৈতিক ও মাযহাবী দুরবস্থা দর্শন করে তিনি দুঃখিত ও মর্মাহত হতেন। সাধারণ মানুষের অবস্থা তো এ ব্যাপারে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল; এমন কি সেখানে তথাকথিত আলেম সমাজের অবস্থাও অধিক মর্মবিদারক হয়ে গিয়েছিল। মোহাম্মদ স্বীয় পিতা নজদের শীর্ষস্থানীয় আলেম আবদুল ওয়াহ্হাবের নিকট পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করলেন।

কিন্তু উত্তরকালে অদ্বিতীয় সংস্কারক ও মোজাদ্দেদের জ্ঞান পিপাসা এতেই নিবৃত্ত হল না। হজ্জ তিনি পূর্বেই সমাধা করেছিলেন। হেজাযের কেন্দ্রীয় মর্যাদা তাঁর অন্তরে ছেয়ে গেল, এটা পূর্বেই বলা হয়েছে। অধিক জ্ঞান বা উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি সেই হেজায নগরীর দিকেই পুনরায় ধাবিত হলেন। উদ্যমশীল এ যুবকের বয়স তখন আনুমানিক কুড়ি বৎসর মাত্র। জ্ঞান আহরণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় ১১৩৫ হিজরিতে তিনি পুনরায় হেজাযের কেন্দ্রভূমি মক্কা নগরীতে হাযির হয়ে পবিত্র মক্কা ও মদীনার যিয়ারত করার পর তথাকার অভিজ্ঞ ও খ্যাতিসম্পন্ন আলেমগণের খিদমতে হাযির হন এবং উচ্চশিক্ষা লাভে মনোনিবেশ করেন। নজদের

---

[১৬] ইবনে গান্নম, ৩০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

মজমা'আ নামক স্থানের বিখ্যাত আলেম আল্লামা আবদুল্লাহ বিন ইব্রাহীম বিন সায়ফ তখন স্থায়ীভাবে মদীনায় অবস্থান করছিলেন। শায়খ বিশেষভাবে তাঁর নিকটও শিক্ষা গ্রহণ করেন। শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইব্রাহীম নজদীর (মদনীর) মহত্ত্ব, মর্যাদা এবং জ্ঞান গভীরতা সম্পর্কে স্বয়ং শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব বলেছেন:

"একদা আমি শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইব্রাহীমের খিদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, মজমাআবাসীদের জন্য আমি যে অস্ত্রাগার প্রস্তুত করে রেখেছি তা কি তুমি দেখবে? আরজ করলাম, অবশ্যই দেখান হুজুর! তিনি আমাকে সঙ্গে করে এমন একটি গৃহে প্রবেশ করলেন যেখানে বহু গ্রন্থরাজীর সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি বললেন দেখ, আমি তাদের জন্য এ সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছি।" - উনওয়ানুল মাজদ, ৭ পৃষ্ঠা।

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইব্রাহীমের[১৭] মাধ্যমে শায়খ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধীর (মৃঃ ১১৬৫ হিঃ) সাথে শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের পরিচয় ঘটে। তিনি সেই সময় মদীনার হাদীস শাস্ত্র বিশারদরূপে তাঁরও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন তাঁর খিদমতে অবস্থান করেন।

এই প্রসঙ্গে ইব্নে আবদুল ওয়াহ্হাব সিরিয়ার বিখ্যাত আলেম শায়খ আলী দাগিস্তানীর[১৮] (মৃত ১২৯৯ হিঃ) শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছিলেন বলে

---

[১৭] আল্লামা শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইব্রাহীম স্বীয় যুগের বিখ্যাত ও বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। শায়খ সাহেব সিরায়াও গমন করেন এবং হাম্বলী মতালম্বী বিখ্যাত আলেম আবুল মোওয়াহের হাম্বলীর (মৃঃ১১২৬ হিঃ) নিকটও অধ্যয়ন করেন। তাঁর পুত্র ইব্রাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন ইব্রাহীমও (মৃঃ১১৮৫ হিঃ) বিখ্যাত আলেম ছিলেন। বিখ্যত গ্রন্থ 'আল আজবুল ফায়েজ ফী শর্হে আলফিয়াতিল ফারায়েজ' তাঁরই প্রণীত। (আস্সাহ্বুল ওয়াবেলাহ ১১-১২ পৃষ্ঠা)

[১৮] শায়খ আলী দাগিস্তানী স্বীয় যুগের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। এবং দীর্ঘদিন মদীনায় অবস্থান করেছিলেন। শায়খ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধির নিকট হতে তিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি ১১২৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে কথিত হয়েছে। বহু ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মদীনায় অবস্থান করেন এবং দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করেন। ১১৫০ হিজরীতে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তণ করেন (সিলকুদদুরর (৩) ২১৫ পৃষ্ঠা। মদীনা মোনায়ারায় শায়খের অবস্থানকালে তাঁর বয়স অতি অল্প ছিল। সুতরাং শায়খের পক্ষে তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করার উক্তি যুক্তিযুক্ত নয়। সমসাময়িকদের মধ্যে মুহিব্বুদ্দিন খতীব। (আয্যুহ্রা, রজম ৪৫ হিঃ এবং মোহাম্মদ

http://www.shottanneshi.com

উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে তা সঠিক নয়। অনুরূপভাবে মদীনার বিখ্যাত মোহাদ্দিস মোহাম্মদ বিন সোলায়মান কুর্দীর (মৃত ১১৯৪ হিঃ) নিকট শিক্ষা গ্রহণের কথা কোন কোন ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক এ সম্পের্কে সম্পূর্ণ নীরব। অধিকন্তু সাল ও ঘটনা পরম্পরার সাক্ষ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত।[১৯]

মোহতারাম উসতাজ মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সালাতীনে নজদের মাযহাব শীর্ষক প্রবন্ধে (মাআরিফ নভেম্বরঃ ১৯২৪ সাল) হযরত শাহ্ ওয়ালিল্লাহ দেহলবী (মৃত ঃ ১১৭৬ হিঃ) এবং শায়খুল ইসলাম (মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব) উভয়ে একই শিক্ষাকেন্দ্রের (মসজিদে নবীব) ছাত্র বলে উল্লেখ করেছেন। উভয়ের শিক্ষার মূল উৎস (কিতাব ও সুন্নত) এবং শিক্ষা নগর (মসজিদে নববী) ছিল এক, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত শিক্ষা বা শিক্ষাগুরু যে একই ব্যক্তি ছিলেন তা অজ্ঞাত।

লবীব বতনূনী (আর রেহ্লাতুল হেজাযীয়াহ্, ৮৫ পৃঃ) কর্তৃক পবিত্র মক্কায় শিক্ষা গ্রহণের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু কোন বিশ্বস্ত রেওয়ায়েতে তা প্রমাণিত হয়নি। মদীনার শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হলে শায়খ বসরার উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং শায়খ মোহাম্মদ মাজমোয়ীর নিকট হাদীস ও আভিধানিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তাঁর খিদমতে সর্বদা উপস্থিত থাকেন। ইবনে বিশ্‌র স্বীয় গুরু ওসমান বিন মনসূরের মাধ্যমে রেওয়ায়াত করেছেন যে, শায়খ মোহাম্মদ মজমোয়ীর সন্তানগণও ইল্‌ম ও

হামিদ ফকীহ্ (আসরুদ্‌দা'ওয়াতিল ওয়াহ্হাবীয়াহ ফিল ইসলাহিদ্দীনী, ৪ পৃঃ) এর উল্লেখ করেছেন।

[১৯] ইবনে গান্নাম ও ইবনে বিশ্‌র মোহাম্মদ বিন সোলায়মান কুর্দীর শিষ্যত্বের উল্লেখ করেননি। শুধু আহমদ যয়নী দাহ্লাম (আদদর্‌ রুসসনীয়াহ্ঃ ৩৫-৪২) কর্তৃক শায়খ কুর্দীর শিষ্যত্বের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি এর উপর বিশেষ গুরুত্বও আরোপ করেছেন। বস্তুতঃ দাহ্লানের এ গ্রন্থে এবং 'খুলাসাতুল কালাম ফী ওমারায়েল বলাদিল হারাম' গ্রন্থেও এরূপ ভ্রান্ত বিবরণ বরং মিথ্যা অপবাদের সমাবেশ রয়েছে যে, তার কিঞ্চিৎ সত্য বিবরণের প্রতিও আস্থা স্থাপন করতে ইচ্ছা হয় না। অধিকন্তু সন সমূহের সাক্ষ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মোহাম্মদ বিন সোলায়মান কুর্দী ১১৯৪ হিজরীতে ৬৭ বৎসর বয়সে ইন্তেকল করেন। (সিলকুদদুরর (৪), ১১১-২ পৃষ্ঠা। অতএব এ হিসাবে তার জন্ম হবে ১১২৭ হিজরীর কাছাকাছি কোন এক সময়ে। সুতরাং শায়খের শিক্ষা গ্রহণকালে তিনি অতি অল্প বয়সের ছিলেন এবং তাঁর নিকট শায়খের শিক্ষা গ্রহণের সঠিক হতে পারে না।

http://www.shottanneshi.com

আমলে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। (ওনওয়ানুন নজদ, ৮ পৃষ্ঠা) তিনি সিরিয়া গমনের জন্যও একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তা খরচের অভাবে পূরণ করতে পারেননি। অতঃপর এহছার পথে হোরায়মালায় (নজদে) প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁর পিতা ইতোপূর্বেই হিঃ ১১৩৯ মোতাবেক ১৭৩৬ সাথে উয়ায়না হতে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন।[২০]

দাওয়াত ও তবলীগ

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব শৈশব কাল হতেই আম্‌র বিল মা'রুফ ও নহি আনিল মুনকার-সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজ হতে বারণ করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তিনি যখন উয়ায়নাতে হাদীস ও ফিক্‌হের শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন তখন তাঁর চতুস্পার্শ্বে শির্ক ও বিদআতের প্রাদুর্ভাব তাকে বিচলিত করে তোলে। দ্বীনের মূলনীতির বিরুদ্ধে কোন কাজ অনষ্ঠিত হতে দেখলেই তিনি নহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনে দ্বিধা করতেন না। মদীনায় শায়খ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধি এবং আলী বিন ইব্‌রাহীম বিন সয়ক নজদীর নিকট অধ্যয়নের পর হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বিশারদ হয়ে উঠেন এবং চতুর্দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পান যে, সমগ্র দুনিয়া ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। যতদূর সন্ধান করা গেছে তাতে জানা যায় যে, শায়খ সর্বপ্রথম সেই সময় 'ইস্তি গাছার'– আল্লাহ ব্যতীত অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মূখর হয়ে উঠেন। রসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র কবরের নিকট অজ্ঞ লোকের অনৈসলমিক তৎপরতা দর্শনে তিনি ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়েন। একদা তিনি হুজরায়ে নববীর পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলেন। সম্মুখেই বিদ'আতের বাজার সরগরম ছিল। ইত্যবসরে তাঁর গুরু মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধি সেখানে

---

[২০] মার্গোলিয়থ (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (৪) ১০৮৬-৯) কর্তৃক তো এখানে মিথ্যা রচনার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ

"বাগদাদে তিনি বিবাহ করেন। তার স্ত্রী দু' হাজার দীনার মুদ্রা রেখে ইন্তেকাল করেছেন.... কুর্দিস্তান, হামদান, কুম ও ইসফাহানও ভ্রমণ করেন এবং তথায় অবস্থান করেন।" এছাড়া Brydges কর্তৃক A Brief History of Wahhaby গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় এবং Haghes ৬৫৯ পৃষ্ঠা, জোয়ায়মির ১৯২ পৃষ্ঠা , গালগ্রীব ৩৬৩-৪ পৃষ্ঠা হতে কেহ বাগদাদ সফর, কেউ দেমাশ্‌ক সফর এবং কেউ কেউ উভয় স্থানের সফরের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শায়খুল ইসলামের বসরায় আগে গমনের সুযোগ হয়নি। বাগদাদ, সিরিয়া, অথবা মিসর সফরের কোন প্রমাণ নেই।

http://www.shottanneshi.com

আগমন করেন। শায়খ তাঁকে সেখানেই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এসব লোকদের সম্বন্ধে কী বলেন? তিনি উত্তরে বললেন,

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝

বস্তুতঃ এ লোকগুলো যাতে লিপ্ত রয়েছে তারা বিধ্বস্ত হবে এবং তাদের কাজগুলো নিশ্চয়ই বাতেল। (সূরা আ'রাফ ১৩৯; আওয়ানুল মাজদ ৭ পৃষ্ঠা)

বসরায় গমনের পর শায়খুল ইসলামের এ উদ্যম বেড়ে যায় এবং তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে অসৎ কাজ হতে লোকদের নিবৃত্ত করতে লেগে যান। ফলে তাঁকে নানা অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। তার সাথে সংশিষ্ট ও সহানুভূতিশীল হওয়ার অপরাধে(?) শায়খ মোহাম্মদ আজমেরীর প্রতিও জঘন্য অত্যাচার করা হয়। বিদআতীরা শায়কুল ইসলামকে ঠিক দুপুরের প্রখর রৌদ্রে বসরা হতে বের করে দেয় এবং তিনি বসরার নিকটবর্তী জোবায়রার[২১] দিকে গমন করেন। পথে পিপাসায় ওষ্ঠাগত-প্রাণ হয়ে উঠেন। ফলে (ভাড়ায় প্রদান উপযোগী গর্দভের মালিক) আবুহুমায়দান নামক জনৈক ধর্মভীরু ব্যক্তি তাঁর পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করেন এবং একটি গর্দাভে আরোহণ করিয়ে তাকে জোবায়রায় পৌঁছে দেন।[২২]

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ আন্দোলনের প্রাথমিক বা সূচনামূলক তৎপরতা ছিল। অতঃপর হুরায়মালায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বিদআতের মূলোৎপাটন এবং তাওহীদ ও ইসলামের নীতিনৈতিকতার প্রচার ও প্রসারে দৃঢ় সংকল্প হলেন। তওহীদের পবিত্রতার উপরই তিনি তাঁর আন্দোলনের গোড়াপত্তন করলেন। সর্বপ্রকার এবাদতকে শুধু আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। পবিত্র কালেমা লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহর সমুন্নতি সাধন তার প্রতীক ছিল। বস্তুতঃ শত বছরের ধ্বংসপ্রাপ্ত নীতিনৈতিকতা বা চরিত্র সংস্কারের আন্দোলন পরিচালনা কুসমাস্তীর্ণ ছিল না। শায়খুল ইসলাম বেদুঈন সমাজের সার্বিক উন্নতি কামনা করেছিলেন। বিশেষতঃ তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ সাধন করে চুরি, রাহাজানি, প্রতারণা ও লুটতরাজের দীর্ঘদিনের তাদের কুস্বভাবগুলোর সংশোধন সাধন করতঃ তাদের মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং পারস্পরিক

---

[২১] জোবায়রা বসরার নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র শহর, জোবায়র বিন আওআম সাহাবীর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত। এ শহরের অধিবাসীগণ সুন্নতে রসূলুল্লার অনুসরণে সুবিখ্যাত।

[২২] উনওয়ানুল মাজ্দ ৮ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

সহানুভূতিশীল হওয়ার প্রেরণা জাগ্রত করাই ছিল তার লক্ষ্য। অজ্ঞ সমাজের ভ্রান্ত আকীদাসমূহের সংশোধন করে বাতিল মাবুদ, কুব্বা ও কবর প্রভুতরি সীমাতিরিক্ত সম্মান করার অন্ধবিশ্বাস হতে তাদেরকে মুক্ত করতঃ প্রকৃত মা'বূদ যিনি, তাঁর পবিত্র দরগাহে তাদেরকে ফিরিয়ে আনাই ছিল শায়খুল ইসলামের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ কঠোর ও সংগ্রামসাপেক্ষ আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব না হলেও সহজসাধ্য ছিল না। বস্তুতঃ এ কঠোর সংকল্পের বাস্তবায়নে এবং এ দুর্গম দুরূহ কন্টকাকীর্ণ পথযাত্রায় শায়খুল ইসলামকে যে সমস্ত প্রাণান্তকর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং যেরূপ অম্লান বদনে ও হাসিমুখে তিনি তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, সন্তুষ্টচিত্তে তার মোকাবেলা করেছিলেন, তাতে এ বিশ্বাসই জন্মে যে, শায়খুল ইসলামের মধ্যে তার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল। পুর্ব হতেই তিনি তজ্জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

তিনি তওহীদের আহ্বান জানান। আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও সামনে মস্তক নত করা, কবরসমূহ ও অলী দরবেশের নিকট সাহায্য প্রার্থনা এবং সৎ ব্যক্তিদের মা'বূদরূপে গ্রহণ করা হতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কবর জিয়ারতের সুন্নত নিয়মের বিপরীত যেসব বিদআত প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, তার বিলোপ সাধনের বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করা মাত্রই তার বিরুদ্ধাচরণের বান ডাকল। আত্মীয় ও আপনজনও তাঁকে বিপদে নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। স্বয়ং তাঁর পিতাও (আবদুল ওয়াহ্হাব) তাঁর বিদআত বিরোধী এ তৎপরতায় আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। শায়খুল ইসলাম পিতা ও গুরুজনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন বটে, কিন্তু যে পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছেন তা হতে বিন্দুমাত্র পশ্চাদপসরণ করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হল না। ক্রমে ক্রমে অত্যাচারের মাত্রা সীমা অতিক্রম করে চলল; পরন্তু ধৈর্য্যের মূর্ত্তপ্রতিক এ বীর মোজাহেদ একটুও বিচলিত হলেন না। বরং সর্ববিধ বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে অধিক উৎসাহ ও উদ্যমের সাথে সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে আরিযের হুরায়মালা, উয়ায়না, দারঈয়া, রিয়াজ প্রভৃতি শহরে বন্দরে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার অতি দ্রুতগতিতে চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করল। বিদআৎ-বিরোধী আন্দোলন অবিরাম গতিতে চলছিল,

http://www.shottanneshi.com

তবে পিতার নীরবতার জন্য তার গতি কিঞ্চিৎ মন্দীভূত ছিল। ১১৫৩ হিজরী তথা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন।[২৩] অতঃপর দাওয়াত ও তবলীগের কাজ তীব্রতর হয়ে উঠল। তিনি প্রকাশ্যভাবে সুন্নতের অনুসরণ ও বিদআৎ বর্জনের ওয়াজ করতে শুরু করলেন। হুরায়মালার কিছু সংখ্যক লোক তাতে প্রভাবিত হল এবং আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল, শায়খের মাদ্‌রাসায় নিয়মিতভাবে হাজির হতে এবং সর্ব বিষয়ে তার নিকট হতে উপকৃত হতে লাগল। শায়খুল ইসলামের বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুত তাওহীদ" এ সময়েই প্রণীত ও প্রকাশিত হয়।[২৪]

হিঃ ১১৫৭/১৭৪৪ সালে উয়ায়নায়

দাওয়াত ও তবলীগের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করার পর শায়খ অনুভব করেন যে, এ বাড়াবাড়ির যুগ সন্ধিক্ষণে মুসলিম জাহানের প্রত্যেক প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন[২৫] শাসনকর্তা থাকায় আন্দোলদের সাফল্য লাভ কঠিন ব্যাপার হবে। অবস্থা এমন চরম আকার ধারণ করেছিল যে, হুরায়মালার মত একটি ছোট্ট ভূখন্ডে দু'টি গোত্র শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পরস্পরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল।[২৬]

এরূপ অবস্থায় কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। সুতরাং শায়খুল ইসলাম সমস্ত নজ্‌দকে একজন আমীর এবং একটি পতাকাতলে সমবেত করার ইচ্ছা করলেন। তিনি অনুভব করলেন যে, কোন শাসনকর্তার সহানুভূতি অর্জন করতে না পারলে আন্দোলনকে সর্বত্র দ্রুত সম্প্রসারিত করা সহজসাধ্য হবে না। এরূপ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উয়ায়নার শাসনকর্তা আমীর ওসমান বিন মোআম্মরের সাথে পত্র

---

[২৩] মোহাম্মাদ হামিদ ফকীহ (৫১ পৃ.) শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাবকে নিরপেক্ষ বলেছেন। খালেদ বিন মোহাম্মাদ আল ফর্‌জ ইন্তেকালের সন ১১৫২ হিঃ বলে উল্লেখ করেছেন।

[২৪] রওয়াতুল আফকারঃ ৩৬ পৃষ্ঠা।

[২৫] ওসমানী শাসনামলে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য দেশ চারটি অংশ বিভক্ত ছিল যথাঃ বেলায়েত (প্রদেশ) লেওয়া (কমিশনারী বা বিভাগ) কাজা জেলা (নাহিয়া (তহসীল-সাব ডিভিশন বা মহকুমা)। আরেজ নাহিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলুসী কর্তৃক নাহিয়াতুল আরিজ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রদেশ ও জেলার পরিভাষা আমরা মোকাবেলার জন্য গ্রহণ করেছি।

[২৬] উনওয়ানুল মজদে) ৯ পৃঃ) কতিপয় দাসের দুষ্টামীর উল্লেখ রয়েছে। তারা শায়খকে হত্যা করা ষড়যন্ত্র করছিল। অন্যান্য যে সব গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে সম্ভবতঃ এখান হতেই গৃহীত হয়েছে।

http://www.shottanneshi.com

বিনিময় করলেন এবং আমীরকে সত্য গ্রহণে সম্মত দেখে নিজেও উয়ায়নায় স্থানান্তরিত হলেন। আমীরও তাঁর যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা করলেন এবং শায়খকে যথাযথ মর্যাদা দান করলেন। জওহরা বিনতে আবদুল্লাহ্ বিন মোআম্মরের সাথে শায়খ পরিণত সূত্রে আবদ্ধ হন। ফলে প্রকাশ্য সম্পর্ক গভীর ও দৃঢ় হয়ে উঠে। শায়খের সম্মুখে ছিল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। তাঁর এ ব্যক্তিগত বা গোত্রগত সম্পর্কের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর। তিনি উয়ায়না অধিপতির সম্মুখে দাওয়াত পেশ করলেন। তওহীদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করলেন এবং তাঁর মহান সংস্কার আন্দোলনে সহায়তা করার অনুরোধ জানালেন। শায়খের নিম্নবর্ণিত শব্দগুলো চিরস্মরণীয় ও প্রণিধানযোগ্যঃ-

إِنِّيْ أَرْجُوْا اِنْ أَنْتَ قُمْتَ بِنَصْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْ يُّظْهِرَكَ اللهُ تَعَالَى وَتَمْلِكُ نَجْدًا وَأَعْرَابَهَا.

অর্থাৎ হে আমীর, যদি আপনি (কালেমা) লা-ইলাহা ইল্লাল্লার সাহায্যে দন্ডায়মান হন, তবে আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ আপনাকে জয়যুক্ত করবেন এবং সমগ্র নজদ ও নজদবাসীর উপর আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন।[২৭]

আমীর ওসমানের নিকট এ আবেদন আন্তরিকতার সাথে পেশ করা হয়েছিল এবং তিনি তা গ্রহণও করেছিলেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তিনি তাতে স্থিতিশীল হতে পারেননি। এর পরিণতিস্বরূপ তাকে নানা দুর্ভোগও পোহাতে হয় এবং পরিশেষে এ দা'ওয়াতী মিশন উয়ায়না হতে দরঈয়ায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

যা হোক, ওসমান বিন হাম্দ বিন মোআম্মরের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি অনুসারে শায়খ প্রকাশ্যভাবে সৎকার্যের দিকে লোকদের আহ্বান করতে এবং অসৎ কাজ হতে তাদের নিবৃত্ত করতে লাগলেন এবং তাঁর তবলীগের ফলে উয়ায়নাবাসীদের অন্তর সত্যের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল।

শায়খ সাহেব ইতোমধ্যে বিদআতের কতিপয় বিখ্যাত আখড়া ভেঙ্গে ফেলার উদ্দোগ গ্রহণ করেন এবং তাতে যথেষ্ট সফলতাও লাভ করেন। সেই অঞ্চলে তখন যে কতিপয় বৃক্ষের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শিত

---

[২৭] উনওয়ানুল মাজ্দ ৯ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

হচ্ছিল, শায়খের নির্দেশে সেগুলোর মূলোৎপাটন করা হল। জয়দ বিন খাত্তাবের নামে (ইনি ইয়ামামা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন) জবিলা নামক স্থানে একটি কবর এবং তার উপর একটি গুম্বজ নির্মিত ছিল, তাও বিধ্বস্ত করা হল। সেই সময়ে এ অত্যন্ত নির্মিত ছিল, তাও বিধ্বস্ত করা হল। সেই সময়ে এটা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য ছিল বটে। ইবনে বিশ্‌র এ গুম্বজ বিধ্বস্তির ঘটনাটি এরূপভাবে বর্ণনা করেছেন-

শায়খ সাহেব ওসমানকে বললেন, দেখুন, এই যে গুম্বজ এর ভিত্তি বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর ফলে অজ্ঞ জনসাধারণ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। আসুন, এখন তা রিধ্বস্ত করে ফেলি। ওসমান বললেন, আপনিই তা ভেঙ্গে ফেলুন। শায়খ আরজ করলেন, আমার ভয় হয়, জবিলাবাসী এতে হয়ত বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং তারা আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। অতএব আপনার উপস্থিতি ব্যতীত আমি তা বিধ্বস্ত করতে পারব না। এ অনুরোধে ওসমান সম্মত এবং ছয়শত লোকের একটি বাহিনীসহ রওয়ানা হন। নিকটবর্তী হলে (দেখে গেল যে,) জবিলাবাসীরা প্রতিরোধের জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু ওসমানের পূর্ণ প্রস্তুতি লক্ষ করে তারা শান্ত হয়ে সরে যায়। ওসমান শায়খকে বললেন, দেখুন! আমরা গুম্বজটি স্পর্শ করব না, (আপনি তা বিধ্বস্ত করার ব্যবস্থা করুন।) ফলে শায়খ সাহেব স্বয়ং অগ্রসর হন এবং স্বহস্তে তা বিধ্বস্ত করে ধুলিস্মাৎ করে প্রত্যাবর্তন করেন। পক্ষান্তরে, এ "অশুভ কার্য্যের" জন্য শাখখের প্রতি কী ভীষণ "বালা মুছিবত" নাজেল হয়, তা প্রত্যক্ষ করার জন্য উক্ত এলাকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ অতি চাঞ্চল্যের সাথে অধীর আগ্রহে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে থাকে। কিন্তু কথায় বলে, "রাখে আল্লাহ মারে কে?" যখন প্রভাত হল তখন লোকেরা নিরাশ হয়ে গেল এবং সত্যানুসারীদের মনোবল বৃদ্ধি পেল, অধিকন্তু দুর্বল ঈমানদারদের ঈমান চাঙ্গা হয়ে উঠল।[২৮]

এটা শুধু একটি ঘটনার বিশ্লেষণ ছিল। আসলে কিন্তু তথায় প্রতি পদে পদে বিপদ ছিল। অশিক্ষিত জনসাধারণ হতে শিক্ষিত আলেম ও মাশায়েখ পর্যন্ত সকলেই বিদ'আতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন। ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের আন্দোলনে এবং তাঁর অক্লান্ত জদ্দ ও জেহাদে বহু শতাব্দির

---

[২৮] উনওয়ানুল মাজ্‌দ ৯-১০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

অন্ধকার ও ভ্রষ্টতার ঘনঘটা বিদূরিত হল, সত্যের বিকাশ ঘটল এবং বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার সাথে আল্লাহর মহান সৃষ্টি মানুষের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল।

শায়খুল ইসলাম আমীর ওসমান বিন মোআম্মরকে জামাতে নামায আদায় করার প্রথা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাগিদ দিলেন এবং শিথিলতাকারীদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। শাসনকর্তারা জনসাধারণের উপর বিভিন্ন ধরণের কর ধার্য্য করেছিলেন। শায়খ কর্তৃক তা বাতিল করা হয় এবং কড়াকড়িভাবে জাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। উয়ায়নায় অবস্থানকালে শায়খ সাহেব ইবনে মোআম্মারের দ্বারা এ দু'টি অতি উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শত্রুরা দোষ আবিষ্কারের চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

উয়ায়নাতে অবস্থানকালে শায়খ তাঁর প্রচারমূলক বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং অন্তিমকাল পর্যন্ত তা অবিরাম গতিতে চলতে থাকে। দরঈয়াতেও তাঁর কিছু সংখ্যক সমর্থক ছিলেন, উয়ায়না হতেই তিনি তাদের নামে উপদেশ সম্বলিত পত্রাদি প্রেরণ করেছিলেন।[২৯]

উয়ায়না হতে বহিষ্কার

উয়ায়নাতে শায়খের আন্দোলন ও সংস্কার প্রচেষ্টা সাফল্য ও পূর্ণতা লাভের পথে অগ্রসর হচ্ছিল, এমন সময় একটি বিপদ দেখা দিল। এটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিপদ বলে মনে হলেও এতে বহু মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত ছিল।

ঘটনাটি এই যে, জনৈকা বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় এবং শায়খের সম্মুখে নীত হলে সে তার অপরাধ স্বীকার করে।[৩০] বার বার প্রতিবাদেও সে তার স্বীকারোক্তি পরিত্যাগ করতে সম্মত না হলে, শায়খুল ইসলাম তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দান করলেন। ওসমান বিন মোআম্মর মোসলমানদের এক জমাতসহ এ নির্দেশ কার্য্যকরী করেন এবং স্ত্রীলোকটির প্রতি সর্বপ্রথম তিনিই প্রস্তর নিক্ষেপ করেন।

---

[২৯] রওযাতুল আফ্কার (১) ২০০ পৃষ্ঠা।

[৩০] রওসাতুল আফ্কার (১) ২০০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

এই আশাতীত ঘটনায় পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুর্বল ঈমান মুসলমানের মধ্যে- বিশেষতঃ পাপাচারে অভ্যস্ত সমাজের মধ্যে দারুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তাদের একদল এহ্ছা ও কোতায়ফের শাসনকর্তা সোলায়মান বিন মোহাম্মদ আজিজুল হুমায়দীর নিকট গমন করে তাকে শায়খের বিরুদ্ধাচরণে প্রস্তুত করে। এ লোকটি অতি নিকৃষ্টতম বহুরূপী ও উচ্ছৃঙ্খল এবং লম্পট প্রকৃতির ছিল। রজমের (প্রস্তরাঘাতে নিহত করার) ঘটনাটি তাকে ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত ও উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দুস্কৃতিকারীরা তাকে এও বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করল যে, ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হচ্ছেন। ফলে সে উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং তৎক্ষণাৎ উয়ায়নার আমীর ওসমানকে শাসিয়ে পত্র লিখে–

এই মুত্বে (মওলবী)[৩১] যে তোমার নিকট অবস্থান করছে সে এরূপ এরূপ ... ... কাজ করেছে, তাকে হত্যা কর। অন্যথায়, আমরা তোমাকে যে সব সাহায্য করতাম তা বন্ধ করে দেয়া হবে। আমীর ওসমান সোলায়মান হুমায়দীর নিকট হতে যে সাহায্যপ্রাপ্ত হতেন তার পরিমাণ ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য আসবাব ও মালপত্র ছাড়াও বার্ষিক বারশত দীনার স্বর্ণমূদ্রা ছিল এ সাহায্যের পরিমাণ। ফলে এর দারুন প্রভাব ইবনে মোআম্মরের উপর পড়ল। সে এরূপ চিন্তিত হয়ে পড়ল যে, পার্থিব ভোগ-বিলাস ও অর্থ সামগ্রীর মোহ তাওহীদের সমর্থনের চেয়ে অধিক প্রাধান্য লাভ করল। কারণ তার মন তাওহীদের প্রেমে তখনও পূর্ণত্ব লাভ করতে পারেনি। সে জ্ঞাত ছিল না যে, সত্যের সহায়তাকারীদের জন্য অজস্রধারায় নেমে আসে আল্লাহর অফুরন্ত পুরস্কার। এ দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যেই উসমান এহ্ছার শাসনকর্তা সোলায়মানের পত্রের সংবাদ শায়খ সাহেবেকে জ্ঞাত করেন। শায়খ তাকে সান্ত্বনা দান করেন এবং অতি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেন। ইবনে বিশ্‌রের ভাষায় শায়খের নিম্নলিখিত শব্দগুলো প্রনিধানযোগ্যঃ-

---

[৩১] মুত্বে مطوع বহুবচনে মুতবে' নজদবাসীর পরিভাষায় মওলবী এবং ফকীহকে মুতবে' বা মুতাবে' বলা হত। তওহীদ পন্থিদের নতুন সংগঠন এখওয়ানেও প্রচারকদলকে মুতাবেরা বলা হয়।

http://www.shottanneshi.com

إن هذا الذي انا قمت به ودعوت إليه كلمة لا إله إلا الله واركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان أنت تمسكت به ونصرته فإن الله سبحانه يظهرك على أعدائك فلا يزعجك سليمان ولا يفزعك.....الخ-

দেখুন! আমি যে ব্যাপারে দন্ডায়মান হয়েছি এবং যার দিকে আমি লোকদের আহ্বান করছি তা হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পবিত্র কালেমা, আরকানে ইসলাম ও আম্‌র বিল মা'রূফ ও নহী আনিল মুনকার! যদি আপনি দৃঢ়তার সাথে তা অবলম্বন করেন এবং সাধ্যমত তার সাহায্য মদদ করতে থাকেন, তা হলে আল্লাহ আপনাকে দুশমনদের উপর জয়ী করবেন- সোলায়মানের হুমকিতে বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ নেই।[৩২]

শায়খুল ইসলাম তাকে আশ্বস্ত করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু দুনিয়ার মোহ আর সম্পদ হারানোর আশঙ্কা যার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, কোন সৎ উপদেশই তাতে কার্যকরী হয় না- হতে পারে না। শায়খের উপদেশে উসমান কিছুক্ষণের জন্য নিবৃত্ত হলেও বেশীদিন স্থির থাকতে পারলেন না। স্বয়ং অধিক বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং শায়খের নিকট পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে পত্র পাঠালেন–

"সোলায়মান আপনাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে এবং তার নির্দেশ অমান্য করার সামর্থ্য আমার নেই, অথচ আমার নিজের গৃহে আপনাকে হত্যা করা মনুষ্যত্বের বিপরীত কার্য্য বলে আমি বিশ্বাস করি। অতএব স্বেচ্ছায় আমার এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি।" উনওয়ান, ১১ পৃষ্ঠা।

এরূপ অনুরোধ জানিয়ে উসমান শায়খুল ইসলামকে তার ফরিদুযজুফাইরী নামক একজন সিপাহীর সঙ্গে করে উয়ায়নার সীমানা পার করে দিল। এ বহিস্কারের কাহিনীও অতি মর্মান্তিক। আরবের উত্তপ্ত মরুভূমি। প্রখর রৌদ্র তাপ। শায়খ উলঙ্গ পায়ে হেঁটে চলেছেন। হাতে একটি মাত্র পাখা। পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী সিপাহী ফরিদ। ইবনে বিশ্‌র এও লিখেছেন যে, উসমান বিন মোআম্মর গোপনে তার সিপাহীকে শায়খকে হত্যা করার নির্দেশও দিয়েছিল। শায়খ "ওমাঁইইয়াত্তাকিল্লাহ ইয়াজ্ আল্লাহু মাখরাজাঁও ওয়া ইয়ারযুকুহু মিন হাইসু লা ইয়াহ্তাসিব"।

---

[৩২] উনওয়নুল মাজ্‌দ-, ১০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

অর্থাৎঃ যারা আল্লাহকে সমীহ করে চলে, তিনি তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করেন এবং অভাবনীয়সূত্রে তাদের রিয্ক দান করেন– এ অজিফা পাঠ করতে করতে যাচ্ছিলেন। সিপাহীটি রাস্তায় শায়খের সাথে কোন কথাই বলেনি। কিন্তু সে তাঁকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হল, তখন তার বিবৃতি অনুসারেই কোন অদৃশ্য হস্ত তার হস্ত অবরোধ করে দিল। ফলে সে এরূপ প্রভাবিত হল যে, তখনই উয়ায়নার দিকে প্রত্যাবর্তন করল। সত্যের প্রভাবে সে তার প্রাণের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

দরঈয়ায় ১১৫৭-৮ হিঃ

ইবনে মোআম্মরের শাসন সীমা অতিক্রম করে শায়খ দরঈয়ার দিকে রওয়ানা হলেন এবং ঠিক আসরের সময় তথায় পৌঁছলেন। প্রথমে তিনি আবদুল্লাহ্ বিন আবদুর রহমান সোয়ায়লাম আল উয়ায়নীর গৃহে অবতরণ করেন। অতঃপর তাঁর শিষ্য আহমদ বিন সোয়ায়লমের গৃহে স্থানান্তরিত হন। শায়খের আগমন সংবাদ পেয়ে দরঈয়ার আমীর মোহাম্মদ বিন সউদ স্বীয় ভ্রাতৃদ্বয় মোশারী ও সুনাইয়ার সাথে শায়খের খিদমতে হাজির হন এবং সকলেই শায়খের অনুসরণ ও সাহায্যের দৃঢ় আশ্বাস দান করেন।[৩৩]

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইবনে গান্নাম হতে গৃহীত হয়েছে। বস্তুতঃ, শায়খুল ইসলামের তবলীগী জীবনে এ ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইবনে বিশ্র এর কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন। ইবনে গান্নামের বিবরণ উল্লেখ করার পর আমরা তাই নিম্নে ইবনে বিশরের রেওয়ায়াতও উল্লেখ করছি।

শায়খ আসরের সময় দরঈয়ায় উপনীত হন এবং মোহাম্মদ বিন সোয়ায়লাম উয়াইনীর ন্যায় একজন ভাগ্যবান সৎব্যক্তির গৃহে অবতরণ করেন। তিনি আরবের চিরাচরিত সদাচরণশীলতা ও মেহেমানদারীর উন্নতমান রক্ষার্থে কিছুই বলতে পারলেন না, তবে আমীরের ভয়ে তিনিও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। শায়খুল ইসলাম (তা উপলব্ধি করে) তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং উপদেশ দিয়ে বললেন, سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا "শীঘ্রই আল্লাহ তোমার ও আমাদের কল্যাণের একটি সুব্যবস্থা করে দিবেন।

---

[৩৩] রাওযাতুল আফকার (২) ৪ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

আমীর মোহাম্মদ বিন সউদের সহযোগিতা

ইবনে সোলায়মানের গৃহে অবস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে তা তওহীদী আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেল। জনসাধারণ গোপনে সেখানে শায়খের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। আলেম সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হতে লাগলেন। কিন্তু এ অবস্থা নিরাপদ ও সন্তোষ জনক ছিল না, সুতরাং শায়খ আমীরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন এবং এ সম্পর্কে আমীরের ভ্রাতা মুশারী ও দুমাইয়ার সাথে পরামর্শ করলেন। তারা প্রথমে আমীরের স্ত্রী মোজা বিন্‌তে আবু দাহতানের নিকট শায়খের জ্ঞান-গরিমার প্রশংসা করলেন। তিনি অতি বিদুষী ও ধর্মপরায়না মহিলা ছিলেন, তাঁকে আমীরের নিকট শায়খের প্রসঙ্গে উত্থাপন করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করলেন। আল্লাহর মর্জ্জি এটাই ছিল। সহজেই মোজার অন্তরে শায়খের জ্ঞান গরিমার ছাপ পড়ে গেল এবং তিনি আমীরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ-

"আল্লাহ তোমার নিকট এ নে'য়ামত-মহাদান প্রেরণ করে দিয়েছেন, তাঁর সাহায্য সহায়তায় অগ্রসর হও, তোমার ইহ-পরকাল কল্যাণকর হবে।"

আমীর মোহাম্মদ বিন সউদ অতি চরিত্রবান বলে বিখ্যাত ছিলেন। স্ত্রীর কাথাগুলো তার অন্তরে দাগ কাটল এবং তিনি শায়খের একান্ত অনুরাগী হয়ে পড়লেন। তাঁর অন্তরে শায়খের মোহাব্বত স্বীয় আসন করে নিল। সকলের অনুরোধ উপরোধে তিনি স্বয়ং শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। শায়খুল ইসলাম এ সুযোগে তাঁর আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো (যথা কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লার তাৎপর্য্য, আম্‌র বিন মা'রূফ, নাহি আনিল মুন্‌কার ও জেহাদ) সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং নজদবাদীসের অনাচার সম্পর্কে আমীরকে অবহিত করেন, তাদের সংশোধনের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শায়খের তেজোদৃপ্ত ভাষণে আমীর অভিভূত হয়ে তখনই বলে উঠলেনঃ-

শায়খ হে! এ তো আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সঠিক) দ্বীন, সন্দেহ নেই। এতে আমি আপনার অনুসরণ করব, এমন কি তাওহীদের বিরোধীদের সাথে জেহাদ করতেও আমি প্রস্তুত আছি! তবে এতে আমার দু'টি শর্ত আছেঃ-

http://www.shottanneshi.com

(১) আমরা যদি আপনার সাহায্য করি এবং আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করেন, তা হলে আপনি আমাদের পরিত্যাগ করবেন না,

(২) ফসল তোলার সময় দরঈয়াবাসীদের নিকট হতে আমি একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর আদায় করে থাকি, আপনি তাতে বাধা দিবেন না।

উত্তরে শায়খ বললেন:-

আপনার প্রথম শর্ত সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করছিঃ الدم بالدم والهدم بالهدم আমার ও আপনার রক্ত এক ও অভিন্ন এবং আমার ধ্বংস (আমাদের ভাল-মন্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকল।) আর দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আল্লাহ বিজয়ী করলে ইনশাআল্লাহ গণীমতের এত সম্পদ হস্তগত হবে যে, এ সামান্য কর গ্রহণের ধারণাও আপনার মনে জাগবে না।

অতঃপর আমীর শায়খের হাতে বয়আৎ (দীক্ষা) গ্রহণ করে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল্ মুন্কারের দায়িত্ব পালনের প্রতিজ্ঞা করলেন এবং নিজেও কিতাব ও সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপনের জন্য তৈয়ার হলেন। এটি ১১৫৭ অথবা ১১৫৮ হিজরী সালের ঘটনা।[৩৪] আমীরের বয়আৎ গ্রহণের পরেই লোকেরা দলে দলে শায়খের খিদমতে হাজির হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতঃ নিজেদের ঈমান ও আমলের সংশোধন করতে লাগল। উয়ায়নায় অবস্থানকারী শায়খের পুরাতন ভক্ত অনুরক্তগণ দরঈয়ায় চলে আসলেন এদের মধ্যে স্বয়ং উসমান বিন মোআম্মরের কতিপয় নিকটাত্মীয়ও ছিলেন।

ভক্তদের প্রথম দল

উয়ায়নাতে অবস্থানকালে কিছুসংখ্যক লোক শায়খের আহবানে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ বিদআৎ ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার কারণে সাধারণতঃ লোকেরা সত্য গ্রহণে ইতস্ততঃ করছিল। দরঈয়ায় অবস্থান এবং আমীর মোহাম্মদ বিন সউদের সুখ্যাতি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য

---

[৩৪] ইবনে গান্নাম এ সব ঘটনার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করেছেন এবং ১১৫৭ হিজরীর মধ্যেই তা সীমিত করেছেনঃ كانت هذه الأمور في حدود وخمسين بعد المائة والألف من الهجرة ج ٢-٤। পক্ষান্তরে ইবনে বিশ্‌র দরঈয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার সময় ১১৫৮ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন, (১৫ পৃষ্ঠা)। আমরা উনওয়ানুল মজ্‌দ হতে বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত করেছি, (১) ১১ ও ১২ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

উত্তম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিল। সমস্ত ভাগ্যবান লোক প্রথম হতেই অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল এবং এ ব্যাপারে নিজের ও নানা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। ইবনে গান্নামের অনুগ্রহে তন্মধ্যে কতিপয় নাম আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

উচ্চবংশীয় ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে আমীর মোহাম্মদ বিন সউদের তিন জন ভ্রাতা মুশারী, সুনাইয়া ও ফরহানের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[৩৫] আলেমদের মধ্যে আহমদ বিন সোয়ায়লম এবং ঈসা বিন কাসেম অত্যধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। সাধারণ প্রভাবশালীদের মধ্যে মোহাম্মদ আল হুযায়মী, আবদুল্লাহ বিন দুগাইশির, সোলায়মান আবু শায়কিরী ও হাম্দ বিন হুসাইনের নাম সর্বজনবিদিত। ঐতিহাসিক ফেলবীর (১২-১৩ পৃঃ) বর্ণনানুসারেঃ

"এরা ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের প্রথম বীর কর্ম্মী ছিলেন। তাঁদের নাম আজ পর্যন্ত অতি সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয়ে থাকে। তাঁদের সন্তানাদিও সোলতানের দরবারে সম্মানের অধিকারী বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

ওসমান বিন মোআম্মরের দ্রুত অনুশোচনা

আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার খবর প্রাপ্ত হয়ে ইবনে মোআম্মার স্থির থাকতে পারিলেন না। তিনি নিজের অতীত ক্রিয়া কলাপের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে উয়ায়না প্রত্যাবর্ত্তনের অনুরোধও জানালেন। উত্তরে শায়খ স্পষ্টভাবে তাকে জানিয়ে দিলেন যে, "এখন তা আমীর ইবনে সউদের অধিকারভুক্ত। তিনি অনুমতি দিলে আমি প্রস্তুত আছি। অন্যথায় তাঁকে পরিত্যাগ করা এবং অন্য কারও সাহচর্য গ্রহণ করা আদৌ সম্ভবপর নয়।"

---

[৩৫] এ আন্দোলন এবং পরবর্তীকালের যুদ্ধবিগ্রহে আমীর মোহাম্মদ বিন সাউদের ও তাঁর গোত্রের সকল লোকেরাই বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আমরা এখানে শুধু শায়খুল ইসলামের আন্দোলন সম্পর্কেই আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে সুনাইয়ান বিন সউদ (মৃত ১১৮৬ হিঃ) ও মুশারী বিন সউদ (মৃতঃ ১১৮৯ হিঃ) অধিক খ্যাত। মুশারী স্বীয় ভ্রাতার বিশেষ সাহায্য করেছেন। সুনাইয়া বিন সাউদ অন্ধ ও অতি পরহেজগার ছিলেন। তাঁরই পরামর্শে মোহাম্মদ বিন সউদ শায়খের সাহায্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। -রওয়াতুল আফ্কার (২) ৯৪-০৫ পৃষ্ঠা, উনওয়ানুল্ মাজ্দ (২) ৯-১০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

এরূপ স্পষ্ট জবাব পেয়ে ইবনে মোআম্মর নিজেই আমীর বিন সউদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি এ অমূল্য সম্পদকে কোনভাবেই নিজের গৃহ হতে আলাদা করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

কর্মতৎপরতার যুগ

শায়খের আগমনের পূর্বে দরঈয়া একটি ক্ষুদ্র শহর ছিল। এর অধিবাসীরা সাধারণতঃ নিরক্ষর ছিলেন। এই নিরক্ষরতার অভিশাপকে দূর করার জন্য শায়খুল ইসলাম সর্বপ্রথম শিক্ষা বিস্তারের বিধি ব্যবস্থা করলেন। তাঁর নিকট আগমনকারী লোকদের শিক্ষা দানের ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করলেন। সকাল হতে বিকাল পর্যন্ত তিনি তাদেরকে কিতাব ও সুন্নতের শিক্ষা দান করতেন এবং দা'ওয়াতে তওহীদ ও আল্লার এবাদতে নিষ্ঠাবান হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়ার চেষ্টা করতেন। শায়খের আকর্ষণীয় সত্তা এবং তাঁর আন্দোলনের সত্যতা ও বাস্তবতা দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। ওয়াজ নসীহতের মজলিশ পরিচালিত হওয়ার সুফল এই দেখা দিল যে, "মা আলফাইনা আলায়হি আবাআনার" (বাপ দাদাকে যা করতে দেখেছি আমরা তাই করব) এর মরীচিকা মানুষের অন্তর থেকে বিদূরিত হতে লাগল এবং তৎকালীন সর্বপ্রকার রসম রেওয়াজকে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাচাই করতে লাগলেন। এইসব মজলিশের আকর্ষণে দূরদূরান্ত হতে বিদ্যানুরাগী ছাত্রসমাজ দরঈয়া আগমন করতে লাগল। এখানের খাদ্য সংঙ্কটের ফলে জ্ঞান ও আমলের পিপাসুদের অনেকেই রাত্রিকালে কোন না কোন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং দিবসকে আল্লাহর কেতাব ও রসূলের সুন্নতের পঠন ও পাঠনের জন্য ওয়াক্ফ করতেন। শিশুদের ও ভক্তগণের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের আহারাদি সংস্থানে শায়খ সাহেবের প্রচুর অর্থ ব্যয় হত। ফলে তিনি সর্বদা ঋণগ্রস্ত থাকতেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাঁর আন্দোলনেরর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। তাঁর খিদমতে সর্বক্ষণ লোকজনের ভীষণ ভীড় লেগেই থাকত।[৩৬]

---

[৩৬] উনওয়ানুল মাজ্দ; ১৫-২৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

আন্দোলনের সম্প্রসারণ

শায়খের আগমনের সঙ্গেই দারঈয়াবাসীগণ শায়খের ভক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি এতে ক্ষান্ত না হয়ে নজদের বিভিন্ন এলাকার এবং তার প্রধান ব্যাক্তিদের নিকট দাওয়াত পেশ এবং তা গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন। এতে তাঁর বিরুদ্ধাচরণও করা হল এবং তাঁর প্রতি নানারূপ দোষারোপও করা হল। কিন্তু তথাপি সত্যের প্রভাব ও ন্যায়ের আলো বিকশিত হতে লাগল এবং চতুর্দ্দিকে ধীরে ধীরে তার সুফল ফলতে লাগল। দরঈয়ায় অবস্থানের দ্বিতীয় বৎসরেই ১১৫৮ অথবা ১১৫৯ হিজরীতে উয়ায়নার আমীর তাঁর নিকট বয়আৎ গ্রহণ করলেন এবং তথায় শরীয়তের বিধিবিধান প্রবর্ত্তনের ওয়াদা করলেন। এদিকে আমীর মোহাম্মদ বিন সউদের সাহায্য মদদ ক্রমবর্দ্ধমানহারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল। তিনি গনীমতের মালের পঞ্চমাংশ (খুমুস) ও জাকাতের সম্পূর্ণ অর্থ শায়খের নিকট প্রদান করতে লাগলেন এবং তিনি তা আল্লাহর রাহে নিঃসঙ্কোচে ব্যয় করতে লাগলেন। আমীর মোহাম্মদ বিন সউদ এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত আবদুল আজীজ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ ১১৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৭৬৫ সালে পিতার ইন্তেকালের পর আমীর পদে বরিত হওয়ার পর শায়খের অনুমতি ছাড়া কোনরূপ ব্যয় করা জায়েজ মনে করতেন না। পক্ষান্তরে শায়খের নিষ্ঠা ছিল এরূপ যে, তিনি নিজের কাছে একটি কপর্দকও রাখতেন না। যা কিছু পেতেন, তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিতেন।

ইবনে বিশ্‌র বলেন (১৫ পৃষ্ঠা) যে, খুমুস এবং যাকাতের যে অর্থ পাওয়া যেত শায়খ তা বন্টন করে দিতেন। ফলে তিনি সর্বদা ঋণী থাকতেন। ১১৮৭ হিজরীতে (১৭৭৩ ইং) রিয়াদ বিজয়ের সময় শায়খের ঋণের পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার যা পরে গনীমতের সম্পদ হতে পরিশোধ করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এ ঋণ আন্দোলনের প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল এবং রিয়াজ[৩৭] বিজয়ের সময় পর্যন্ত এ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। অতঃপর রিয়াজ বিজয়ের পর যখন আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে শায়খ একটু আশ্বস্ত হলেন, তখনই তিনি আমীর আবদুল

---

[৩৭] উনওয়ানুল মাজ্‌দ ১৫ পৃষ্ঠা, ১১৮৭ হিজরির রবিউসসানীর শেষের দিকে অথবা তৎপর জুলাই ১৭৭৩ সালে রিয়াজ বিজয় সম্পূর্ণ হয়।

http://www.shottanneshi.com

আজীজকে সর্ববিষয়ের দায়িত্ব প্রদান করে নিজে বয়তুল মালের দায়িত্ব হতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করলেন। এখন হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করলেন। অবশ্য আমীর আবদুল আজীজ তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ ব্যতিত কোন কাজই করতেন না। বরং প্রত্যেক কাজেই শায়খুল ইসলামের মতকেই প্রাধান্য দান করতেন।

ব্যাপক প্রচার

এ পর্যন্ত শায়খুল ইসলামের আন্দোলন নজদের জেলাসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তার রূপ ছিল ব্যাপক ধরণের। অধিকন্তু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা শুধু নজদেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সমগ্র ইসলাম জগতই পতনোন্মুখ ছিল। অবশ্য সংস্কারের সূচনা নিজ গৃহ হতেই হয়ে থাকে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই উয়ায়না, হুরায়মালা ও আরিজের অন্যান্য শহরগুলো সর্বপ্রথম শায়খের সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সমস্ত এলাকায় নবজীবনের চিহ্নসমূহ পরিস্ফুটিত হয়ে যায়। শায়খুল ইসলাম তাঁর আন্দোলনকে অধিক প্রসারিত করলেন। দূর দূরান্তের শহর ও নগরের অধিবাসী আলেম, আমীর ও কাজীগণের নিকট প্রচারপত্র ও দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হল এবং তাদেরকে আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহ্বান জানানো হল। প্রথমে অতি অল্প লোকই তাঁর আকুল আহ্বানে সাড়া দিলেন বরং অধিকাংশই শায়খের বিরুদ্ধাচরণ করতে এবং শায়খের আন্দোলনকে হাস্যাস্পদ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কেউ তাঁকে অজ্ঞ, কেউ তাঁকে যাদুকর বলে অভিহিত করল এবং কেউ কেউ তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করতেও ত্রুটি করল না। দাওয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন সানআ' বা য়্যামেনের যশস্বী আলেম ও স্বীয় যুগের বিখ্যাত মুজতাহিদ আমীর মোহাম্মদ বিন ইসমাঈল সানআনী।[৩৮] তিনি শায়খের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর বিখ্যাত মর্মস্পর্শী

---

[৩৮] আমীর মোহাম্মদ বিন ইসমাঈল য়্যামানী সানআনী স্বীয় যুগের ইমাম এবং মুজতাহীদে মোতলক (সংস্কারক) ছিলেন। ১১৯১ হিজরীর ১৫ই জমাদিউসসানীর (১৬৮৭ সাল) শুক্রবার রাত্রে কাহলান নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৮২ হিজরীর (১৭৬৯ ইং) ৩রা শা'

বান মঙ্গলবার দিবস ইন্তেকাল করেন। তওহীদ সম্পর্কীয় তার রচিত পুস্তিকার ("তৎহীরুল এ'তেকাদ আন্ আদরানিল ইলহাদ') উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। পরেও আসবে। তাঁর পুস্ত

http://www.shottanneshi.com

কবিতাটি রচনা করেন। সুধী সমাজে তা অতি সমাদরে গৃহীত হয়। এর প্রথম পংক্তিটি এরূপঃ-

سلامي على نجد ومن حل بالنجد – وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي

অর্থাৎঃ- নজদ এবং নজদে অবতরণকারীর (শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের) প্রতি আমার সালাম; যদিও দূর হতে প্রেরিত এ সালামের বিশেষ উপকারিতা নেই।

কবিতায় শায়খের উচ্চ প্রশংসা, বিদআতের কুৎসা এবং ওয়াহ্দাতুল অজুদ নামক মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ ছাড়াও আরও বহু মুল্যবান বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

আমীর মোহাম্মদ বিন ইসমাঈল শায়খুল ইলমামের দাওয়াতে এজন্য অধিক সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি যে মত পোষণ করতেন তাতে নিজেকে একক বলে মনে করতেন। তিনি তাঁর কবিতার একস্থানে একথা উল্লেখও করেছেন। তিনি বলেছেন–

لقد سرني ما جائني من طريقه – وكنت اري هذه الطريقة لي وحدي

(তাঁর দাওয়াত পদ্ধতির অবস্থা শ্রবণে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি এজন্য যে, ইতোপূর্বে এ কর্মপদ্ধতিতে আমি নিজেকে একক মনে করতাম।)

আমীর য়্যামানীর কবিতা এবং সমর্থনে শায়খেরও যথেষ্ট উপকার হয়েছে। কোন কোন পুস্তকে তিনি স্বয়ং এদিকে ইংগিতও করেছেন।[৩৯]

শায়খুল ইসলামের ভ্রাতা সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (মৃতঃ ১২০৮ হিঃ) স্বীয় পিতার স্থলে হুরায়লামার কাজি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম দিকে তিনিও শায়খের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তার প্রতিবাদে পুস্তিকাও প্রণয়ন করেন, কিন্তু তা ভ্রান্ত বিবরণে পূর্ণ ছিল। ইবনে গান্নামের ভাষায় তিনি শুধু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। শায়খুল ইসলাম তার বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

কাবলীর জন্য ক্রকলেমস (পরশিষ্ট (২) ৫৬ পৃষ্ঠা) এবং অন্যান্য অবস্থার জন্য আলবদরুত্তালে' (২) ১৩৩-৯ ও উনওয়ানুল মাজদ্ (১) ৫৪-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[৩৯] ইবনে গান্নাম (২) ৫৪-৬ পৃষ্ঠা (১৭) ৫৬-৮ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

শায়খুল ইসলামও তার প্রতিবাদে পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। কিন্তু অবশেষে সত্যের তেজবাষ্পে তার অন্তর উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং শায়খের খেদমতে স্বয়ং হাজির হয়ে তওবা করেন।[৪০]

(رجع إلى أخيه بالدرعية تائبا سنة ١١٩٠ – فأحسن الشيخ واكرم مثواه

১১৯০ হিজরিতে তওবা করে স্বীয় ভ্রাতার নিকট দরঈয়া আগমন করেন এবং শায়খুল ইসলামও তাঁর যথাযথ সম্মান করেন এবং তার সাথে উত্তম ব্যবহার করেন।

সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের পুস্তিকাটি "আস্ সওয়ায়েকুল এলাহিয়াহ্ ফিররদ্দে আলাল ওয়াহ্হাবিয়াহ্" মুদ্রিত পাওয়া যায়। শায়খ বিরোধীরা এ পুস্তিকার উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু সোলায়মানের তওবা ও "প্রত্যাবর্তনের" কথা উচ্চারণও করেন না। ১১৬৭ হিজরীতে সোলায়মানের বিরুদ্ধাচরণ তীব্র আকার ধারণ করে এবং এ বৎসরেই শায়খুল ইসলাম বিভিন্ন স্থানের মোসলমানদের সমবেত করে তাদের সম্মুখে তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করেন।

আন্দোলনের মূলভিত্তি এবং তার সমর্থন ও বিরোধিতার বিস্তারিত বিবরণের আলোচনা পরে আসছে। এখানে শুধু তার ব্যাপকতা প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য। জ্ঞানপিপাসু ছাত্র দলের দরঈয়াতে আগমন অব্যাহত ছিল। তদুপরি শায়খের প্রচারমূলক পুস্তকাদি, প্রচারক দল এবং উপদেশমূলক পত্রাদি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

ইবনে দৌওয়াস ও অন্যান্য বিরোধীগণ

দরঈয়ায় অবস্থানের তৃতীয় বৎসরেই (১১৫৯ হিজরী) রিয়াজের শাসনকর্তা দাহ্হাম বিন দৌওয়াসের বাড়াবাড়িতে শায়খ এবং আমীর মোহাম্মদ বিন সউদের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হয়। রিয়াজ ও মনফুহার তাওহীদ পন্থীদেরকে শুধু শায়খের আনুগত্যের অপরাধে সে বিভিন্ন অত্যচারের শিকারে পরিণত করে। অনন্যোপায় হয়ে অবশেষে শায়খও তাঁর ভক্তদের তার মোকাবেলা ও সংগ্রামের নির্দেশ দান করেন। অতঃপর আমীর মোহাম্মদ বিন সউদ ও তাঁর ভ্রাতা ও পুত্রগণ রিয়াজাধিপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন এবং শত্রুদের পর্যুদস্ত ও পরাভুত করেন।

---

[৪০] ইবনে গান্নাম (২) ১০৮ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

দীর্ঘদীন ধরে এ সংগ্রাম চলতে থাকে। রিয়াজাধিপতি দাহহ্াম বিন দৌওয়াসের সাথে দীর্ঘ ২৫/৩০ বৎসর ব্যাপী সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। হিজরী ১১৫৯ সাল হতে ১১৮৭ সাল পর্যন্ত উভয় শক্তি সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। অবশেষে ১১৮৭ হিজরীতে সুলতান আবদুল আজীজ বিন মোহাম্মদ বিন সাউদের নূতন অভিযানের সংবাদ পেয়ে ইবনে দৌওয়াস শহর পরিত্যাগ করে পলায়ন করে এবং নজদের কেন্দ্রস্থল রিয়াজে আমীর আবদুল আজীজের পূর্ণ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[৪১]

এ সময় পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শক্তিবর্গও হামলা চালায়। ওসমান বিন মোআম্মরও বারংবার প্রতারণা করে। নজদবাসী ও শায়খের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি দেখে বিরোধীরা যুদ্ধের পরিবর্তে কুৎসা রটনার পথ বেছে নেয়। সোলায়মান বিন মোহাম্মদ বিন সোহায়ম কর্তৃক শায়খের প্রতি অতি মিথ্যা ও জঘন্য অপবাধ আরোপ করা হয়। নানারূপ ভিত্তিহীন পাপাচারে শায়খকে কলুষিত করার চেষ্টাও করে এবং মিথ্যা অপবাদ সম্বলিত পুস্তিকা রচনা করেও সে তা পারস্য উপকূলবর্তী এলাকা ও এহ্সা প্রভৃতি দেশে বিতরণ করে। এ সব পুস্তিকার মধ্যে শায়খ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মাত্র একটির বিস্তারিত জওয়াব দিয়েছেন। মিথ্যা অপবাদসমূহ এবং জওয়াবের ধরণ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। একদিকে তথাকথিত ইল্ম ও আমলের ঠিকাদারেরা ছিল, আর অপর দিকে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকার সর্দারগণ নিজেদের প্রাধান্য রক্ষার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীদের সর্বোতভাবে সাহায্য সহায়তা করতে থাকে।[৪২]

উপরোক্ত সকল প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আন্দোলন দ্রুত বিস্ত ার লাভ করতে লাগল এবং তার একনিষ্ঠ সেবক প্রচারক আলেমগণ দরঈয়া অতিক্রম করে নজদের সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়লেন। এরূপে অন্ততঃ আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (আমার মাতাপিতার নামে উৎসর্গিত হোন) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাসমূহ তার আসলরূপে প্রতিষ্ঠিত ও উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত দুর্বার গতিতে এ সংগ্রাম ও প্রচার চলতে থাকল।

---

[৪১] ফেলবী কৃত ARABIA, ১৩-২৫ পৃষ্ঠা।

[৪২] ইবনে গান্নামঃ ১১,২৭, ৭৮, ১৪২, ১৬৭

http://www.shottanneshi.com

ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের ইন্তেকাল

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ব্যাপী সংস্কার আন্দোলন (দাওয়াত ও তবলীগ) পরিচালনার পর ১২০৬ হিজরীর শওয়াল অথবা জুল্কা'দা (জুন অথবা জুলাই ১৭৫২) মাসে শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ইন্তেকাল করেন।[৪৩]

দুনিয়া ও দুনয়ার সম্পদ সামগ্রীর লোভ ও মোহ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও বেনিয়াজ (বেপরোওয়া) অতি বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন শায়খুল ইসলাম বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নজ্দী (রাহমাতুল্লাহে তা'য়ালা আলাইহি)। তাঁর ন্যায় নিজের জীবদ্দশায়ই এরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব লাভকারী লোকের সংখ্যা ইতিহাসে অতি বিরল।

শায়খের অন্যতম শিষ্য ঐতিহাসিক ইবনে গান্নাম[৪৪] শায়খুল ইসলামের ইন্তেকালে একটি অতি মর্মস্পর্শী শোকগাথা লিখেছিলেন। এর প্রথম পংক্তিটি এরূপঃ-

إلى الله في كشف الشدائد نفزع – وليس إلى غير الله المهيمن مفزع

(বিপদ মুক্তির জন্য আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি- বস্তুতঃ তিনি ব্যতীত আশ্রয়স্থল আর কোথাও নেই)।

মোহাম্মদ হামিদ ফকী[৪৫] কাজী মোহাম্মদ বিন আলী শওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ) কর্তৃক বিরচিত একটি শোকগাঁথা (مرثية) উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রথম পংক্তিটি নিম্নরূপঃ-

مصاب دها قلبي فاذكي غلائلي – واصمي بهم الافتجاع مقاتلي

একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য

ইসলামের ইতিহাসে এরূপ বারংবার ঘটেছে যে, বহু অসাধারণ লোকেরা মেহ্দী অথবা মসীহের রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছেন যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ তাদের অস্তিত্ব ধর্মের পক্ষে ফলদায়ক হওয়ার

---

[৪৩] ইবনে গান্নাম (২) ৭৪ পৃষ্ঠা; ইবনে বিশর (২) ৯৫ পৃষ্ঠা। অন্যান্য অধিকাংশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ শায়খের মৃত্যু সন নির্ধারণে ভুল করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ব্রুকলমন (পরিশিষ্ট (২) ৫৩০; মার্গোলিথ (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (৪) ১০৮৬); লবীব বতনুনী (আররেহলাতুল হেজাযীয়াহ, ৮৭ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

[৪৪] রওযাতুল আফ্কার, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

[৪৫] আনরুত দা'ওয়াতিল ওয়াহ্হাবীয়াহ ফী জাযিরাতিল আরব: ৭৮-৮০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

পরিবর্তে দ্বীন এবং দ্বীনের ঐক্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়েছে। আমরা একে শায়খুল ইসলামের আন্দোলনের চরম সাফল্য মনে করি যে, তাঁর শিক্ষাসমূহ এবং তাঁর ভক্ত অনুরক্তগণ কল্পনা বিলাসিতা হতে সর্বোতভাবে আলাদা ও অন্যান্য আশঙ্কাসমূহ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ ছিলেন। কোন কোন আহলে ইল্‌ম[৪৬] তাঁর প্রতি বহু অপবাদ আরোপ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর অনুসারীগণ ও স্থলাভিষিক্তগণ নিজেদের আকীদায় (বিশ্বাসে) এতই পরিচ্ছন্ন ও সুদৃঢ় ছিলেন যে, তাদের মারাত্মক অপবাদ এদের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। নজদের তৌহীদবাদীর উপর নানা অপবাদ রটনার প্রচেষ্টা চালালেও তাঁর রচনাবলী ও গ্রন্থাবলী হতে কোনরূপ দোষ আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়নি। তাঁর গ্রন্থাবলী অতি সুস্পষ্ট। 'দুই আর দুইয়ে চার' হওয়ার ন্যায় তাঁর পুস্তকাদি লেখকের সৎসাহস ও সততার সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁর 'কিতাবুৎ তাওহীদ' আগাগোড়া পাঠ করে যাও; তাতে কোনরূপ জটিলতা, তাসাউফের কল্পনা বিলাসিতা, দ্বিধা দ্বন্দ্ব, মনতিকী (Logical) কূটতর্ক ও গ্রীক জাতীয় জটিল আলোচনা প্রভৃতির লেশমাত্রও নেই।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

শায়খ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব একজন অভিজ্ঞ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন খাঁটি আলেম ছিলেন। তিনি জীবনকালেই আন্দোলনের সুফল দেখে গেছেন। দীনী ও দুনয়াবী উভয়বিধ ফলাফল প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই নজদের পূর্ণ এলাকা তাঁদের করতলগত হয়ে গিয়েছিল। নজদের আমীর ও তাঁর বংশধরগণ তাঁর পদতলে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তারা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, তাদের সমুদয় শৌর্য্যবীর্য্য ও শানশওকত শায়খুল ইসলামের বদৌলতেই অর্জিত হয়েছে। মোজাহেদগণ ও সাধারণ মানুষ তাঁকেই চিনত এবং তাঁর প্রেমেই সকলেই মাতোয়ারা ছিল। তিনি ইচ্ছা করলেই তাঁর সন্তান-সন্ততিদের জন্য শাসনকার্য্যে কিছু অংশ নির্দ্ধারণ করতে পারতেন। শাসনক্ষমতা নিজের হাতেই রাখতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি, বরং তিনি নিজেকে তা হতে সম্পূর্ণ আলাদা রেখেছেন। ফলে আমীর মোহাম্মদ বিন সউদ ও তাঁর

---

[৪৬] আহমদ যয়নী দাহ্‌লানের (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ) আদদুর্‌রুস্‌সানীয়াহ (৪৬ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

http://www.shottanneshi.com

স্থলাভিষিক্ত আমীর আবদুল আজীজ তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ ছাড়া কোন কাজই করতেন না, করার ইচ্ছাও পোষণ করতেন না। গণিমতের সমস্ত শায়খের খিদমতে হাজির করা হত। তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। নিজের ধ্যান ও নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। যতদিন প্রয়োজন ছিল ততদিন তাতে হস্তক্ষেপ করেছেন, কিন্তু আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে শাসন-ব্যবস্থা ও গণিমতের মালের ব্যবস্থাপনা হতে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিলেন। তাঁর এরূপ ত্যাগের প্রত্যক্ষ ফল হল এই যে, উত্তরকালে তাঁর বংশধরেরাও পার্থিব শাসনকর্তা হতে সম্পূর্ণ আলাদা থেকে দীনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং শায়খের ইন্তে কালের দেড় শতাধিক বৎসর অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও কোন সময়েই শায়খের সন্তান-সন্ততিগণ রাজত্বের জন্য সউদ বংশের সাথে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হননি।

শায়খের সন্তান সন্ততি

শায়খুল ইসলামের শিষ্য ও তাঁর পাঠাগারে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ যেখানে দীর্ঘ ৫০/৬০ বসর পর্যন্ত সর্বদা জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রদের ও ভক্তগণের ভিড় লেগেই থাকত, সেখানে তাদের সংখ্যা নিরুপণের চেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। শুধু শিষ্য তালিকা সংগ্রহের চেষ্টা চালালেও প্রমাণপঞ্জীর অভাব ও জীবন চরিতের স্বল্পতা বাধা সৃষ্টি করবে। সুতরাং আমরা এ প্রসঙ্গে শুধু তাঁর শিষ্যতালিকাভুক্ত সন্তানাদির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকব-যারা এখনও সঙ্গতভাবে 'আলে শায়খ' নামে অভিহিত ও উল্লিখিত হয়ে থাকেন এবং এটাই তাঁদের বংশ পরম্পরা পরিচিতি। এই শায়খুল ইসলামের পরম সৌভাগ্য ছিল যে, তিনি এরূপ স্থলাভিষিক্ত রেখে গেছেন যাঁরা ঠিক তাঁরই পদ্ধতিতে সুন্নতে রাসূলের অনুসরণ, প্রচার ও দীক্ষা দানে রত রয়েছেন। এ অপেক্ষাও অধিক আনন্দ-উল্লাসের বিষয় এই যে, এ তবলীগ ও শিক্ষাদান প্রথা এখনও সমাপ্ত হয়নি। বরং আজ পর্যন্ত তাঁর সন্তান সন্তানাদিগণ ইল্ম ও আমলের দিক দিয়ে সমগ্র নজদেই শীর্ষ স্থানীয়। শায়খের সন্তানাদি বিপুল। কতিপয় ছেলে তাঁর জীবনকালেই ইন্তে কাল করেন। ইন্তেকালের সময় শায়খুল ইসলাম চারজন ছেলে রেখে গেছেনঃ-

http://www.shottanneshi.com

১। হোসাইন ২। আবদুল্লাহ ৩। আলী ৪। ইব্রাহীম। ইবনে বিশ্র বলেন, আমি স্বচক্ষে শায়খুল ইসলামের মাদ্রাসায় ছাত্রদের এত ভিড় দেখেছি যে, যদি কোন লোকের নিকট বিবৃত করি তবে সম্ভবতঃ সে তা বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

তাদের সকলের বাড়ী-সংলগ্ন এক একটি মাদ্রাসা ছিল, বিদেশী ছাত্রের সেখানে অবস্থান করত এবং বায়তুল মাল হতে তাদের ব্যয় বহন করা হত। এ সব ছাত্রগণ দিবানিশি শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত থাকত।[৪৭]

সন্তানদের মধ্যে হোসাইন ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শায়খের পরে তাঁকেই প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত মনে করা হত। তিনি দরঈয়ায় কাজী (বিচারক) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দরঈয়ার জামে মসজিদের ইমামতির দায়িত্বও তাঁর প্রতি অর্পিত ছিল। ১২২৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর কতিপয় পুত্র ছিলেন। তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট আলেম বা-আমল ছিলেন। বিশ্র আলী, হাম্দ, হাসান, আবদুর রহমান ও আবদুল মালেকের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আলী বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। ফলে পিতৃব্যের উপস্থিতিতেই তাঁকে কাজী পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি সউদ বিন আবদুল আযীয (হিঃ ১২১৮/১৮০৩-১২৩৯/১৮১৪) আবদুল্লাহ বিন সউদ (১২৩৪/১৮১৮) তুর্কী (নিহত ১২৪৯/১৮৩৪) এবং ফয়সল বিন তুর্কী (মৃঃ হিঃ ১২৮২/১৮৬৫ ইং) এসব আমীরের শাসনকালে কাযীর পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১২৮০ হিজরীতে আলী ইন্তেকাল করেন। হাম্দ ছাত্র জীবনেই ইন্তেকাল করেন। হাসান তুর্কী বিন আবদুল্লার সময়ে রিয়াজের কাযী ছিলেন। তিনি ফেকাহ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অল্প বয়সেই ১২৪৫ হিজরীর শেষ দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। আবদুল রহমান তুর্কী ও ফয়সল উভয়ের শাসনকালে প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ফিকহ, তফসীর ও নহ্ও সম্পর্কে বিশেষ পাবদর্শী ছিলেন। তিনি ১২৯০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আবদুর রহমান বিন হোসাইন, হাসান বিন হোসাইন, আবদুল মালিক বিন হোসাইন সকলেই শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। (পরে এর উল্লেখ আসছে) অনুরূপভাবে হোসাইন বিন শায়খুল ইসলামের সন্তানের মধ্যে হোসাইন বিন হাম্দ বিন হোসাইন বিন

---

[৪৭] উনওয়ানুল মাজ্দ (১) ৯৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

শায়খুল ইসলাম (ফয়সলের সময়ে হোরায়কের কাযী ছিলেন), হোসাইন বিন আলী বিন শায়খুল ইসলাম (ফয়সলের সময়ে রিয়াজের কাযী) এবং আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন হোসাইন বিন শায়খুল ইসলামও শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান বিন শায়খুল ইসলামের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শায়খুল ইসলামের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবও একজন অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। গ্রন্থপ্রণেতা আলেমগণের মধ্যে তাঁকে গণনা করা হত। হোসাইন বিন মোহাম্মদের ইন্তেকালের পর তাঁকেই শায়খুল ইসলামের স্থলাভিষিক্ত বলে সকলেই জানত। স্বয়ং হোসাইন বিন মোহাম্মদের জীবনকালেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতা স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল। শায়খ মোহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন আবদুল লতীফ বিন আবদুর রহমান বিন হাসান বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এর বর্ণনা অনুসারে আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোসাইন বিন মোহাম্মদের চেয়েও অধিক পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শায়খ মোহাম্মদ বিন ইবরাহীম বর্তমানে নজদের আলেমগণের শীর্ষস্থানীয় এবং স্বগোত্রীয় ইতিহাসের অন্যতম রক্ষক। যা হোক, হিজরী ১২১৮/১৮০৩ ইং সালে আমীর সউদ বিন আবদুল আযীযের মক্কা প্রবেশের সময় শায়খ আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আমীর সউদ কর্তৃক জামাতের আকীদা সম্পর্কে যে পুস্তিকা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল, শায়খ আবদুল্লাহ কর্তৃক তা প্রণীত হয়েছিল। ১২৩৩ হিজরীতে ইবরাহীম পাশা কর্তৃক দরঈয়া আক্রান্ত হওয়ার সময় তিনি সেখানেই বিদ্যমান ছিলেন। মিসরীয় সৈন্যের নৃশংসতা, অমানুষিকতা ও হত্যাকান্ড দেখে তিনি স্থির থাকতে না পেরে অসি ধারণ করতঃ যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

قشم سيفه عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتدب واجتمعوا عليه الخ

এবং চরম বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।[৪৮] সম্ভবতঃ তাকে গ্রেফতার করে মিসরে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি সেখানেই ইন্তেকাল

[৪৮] উনয়ানুল মাজ্দ (১) ২০৬ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

করেন।[৪৯] তাঁর দুই পুত্র সোলায়মান বিন আবদুল্লাহ এবং আলী বিন আবদুল্লাহকে দরঈয়া পতনের সময় হত্যা করা হয়েছে। সোলায়মান বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। পিতার জীবদ্দশায়ই দরঈয়াতে কাযী ছিলেন। অধিকন্তু আমীর সউদের শাসনামলে কিছুদিন পর্যন্ত তিনি মক্কায় কাযীর দায়িত্ব পালন করেছেন। আমীর সউদ বিন আবদুল আযীযের মজলিশে সহীহ্ বোখারীর দর্স দেয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত ছিল। এটি তাঁর পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন শায়খুল ইসলাম আমীর সউদের মজলিশে তফসীর তাবারী ও ইবনু কসীরের দর্স দিয়েছিলেন। ইবনে বিশ্র নিজেই উক্ত দর্সসমূহে শরীক হয়েছিলেন। তার বর্ণনা হতেই এ মজলিশসমূহের ইল্মী বৈশিষ্ট ও অন্যান্য মূল্যমানের অনুমান করা যায়।[৫০] ইবনে বিশ্র তার শিক্ষাদান ও হাদীস বর্ণনা পদ্ধতির সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তিনি আম্র বিল মা'রুফ ও নহী আনিল মোনকার সম্পর্কে অদ্বিতীয় ছিলেন। ফলে দাহলান[৫১] তাঁকে তার পিতার চেয়ে অধিক গোঁড়া বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কিতাবুত্ তাওহীদেরও এশটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন। ইবনে বিশরের বিবরণ অনুসারে এটি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল।[৫২] তিনি স্বীয় পিতা ও শায়খ আহ্মদ বিন নাসের বিন মোআম্মার (মৃ: ১২২৫ হিঃ) এবং শায়খ হোসাইন বিন গান্নামের (মৃ: ১২২৫ হিঃ) নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ১২৩৩ হিজরী সনের

---

[৪৯] ইবনে বিশ্র শায়খ আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের শৌর্য্যবীর্য্যের উল্লেখ করেছেন। দাহলান (২২৯ পৃষ্ঠা) সোলায়মান বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের হত্যাকান্ডের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আবদুল্লাহ সম্পর্কে নীরব রয়েছেন।

ইবনে বিশ্রের অপর একটি বিবৃতি আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদের হত্যার প্রতিবাদ করছে। তিনি লিখেছেনঃ- উল্লিখিত আবদুল্লার এক পুত্র ছিলেন আবদুর রহমান। তিনি পিতার সাথে স্বল্প বয়সেই মিশরে বিতাড়িত হয়েছিলেন। আমি অবগত হয়েছি যে, বর্তমানে তিনি আজহাবের "রৌয়াক হানাবেলা" নামক স্থানে অবস্থান করছেন। তাঁর নিকট ছাত্রেরা গমনাগমন করে থাকে, তিনি অতি জ্ঞানপ্রিয় ছিলেন। (প্রথম খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠা)।

রিয়াজে অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, তিনি ১২৪২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। শায়খুল ইসলামের পর তিনিই যে জ্ঞানে গুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন একথা সকলের সমবেত কণ্ঠে শ্রবণ করেছি।

[৫০] উনওয়ানুল মাজদ (১) ১৭০, ১৭৬, ২০৯, ২১০ পৃষ্ঠা।

[৫১] খুলাসাতুল কালাম,২২৯ পৃষ্ঠা।

[৫২] শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান বিন শায়খুল ইসলাম উক্ত ভাষ্য পূর্ণ করেন। তিনি নিজেই ফত্হুল মজীদের ভূমিকায় এর উল্লেখ করেছেন।

http://www.shottanneshi.com

শেষাংশে তাকে হত্যা করা হয়। তাঁর হত্যাকান্ডের ঘটনা অতি মর্মবিদারক। পত্রে বিস্তারিত বিবরণ আসিতেছে। তার অপর গ্রন্থ "কিতাবুত্ তাওযীহ্ আন্ তাওহীদিল খাল্লাক ফী জওয়াবে আহলিল ইরাক" ১৩১৯ হিজরীতে মুদ্রিত আমাদের সম্মুখে রয়েছে। এতেও তার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রুকলম্যান (যয়ল (২) ৫৩২) তাঁর অন্য দু'টি গ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন। (ক) আওসাকো উরাল ঈমান (খ) মাসায়েল। কিন্তু তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। 'মাজমোআতুত তাওহীদিল মক্কীয়াতে (১২৪৩ হিজরীতে মুদ্রিত) শায়খ সোলায়মান বিন আবদুল্লাহ প্রণীত কতিপয় মাসালার উত্তর সম্পর্কীয় একটি পুস্তিকার উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ ব্রুক্লম্যান কর্তৃক উল্লিখিত মাসায়েল পুস্তিকা ও এটি একই পুস্তক হতে পারে। আলী বিন আবদুল্লাহ বিন শায়খুল ইসলাম ১২৩৪ হিজরীতে দরঈয়ার নিকট শহীদ হন। হাদীস ও তফসীরে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি কিতাবুত তওহীদের একটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন।[৫৩] আবদুল্লাহ বিন শায়খুল ইসলামের তৃতীয় পুত্র আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহও বিখ্যাত আলেম ছিলেন। ইবনে বিশরের বরাতে পূর্বে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। ১২৫০ হিজরীতে তিনি মিশরে ইন্তেকাল করেছেন। হোসাইন বিন শায়খুল ইসলামের বিভিন্ন পুস্তিকা এবং ফতওয়া মাশরিকী লাইব্রেরী পাটনার একটি সমাবেশে বিদ্যমান রয়েছে।[৫৪]

আলী বিন শায়খুল ইসলামও এ গোষ্ঠির একজন অন্যতম আলেম ছিলেন এবং তাঁর তাক্ওয়া ও পরহেজগারী প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। ফিকহ ও তাফসীরে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কাজীর পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি অতি পরহেজগার ও ধর্মভীরু ছিলেন। ১২৪৯ হিজরীতে তিনি ইন্তে কাল করেন। তাঁর কতিপয় সন্তান শৈশবকালেই ইন্তেকাল করেন। শুধু মোহাম্মদ বিন আলী বিন শায়খুল ইসলাম বেঁচে থাকেন এবং উত্তরকালে বিশিষ্ট আলেম হন।

চতুর্থ পুত্র বিখ্যাত অধ্যাপক (ছাহেবে দর্স) ছিলেন। ইবনে বিশ্র তাঁর শৈশবকালেই (১২২৪ হিজরী) কিতাবুত্ তাওহীদ পাঠ করেছিলেন।

---

[৫৩] উনওয়ানুল মাজদ (১) ৯১,২১৫ পৃষ্ঠা।

[৫৪] খসড়া সূচীপত্র Hand list ২৬২৫ নং দ্রষ্টব্য।

http://www.shottanneshi.com

তিনি কাজীর পদ গ্রহণ হতে বিরত থাকেন।[৫৫] ১২৫১ হিজরী পর্যন্ত মিশরে তাঁর অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শায়খের বিখ্যাত শিষ্যবর্গের মধ্যে তাঁর পৌত্র আবদুর রহমান বিন হাসান বিন শায়খুল ইসলামও নজদের বিশিষ্ট আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা শায়খের জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করে গিয়েছিলেন। তিনি শৈশবকালে স্বীয় পিতামহের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং শায়খের বিশিষ্ট শিষ্য আহমদ বিন নায়েব বিন ওসমান বিন মোআম্মর (মৃঃ১২২৫ হিঃ) এবং আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আল হোসাইন নাসিরীর (মৃঃ ১২৩৭ হিঃ) নিকটও শিক্ষা গ্রহণ করেন। শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান স্বগোত্রে জ্ঞানের দিক দিয়ে মোজাদ্দেদ পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর জ্ঞান গভীরতার মর্যাদা প্রথম হতে সর্বজনস্বীকৃত ছিল। আমীর সউদ বিন আবদুল আযীয (মৃঃ ১২২৯ হিঃ) এবং আমীর আবদুল্লাহ বিন সউদ (শহীদঃ ১২৩৪) এর শাসনকালে তিনি দরঈয়ার কাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শায়খ হোসাইন বিন শায়খুল ইসলামের ইন্তেকালের (১২২৫ হিঃ) পর তিনি স্বগোত্রের সেই চার ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদের ইলমী বৈশিষ্ট্য সর্বজনস্বীকৃত ছিল এবং রাজধানী দরঈযার কাযীর দয়িত্ব তার উপরই ন্যস্ত ছিল।

দরঈয়া পতনের সময় (১২৩৩ হিঃ) তিনি বিতাড়িত হয়ে মিসরে চলে গিয়েছিলেন। অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসলে তিনি ১২৪১ হিজরীতে নজ্দে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর আগমনে পুনরায় সেখানে জ্ঞান চর্চার মাত্রা তীব্রতর হয়ে উঠে এবং শত শত জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৫৬] তুর্কী বিন আবদুল্লাহ (মৃঃ ১২৪১-১৮৩৪) এবং ফয়সল বিন তুর্কীর (মৃঃ ১২৮২-১৮৬৫) শাসলকালে প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত এবং জনসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকের মর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন। তুর্কী বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন সউদের (মৃঃ ১২৪৯ হিঃ) বিশেষ সভার দর্স দানের দায়িত্ব তাঁর উপরেই অর্পিত ছিল। উক্ত বৈঠকসমূহে সাধারণতঃ তফসীর ইবনে জরীরের দর্স দেয়া হত। তিনি ফয়সল বিন তুর্কীর শাসনকালেও দর্স দানের দায়িত্ব পালন করতেন। দরঈয়া পতনের

---

[৫৫] উন্ ওয়ানুল মাজ্দ (১) পৃষ্ঠা।

[৫৬] উন্ওয়ান (২) ২০,২২,৬৫ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

পর আসাতীন আরবাআর (আলেম চতুষ্টয়ের)[৫৭] বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পর আমীর তুর্কী বিন আবদুল্লার শাসনকালে শুধু আবদুর রহমান বিন হাসান বিন শায়খ এবং আলী বিন হোসাইন বিন শায়খ বিদ্যমান ছিলেন। তুর্কী ও ফয়সলের উভয়ের সময়ে বা শাসনকালে আবদুর রহমান এবং আলী বিন হোসাইনের সঙ্গে সঙ্গে আবদুর রহমান বিন হোসাইন বিন শায়খ এবং আবদুল মালিক বিন হোসাইনের নাম বারবার উল্লেখ করা হয়।[৫৮] কিন্তু ফয়সল বিন তুর্কীর শাসনামলের শেষ দিকে (১২৫৬ হিজরীর পরে) শুধু আবদুর রহমান বিন হাসান বিন শায়খের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। অতঃপর ফয়সলের একেবারে শেষের দিকে তাঁর পুত্র আবদুর লতীফ বিন আবদুর রহমানকে কাযী ও অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। তিনি ১২৮০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ফলকথা, ফয়সল বিন তুর্কীর শাসনকালের শেষের দিকে আবদুর রহমান সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। ইবনে বিশ্‌র তার গ্রন্থটি হিঃ ১২৮৭ সালে প্রণয়ন করেন এবং ১২৯৭ হিজরীর ঘটনাবলী উল্লেখ করেন। সেই সময় তিনি (আবদুর রহামান বিন হাসান) জীবিত ছিলেন। পালগ্রীভ স্বীয় সফরকালে ১৮৬২ সালে ১২৭৯ হিঃ রিয়াজে তাঁর ও তাঁর পুত্র আব্দুল লতীফের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।[৫৯] কিন্তু পাল গ্রীভ ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হয়ে আবদুর রহমানকে আবদুল্লাহ বিন শায়খের পুত্র মনে করেন। দীর্ঘ দিন বেঁচে ১২৮৫ হিজরীতে তিনি (আবদুর রহমান) ইন্তেকাল করেন।

ইবনে বিশ্‌র কর্তৃক তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলী ও পুস্তিকার উল্লেখ করা হয়েছে। সোলায়মান বিন আবদুল্লাহ বিন শায়খের (মৃঃ ১২৩৩ হিঃ) কিতাবুত্ তাওহীদের অসম্পূর্ণ ভাষ্যটি তিনিই পূর্ণ করেছিলেন। এটি 'ফাতহুল মজীদ ফি শরহে কিতাবিত্ তাওহীদ নামে কয়েকবারই মুদ্রিত হয়েছে।[৬০]

---

[৫৭] আসাতীনে আরবাআ- পূর্বে তাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত শ্রেণী হিসাবে তাদের সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হতঃ আবদুল্লাহ বিন শায়খ, আলী বিন হোসাইন বিন শায়খ, আবদুর রহমান বিন হাসান বিন শায়খ, সোলায়মান বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন শায়খ।

[৫৮] উন্‌ওয়ানুল মাজ্‌দ (২) ৬৫,৭৩, ও ৮৮ পৃষ্ঠা।

[৫৯] প্রথম খন্ড, ৩৭১, W.Gifford palgrave (Narrative of a year's journey thorough central and Eastern Arabia)

[৬০] এর সর্বাধুনিক সংস্করণ যা অতি বিশুদ্ধভাবে মিশরে মুদ্রিত হয়েছে। এখন আমাদের নিকটও রয়েছে।

http://www.shottanneshi.com

ফতহুল মজীদ ছাড়াও তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ "কুর্‌রাতু আ'ইনিল মোআহ্হেদীন ফী তাহ্কীকে দা'ওয়াতিল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুর্সালিন"ও মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে। এও আসলে কিতাবুত্ তওহীদেরই টীকা। মোহাম্মদ হামিদ ফকীহ ফতহুল মাজীদের নুতন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। তিনি তার টীকায় উপরোক্ত (কুর্‌রাতুল 'আইন) পুস্তকের বহু উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।[৬১] মজমোআতুত্ তওহীদিল মক্কীয়াতেও (১৩৪৩ হিঃ) তাঁর নিম্নবর্ণিত পুস্তিকাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছেঃ-

(১) রিসালাতুর ফী জওয়াবিল জাহ্মিয়াহ্ ৩২-৩৬ পৃষ্ঠা।

(২) রিসালাতুর ফী হুক্‌মে মওয়ালাতে আহ্‌লিল্ ইশরাক্, ১৫৭-১৬৯ পৃষ্ঠা।

(৩) বয়ানুল মাহিজ্জাতে ফির্‌রাদ্দে আলা সাহেবিল্ লুজ্জাহ্, ২০৫-২৫২ পৃষ্ঠা। তাঁর সন্তানদের মধ্যে মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন হাসান দরঈয়া পতনকালে অন্যান্য স্বগোত্রীয়দের সাথে নিহত হন।[৬২]

আবদুল লতীফ বিন আবদুর রহমান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দরঈয়া পতনকালে অতি অল্প বয়সে তিনি মিশরে গিয়েছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা ও অন্যান্য আলেমগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। হিজরী ১২৬৪ সনে তিনি নজ্‌দ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বহু গ্রন্থাবলী সঙ্গে নিয়ে আসেন। এখানে আগমনের পরেই তিনি পিতার দক্ষিণ হস্তরূপে শিক্ষাদান ও প্রচার কার্য্যে সহায়তা করেন। ১২৬২ হিজরী পর্যন্ত ফয়সাল বিন তুর্কীর (মৃঃ ১২৮২ হিঃ) মজলিশসমূহে আবদুর রহমান বিন হাসান শিক্ষক ও বক্তা হিসাবে বিরাজ করেন। ১২৬৫ হিজরীতে আবদুল লতীফ বিন আবদুর রহমান একাধারে কাজী বিচারপতি, ইমাম, শিক্ষক প্রভৃতিরূপে পূর্বভাগে পরিদৃষ্ট হন। ইবনে বিশ্‌র তার তফসীর অধ্যাপনার অত্যন্ত প্রশংসা করেন।[৬৩] ১২৭১ হিজরী ১৮৬২ সালে পালগ্রিভ তার সাক্ষাৎ লাভ করেন। এ সময় তার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর ছিল। তখন তিনি রিয়াজের প্রধান বিচারপতি

---

[৬১] উন্‌ওয়ান (২) ২৩, ২৬ পৃষ্ঠা।

[৬২] উন্‌ওয়ান (১) ২০৮ পৃষ্ঠা। এটি ইবনে বিশ্‌রের বিবরণ। কিন্তু রিয়াজের বর্তমান আলেমগণ তার সত্যতা স্বীকার করেননি।

[৬৩] উন্‌ওয়ান (১) ১০২ ও ২২২১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

ছিলেন।[৬৪] তাঁর 'মিনহাজুত তাকদীস ওয়াত্ তাসীস' গ্রন্থের উল্লেখ পরে আসছে। তার অপর একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা হাদিয়াতুস্সনীয়াহ্র মধ্যে (২৮-৪০ পৃষ্ঠা)। মুদ্রিত হয়েছে। এতে শায়খুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত হয়েছে। তিনি ১২৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসানের অপর পুত্র ইসহাক বিন আবদুর রহমান বিন হাসানের উল্লেখ এ পর্যন্ত কোন ইতিহাসে পাইনি। কিন্তু অন্য এক কৌতুকজনক সূত্রে আমরা তা অবগত হয়েছি। ১৩৫৯ হিজরীতে শাওয়াল মাসে পাটনার উগানওয়াঁ নামক গ্রামস্থ পৈত্রিক বাড়ীতে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়। একদা স্বগোত্রীয় লাইব্রেরীর পুরাতন কেতাবগুলো ঘাঁটতে শুরু করি। তখন صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (সিয়ানাতুল ইনসান আন আছ ওয়াছা তিশ্ শায়খে দাহ্লান) এর একটি কপি প্রাপ্ত হলাম। এর প্রথম পাতায় খাঁটি আরবী অক্ষরে নিম্নবর্ণিত বাক্যটি লিখিত ছিলঃ-

في ملك الحقير اسحق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد النجدي الحنبلي عفى الله عنهم

আমার আনন্দের সীমা থাকল না। পাতা উল্টিয়ে এদিক সেদিক দেখতে লাগলাম। শেষাংশে একস্থানে উপরোক্তরূপ অক্ষরে একটি দীর্ঘ টীকা পেলাম। এতে লেখকের জ্ঞান গভীরতারও পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তিকার মধ্যভাগেও একটি সংক্ষিপ্ত টীকা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রারম্ভে নামের নীচে সীলমোহরও রয়েছে। তাতে ইসহাক শব্দটি স্পষ্টভাবে পড়া যায়।

গ্রন্থটি এখানে কিভাবে পৌঁছেছে সঠিকভাবে তা বলার উপায় নেই। তবে মনে হয় যে, আমার মাতামহ মওলানা আবদুস সামাদ একজন আহ্লেহাদীস বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। সমসাময়িক অন্যান্য বিখ্যাত আলেমগণের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও ছিল। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, এই ইসহাক বিন আবদুর রহমান বিন হাসান হিন্দুস্তানে আগমন করেছিলেন এবং এখানে অবস্থানকালে তিনি মাওলানা সৈয়দ নজীর হোসাইন (মিয়াঁ) সাহেব সূর্যগড়ী মোঙ্গেরী দেহলবী (মৃঃ ১৩৩০ হিঃ),

---

[৬৪] পালগ্রীভ (১), ২৭১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

নওয়াব সিদ্দিক সাহেব খান সাহেব (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ), মাওলানা বশির আহমদ সাহেব সাহসাওয়ানী (মৃঃ ১৩২৬ হিঃ) এবং শায়খ হোসাইন বিন মোহাম্মদ বিন মোহসিন এ্যামানি (মৃঃ ১৩২৭ হিঃ) প্রমুখের নিকট শিক্ষালাভও করেছিলেন। ২৮শে রজব ১৩১৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সেই সময় এ বংশের আলেমগণের মধ্যে মোহাম্মদ বিন আবদুল লতীফ বিন আবদুর রহমান সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন। ১৩৩৯ হিজরীতে রচিত তাঁর একটি পুস্তিকা আদ্‌দুর্‌রূস সানীয়াহ নামক সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। লেখকের রিয়াজ সফরের এক বৎসর পূর্বে ১৩৬৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

বর্তমানেও শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের সন্তানবর্গ জ্ঞান গরিমায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন এবং সউদী সরকারের উপরও তাঁদের প্রভাব বিদ্যমান। সউদী সরকারের প্রধান বিচারপতি আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন হোসাইন বিন আলী বিন হোসাইন বিন আশ্ শায়খ (জন্মঃ ১২৮৩ হিঃ) তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক। তাঁর কনিষ্ট ভ্রাতা ওমর বিন হাসান (জন্ম ১৩১৯ হিঃ) আমর বিন মা'রুফ ও নাহি আনিল মোনকার বিভাগের প্রধান ছিলেন। শায়খ আবদুল্লাহ বিন হাসান ভালরূপে কথাও বলতে পারতেন না, কিন্তু শায়খ ওমর অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন এবং মরহুম সোলতান ইবনে সউদের সাথে হজ্জ পর্বেও আগমণ করতেন। প্রধান বিচারপতির সদর দফতরও মক্কায় অবস্থিত, কিন্তু জ্ঞান গরিমা তার পিতৃব্যকুলেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান নজদের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট আলেম এবং শরীয়তের ব্যাপারে সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র হচ্ছেন শায়খ মোহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন আবদুল লতীফ বিন আবদুর রহমান বিন হাসান বিন আশ্ শায়খ (জন্মঃ১৩১১ হিঃ)। তাঁর অপর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ বিন ইবরাহীম (জন্ম ১৩০৫ হিঃ), আবদুল মালিক বিন ইবরাহীম (জন্ম ১৩২৩ হিঃ) এবং আবদুল লতীফ বিন ইবরাহীমও (জন্ম ১৩১৫ হিঃ) রিয়াজের বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তাঁর পিতৃব্য মোহাম্মদ বিন আবদুল লতীফের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। তাঁর পিতা ইবরাহীম বিন আবদুল লতীফও (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ) বিশিষ্ট আলেম ও লেখক ছিলেন।

http://www.shottanneshi.com

একটি বৈশিষ্ট্য

ইবনে খালদুন লিখেছেন, গোত্রীয় আভিজাত্য সাধারণতঃ তিন পুরুষের অধিক স্থায়ী হয়না। ইতিহাসেও তাই প্রমাণিত হয়। মুসলিম ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিক্ষিত বংশ (অলীউল্লাহ গোত্র) তিন পুরুষেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। যা হোক, এখানেতো বংশেরই নিপাত ঘটেছে। অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ শিক্ষিত ও সংস্কারপ্রাপ্ত গোত্রের বেলায়ও একই কথা খাটে। দুই অথবা তিন পুরুষের পর তাঁদের কোন বৈশিষ্ট্য বাকী নেই। পক্ষান্তরে, শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, আজ পর্যন্ত তাঁর বংশধর জ্ঞান ও মর্য্যাদায় খ্যাতিমান হয়ে আছেন। শায়খ মোহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন আবদুল লতীফ বিন আবদুল রহমান বিন হাসান বিন মোহাম্মদ শায়খুল ইসলামের (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বংশের ষষ্ঠ পুরুষ এবং তিনি বর্তমানে নজদের আলেমগণের শীর্ষস্থানীয়।[৬৫] তাঁর পিতা (ইবরাহীম মৃঃ ১৩২৯ হিঃ) পিতামহ (আবদুল লতীফ মৃঃ১২৯৩ হিঃ) প্রপিতামতা (আবদুর রহমান মৃঃ ১২৮৫ হিঃ) সকলেই স্বীয় যুগের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। এটি বস্তুতঃ আল্লাহরই অসীম দান যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

---

[৬৫] তাঁর সাথে আলোচনার বিশেষ সুযোগ আমার ঘটেছে। (দিয়ারে হাবিব দ্রষ্টব্য) নজদের আলেমগণের জন্ম-মৃত্যুর সাল সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান তার নিকট হতে সংগ্রহ করেছি। (উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য)।

http://www.shottanneshi.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক প্রাধান্য

শায়খুল ইসলামের জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তেকালের পর নজদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা বস্তুতঃ শায়খুল ইসলামের নিখুঁত ইসলামী দাওয়াত ও তাঁর বিশেষ আন্তরিকতারই ফল ছিল।

প্রকৃত কথা এই যে, শায়খ কর্তৃক নজদবাসীদের জীবনধারায় আকীদা সমূহে (Creeds) এবং তাঁদের চরিত্রে শুধু অসাধারণ বিপ্লবই সৃষ্টি হয়নি বরং তাতে এক মহা পরিবর্তনও ঘটেছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি মোহাম্মদ বিন সউদ (মৃঃ ১১৭৯/১৭৬৫খ্রীঃ) তদীয় পুত্র আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ বিন সউদ (১১৭৯/১৭৬৫=১২১৮/১৮০৩) এবং তার পুত্র সউদের (১২১৮-১২২৯ হিঃ ১৮০৩-১৮১৪) ন্যায় দুঃসাহসী বীর মোজাহেদ শাসনকর্তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা শায়খের আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

শায়খের আন্দোলনের সাথে সউদ বংশের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে সউদ বংশের ইতিহাসের সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই, যার সাথে শায়খের আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

মোহাম্মদ বিন সউদঃ[৬৬]

আমীর মোহাম্মদ বিন সাউদ (মৃঃ ১১৭৬ ইং) আন্দোলনের প্রসার লাভের প্রাক্কালেই মক্কা মদীনায় (হারামায়নে) একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ

---

[৬৬] (গোড়াতেই বলে রাখছি যে,) নজদের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা বা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে শুধু সেই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করব যেগুলোর সাথে শায়খের তৎপরতার বিশেষ সংযোগ ছিল। নজদ এবং সউদবংশের বিস্তারিত ইতিহাস অবগত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলো পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। (১) ইবনে বিশ্‌র বিরচিত উনওয়ানুল মাজ্‌দ, (২) আজায়েবুল আসার' (জব্‌রতী) ৩, ৪ খন্ড। (৩) 'তারীখে নজদ, [আলুসী, ৯০-১০৪ পৃষ্ঠা [৪] হাজেরুল আ'লামিল ইসলামী (৪) ১৬১-১৭২ পৃঃ (আমীর শকীব আর্সালান (৫) এনসাইক্লোপোডিয়া অব ইসলাম (ইবনে সউদ শীর্ষক প্রবন্ধ) (৬) Arabia by Felbi এটি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে লিখিত। আমীন রায়হানী বিরচিত স্বীকৃত গ্রন্থবলী আরবী ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত ও সর্বজন স্বীকৃত (প্রমাণ পঞ্জি সম্পর্কীয় অন্যান্য পুস্তকের উল্লেখ পরে আসছে)।

http://www.shottanneshi.com

করেন। প্রতিনিধিদল শরীফ মস্উদ বিন সাঈদের ১১৪৬ হিঃ/১৭৩২ ইং-১১৬৫/১৭৫২) নিকট হজ্জের বিরোধমূলক বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু হরম শরীফের মুফতীগণের ব্যবহার দুঃখজনক ও আপত্তিকর ছিল। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের গ্রেফতার করা হয় এবং কেউ কেউ কষ্টে পরিত্রাণ লাভ করেন।

হজ্ব নিষিদ্ধকরণ[৬৭]

দাহলান রচিত (খুলাসাতুল কালাম ফী উমারায়ে বালাদিল হারাম এবং আদ্দুরুস্সানীয়াহ) গ্রন্থদ্বয়ে বিশুদ্ধভাবে তারিখও লিখিত হয়নি। এমন কি দাহলান সনও নিদিষ্ট করেননি। যা হোক, এতে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, এ ঘটনার পূর্বেই নজদবাসীদের বিরুদ্ধে হজ্জ নিষিদ্ধ হওয়ার ফরমান জারি হয়ে গিয়েছিল। ইবনে বিশর ১১৬২ হিজরীর ঘটনাবলীতে শুধু এটুকু উল্লেখ করেছেন যে, "১১৬২ হিজরীতে শরীফে মক্কা মসউদ বিন সঈদ নজদের হাজীদেরকে গ্রেফতার করেন এবং তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইন্তেকালও করেন।"- উনওয়ানুল মাজদ (১) ২৩ পৃষ্ঠা।

শায়খুল ইসলামের আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল ১১৫৭ হিজরী সনের পর এবং তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ১১৬০ হিজরীর পরেই শুরু হয়। সুতরাং ১১৬২ হিজরীর পূর্বে নজদবাসীদের জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারত বা হজ্জ পর্ব করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তা আদৌ সঙ্গত মনে হয় না। বরং ঘটনা পরম্পরায় এটাই অনুমেয় যে, হাজীদের গ্রেফতার করার পূর্বোল্লিখিত ঘটনা হতেই হজ্জ সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু বিরতির সাথে এ নিষেধাজ্ঞা নজদবাসীদের প্রতি সর্বদা আরোপিত থাকেই। ১১৮৩, ১১৮৫ এবং ১১৯৭ হিজরীতে বিশেষ অনুমতি দেয়া হয়েছিল, ফলে নজদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ বায়তুল্লাহ শরীফে যিয়ারত করে ধন্য হন। কিন্তু এ অনুমতিসমূহ সাময়িক ছিল। সউদ বিন আবদুল আযীযের মক্কা (হেরেম) শরীফে প্রবেশ[৬৮] করার পূর্বে নজদবাসীদের পক্ষে বিনা প্রতিবন্ধকতায় হজ্জ

---

[৬৭] দাহলানের বিবরণ- আদদুররুস্ সানীয়াহ ৪৪ পৃষ্ঠা।

[৬৮] সউদ বিন আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ বিন সউদ হিঃ ১২১৮/১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী বেশে মক্কা যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

http://www.shottanneshi.com

পর্ব সমাধা করা কোন সময়েই সম্ভবপর হয়নি। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে পাঠ করুনঃ-

আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ বিন সউদ

(ক) আমীর মোহাম্মদ বিন সউদ আন্দোলনের ঠিক মধ্যাহ্নে ইন্তেকাল করলে তাঁর পুত্র আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ বিন সউদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মারগোলিয়থ সাহেবের বর্ণনানুসারে ১১৭৯ হিঃ/১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রতিনিধিদল মক্কা নগরে গমন করেন। তথায় তাঁদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শিত হয়। স্বয়ং শরীফ কর্তৃক তাঁদের সম্মানার্থে ভোজসভার আয়োজন করা হয় এবং প্রতিনিধিদল তথাকার আলেমগণকে আশ্বস্ত করেন যে, তাঁদের আকীদাসমূহ- ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের আকীদা হতে ভিন্ন নয়।

কিন্তু ইবনে গান্নাম, ইবনে বিশ্‌র এবং ফেলবী ১১৭৯ হিজরীতে কোন প্রতিনিধি দলের উল্লেখ করেননি। মারগোলিয়থ সাহেব কোথা হতে তা গ্রহণ করেছেন আমি অবগত হতে পারিনি। অধিকন্তু ইবনে গান্নাম ও ইবনে বিশ্‌রের নীরবতা অবলম্বনের পর মারগোলিয়থ সাহেবের বর্ণনার উপর আদৌ নির্ভর করা যায় না। আহমদ জয়নী দাহলানের (আদ্দুর্‌রুস্‌সানীয়াহ্ ৪৪ পৃষ্ঠা) বিবরণও এ সম্পর্কে অত্যন্ত পরস্পর বিরোধী এবং নির্ভরযোগ্য নয়।

হজ্জ নিষিদ্ধ হওয়ার পর ১১৮৩ হিঃ/১৭৬৯ খ্রীঃ প্রথম হজ্জ

১১৮৩ হিজরীতে (১৭৬৯ খ্রীঃ) হেজাযের আশরাফদের একটি দলের সাথে কোন এক স্থানে মোআহ্‌হেদীনদের এক সংঘর্ষ ঘটে এবং তাতে আশরাফ দলের সরদার (নেতা) শরীফ মনসুর গ্রেফতার হন। কিন্তু আমীর আবদুল আযীয তার নিকট হতে কোন পণ গ্রহণ না করেই তাঁকে মুক্তি দান করেন। ফলে এর বিনিময়ে মক্কার শরীফ[৬৯] কর্তৃক হজ্জের অনুমতি দেয়া হয় এবং বিপুল সংখ্যক মোয়াহ্‌হেদীন এতে উপকৃত হন।

---

[৬৯] ইংরাজ এবং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মক্কার শাসনকর্তাকে grand sherif এবং গোত্রের অন্যান্য লোকদের শুধু শরীফ বলে উল্লেখ করেছেন। আরবীতে সাধারণতঃ হোসেন বংশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামের সাথে শরীফ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মক্কার শরীফ বলতে শুধু মক্কার শাসকর্তাকেই বুঝায়। আশরাফের ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগতির জন্য দাহলান বিরচিত 'খোলাসাতুল কালাম ফী উমারায়ে বালাদিল হারাম' পাঠ করা যেতে পারে। কিন্তু তা

http://www.shottanneshi.com

فاغتنم بذلك من المسلمين طائفة وسارت للحج آمنة[৭০]

(রওযাতুল আফকার (২) ৯১ পৃষ্ঠা)

এই অনুমতি সেই বৎসরের জন্য সীমাবদ্ধ থাকলেও বস্তুতঃ তাতে ভবিষ্যতের আলোচনা ও সমালোচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

নজদের প্রথম প্রতিনিধি দল

১১৮৫ হিজরীতে (১৭৭১ খ্রীঃ) শায়খুল ইসলাম এবং সুলতান আবদুল আযীয কর্ত্তৃক মক্কার শাসনকর্তা আহমদ বিন সাঈদের (১১৮৪ হি-১১৮৬ হিঃ) নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করা হয়। ফলে তিনি পত্রযোগে তাঁদের নিকট একজন অভিজ্ঞ আলেমকে প্রেরণের অনুরোধ করেন যাতে মক্কার আলেমগণ তাঁর সাথে তাদের দা'ওয়াত ও আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। সুতরাং শায়খুল ইসলাম ও আমীর আবদুল আযীয কর্ত্তৃক শেখ আবদুল আযীয ইবনে হাসীন একটি পত্রসহ প্রেরিত হন। তাতে লেখা ছিল.....[৭১]

মক্কার নিম্নবর্ণিত আলেমগণ শেখ আবদুল আযীযের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেনঃ ইয়াহিয়া বিন সালেহ আল হান্‌ফী, আবদুল ওহাব বিন হাসান তুর্কী (সুলতান কর্তৃক নিয়োজিত মুফতী) এবং আবদুল গণি বিন

বিশেষ নির্ভরগোয্য নয়। মোহাম্মদ লবীব আল বাতনুনী কৃত আররেহলাতুল হেজাযিয়াহতেও (৮১-৮৩ পৃঃ) আশরাফে মক্কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। Bruck hardt কৃত Trevels in Arabia (প্রথম খন্ড ৪০৪-৫ পৃষ্ঠা)তেও মক্কার সরকার তথ্যবহুল একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। হোগার্থের A History of Arabia তেও আশরাফে মক্কা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় রয়েছে। যে সমস্ত আশরাফের সাথে আমাদের আন্দোলনের সম্পর্ক রয়েছে তাদের নাম ও শাসনকাল নিম্নে প্রদত্ত হলঃ-

১। মসউদ বিন সাঈদ ১১৪৬ হিঃ ২। মোসাঈদ বিন সাঈদ, ১১৬৫ হিঃ ৩। [illegible]ফর বিন সাঈদ ১১৭২ হিঃ ৪। মোসাঈদ বিন সাঈদ ১১৭৩ হিঃ ৫। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ১১৮৪ হিঃ ৬। আহমদ বিন সাঈদ ১১৮৪ হি ৭। আবদুল্লাহ বিন হাসান ১১৮৪ হিঃ ৮। আহমদ বিন সাঈদ ১১৮৪ হিঃ ৯। সরওয়ার বিন মোসাঈদ ১১৮৬ হিঃ ১০। আবদুল মুয়ীন বিন মোসাঈদ ১২০২ হিঃ ১১। গালীব বিন মোসাঈদ ১২০২ হিঃ ১২। ইয়াহিয়া বিন সরওয়ার ১২২৮ হিঃ প্রমুখ।

[৭০] রওযাতুল আফকার (২) ৯১ পৃষ্ঠা)

[৭১] মূল পুস্তিকায় এখানে মূল পত্রের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়নি। কারণ জানা যায়নি- অনুবাদক।

http://www.shottanneshi.com

হেলাল। তাঁরা তক্ফীর, কবরের উপর নির্মিত গুম্বজ, বুজরগানদের নিকট উদ্দেশ্য পূরণ করার প্রার্থনা প্রভৃতি তিনটি বিষয়ে আলোচনা করেন এবং আবদুল আযীযের যুক্তি মেনে নেন এবং তাঁরা শেখ আবদুল আযিযকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার সাথে বিদায় দেন।[৭২]

ইবনে বিশ্র[৭৩] এ প্রতিনিধিদলের শুধু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন কিন্তু ফেলবী[৭৪] কর্তৃক এ প্রতিনিধিদলের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এই ইবনে গান্নামের রাওযাতুল আফকার গ্রন্থ হতেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি ১১৮৩/১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের হজ্জ এবং ১১৮৫ হিঃ/১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের প্রতিনিধিদলের বর্ণনায় উলট পালট বা হজবরল করে দিয়েছেন। অথচ ইবনে গান্নাম উভয় ঘটনাকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রতিনিধিদলের নেতা শেখ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন হাসিন শায়খুল ইসলামের বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজেও তাঁর প্রতি আস্থা রাখতেন। তিনি নিজে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে দু'বার প্রতিনিধিদলের নেতা রূপে মক্কা নগরে পাঠিয়েছিলেন। শায়খের পর আমীর আবদুল আযীয (মৃঃ ১২১৮/১৮০৩ খ্রীঃ) সউদ বিন আব্দুল আযীয (মৃঃ ১২২৯ হিঃ/১৮১৪) এবং আবদুল্লাহ বিন সউদ (শহীদ ১২৩৪/১৮১৯ খ্রীঃ) এর শাসন আমলে প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দরঈয়ার পতনের পর (১২৩৩ হিঃ) যখন তিনি অতি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ইবরাহিম পাশা তার সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং কঠোর ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলেন।[৭৫] বিজয় ও পার্থিব চাকচিক্যে মানুষ এভাবেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, অন্যান্যদের ন্যায় তাকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলতে হয়নি। ১২ই রজব ১২৩৭ হিঃ তে (৪ঠা এপ্রিল, ১৮২২ খ্রীঃ) তিনি ইন্তেকাল করেন।[৭৬]

---

[৭২] রওয়াতুল আফকার (২) ৯১,৯২ পৃষ্ঠা।

[৭৩] ঐ (১), ৬৯ পৃষ্ঠা।

[৭৪] ঐ (১) ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা।

[৭৫] উনওয়ান (১) ১৯১ পৃষ্ঠা।

[৭৬] শেষ আবদুল আযীযের বিস্তারিত জীবন এবং তার ছাত্রদের অবস্থাদি উনওয়ানুল মাজ্দ প্রথম খন্ডে ৯১,৯৪, ২৩২, ২৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

http://www.shottanneshi.com

দুর্ভিক্ষ ও হজ্জের সাধারণ অনুমতি ১১৯৭-১৭৮৫

১১৯৭ হিজরীতে আমীর আবদুল আযীয কর্তৃক মক্কার শাসনকর্তার নিকট অশ্ব প্রভৃতি মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত হয়। এর বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ এই ছিল যে, শায়খুল ইসলামের অনুসারী নজদবাসীদের হজ্জ পর্ব সমাধার অনুমতি লাভ করা, যা হতে তারা দীর্ঘ দিন বঞ্চিত ছিল এবং যা সমাধার জন্য তারা উদগ্রীব ছিলেন। বস্তুতঃ এ বৎসর প্রায় তিনশত লোক হজ্জ আদায় করেন।[৭৭]

ইবনে বিশ্‌র এ ঘটনার উল্লেখই করেননি। পক্ষান্তরে, ফেলবী অনুমতি ও তার কারণসমূহ এবং ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হিজরী ১১৯৭/১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, ... তবুও আমীর আবদুল আযীযের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দুই বৎসরের দীর্ঘ দুর্ভিক্ষে আরবের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। লক্ষনীয় ব্যাপার এই যে, দীর্ঘ দিনের নিষিদ্ধতার পর যখন শরীফে আযম ছরওয়ার কর্তৃক এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয় ওয়াহ্হাবী শাসনকর্তাকে জ্ঞাত করানো হল[৭৮] যা তাদের হজ্জ পর্ব সমাধার ব্যাপারে কয়েক বৎসর পর্বে জারী করা হয়েছিল, তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষের কারণে শুধু তিন শত লোকই এর দ্বারা উপকৃত হলেন। অর্থাৎ শুধু তিনশত লোক সেবার হজ্জ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বস্তুতঃ ওয়াহাবীদেরকে পুনরায় হজ্জ করার অনুমতি দান করা তখনকার আরবী ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মক্কার অধিপতি সরওয়ার কুসতুনতুনীয়ার নামকা ওয়াস্তে (Titular) খলীফার অধীনতা হতে সম্পূর্ণ আজাদ হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমীরও নজদের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় হানা দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে হজ্জ সমাধা করা নিষেধ করে তিনি নিজের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নজদবাসীরা তার প্রাধান্য স্বীকার করেনি। বরং তার ইরাক ও পারস্যের যে সব হজ্জযাত্রীদল ওয়াহ্হাবী এলাকা অতিক্রম করে

---

[৭৭] রওযাতুল আফকার (২) ১৩৪ পৃষ্ঠা।

[৭৮] ফেলবী (৩৮ পৃঃ) এর বিবরণে জানা যায় যে, শরীফ সরওয়ার (১১৮৬-১২০২) নিজের পক্ষেই অনুমতি দিয়েছিলেন। অথচ ইবনে গান্নামের উপরোক্ত বিবরণে মনে হয় যে, আমীর আবদুল আযীযের চেষ্টায় অনুমতি পাওয়া গিয়েছিলঃ-

وقصده بذلك التشريف والإكرام واهدائه..... ..... الرخصة لأهل الدين والإسلام في اداء واجب الافتراض ... الخ

http://www.shottanneshi.com

মক্কা গমন করত, তাদের উপর আক্রমণ করে ওয়াহহাবীরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে লাগল। অথচ তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করা বা তাদের কোনরূপ সাহায্য মদদ করার ক্ষমতা শরীফি সরওয়ারের ছিল না। ফলে পারস্য সরকারের অভিযোগে বাগদাদের শাসনকর্তা তুর্কি পাশা হজ্জের জন্য কাফেলা রওয়ানা করা বন্ধ করে দিলেন। উল্লেখ্য যে, সেই সময়ে সেই সব কাফেলাসমূহের আগমনের উপরই হেজাযবাসীদের জীবিকা অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল– যারা স্থল পথে হজ্জের জন্য আগমণ করত। সুতরাং মক্কা ও মদীনার ব্যবসায়ী মহল শরীফকে নজদী সরকারের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণে বাধ্য করলেন। শরীফ সরওয়ারের পক্ষেও নতি স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় রইল না। এবং অশ্ব ও রাষ্ট্রের যে উপঢৌকন ওয়াহহাবী সরকার দুর্ভিক্ষের সময় শরীফের নিকট পাঠিয়েছিলেন তাতে উভয় সরকারের সম্পর্কের উন্নয়নের ব্যাপারটি জনসাধারণের নিকটও প্রকাশ হয়ে পড়ল ..... কিন্তু এটাও অবশেষে সাময়িক ব্যবস্থারূপে প্রতিপন্ন হল।[৭৯]

নজদের দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল ১২০৪ হিঃ ১৭৫০ খ্রীঃ

মক্কার তৎকালীন আমীর শরীফ সরওয়ার ১২০২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অতঃপর মুসায়েদের পুত্র আবদুল মুয়ীন বিন মোসায়েদ আমীর নিযুক্ত হন। তারপর তার অন্যপুত্র গালেব বিন মোসায়েদ আমীর পদে বরিত হন। তিনি শরীফ গালেব নামে বিখ্যাত। তার সময়েই নজদী, হেজাযী ও মিশরীদের মধ্যে পারস্পরিক বহু সংগ্রাম ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐতিহাসিকগণের বিবরণে জানা যায় যে, শরীফ গালেব এ সংগ্রাম হতে বেঁচে (আপোষ করতে) সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু (তথাকথিত) আলেমগণ আপোষ করতে দেননি।

ঘটনা যাই হোক, শরীফ গালেবের (১২০২-১২৩৮ হিঃ) বিক্ষণতার প্রমাণ এই যে, শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার সামান্য দু' বৎসর পরই তিনি আমীর আব্দুল আযীযের নিকট হতে এরূপ একজন আলেম প্রেরণের

---

[৭৯] Arabia ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠা। (ইবনে সউদের প্রবন্ধ)। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের বর্ণনানুসারে সরওয়ার কর্তৃক প্রদত্ত হজ্জের অনুমতি গালেব কর্তৃক ১২০২ হিজরীতে প্রত্যাহার করা হল। তবে ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে এটাই লিখেছেন যে, হজ্জের অনুমতি সাময়িক ছিল এবং নজদবাসীদের প্রতি হজ্জ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞ ১২০৫ হিজরিতে নিয়মিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত সর্বদা বলবৎ ছিল। আররেহ্লাতুল হেজাযীয়াহ্, ৮৮ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

আবেদন করলেন, যিনি শায়খের আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। আমীর আব্দুল আযীযও সানন্দে যথা সময়ে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং শায়খ আব্দুল আযীয বিন হাসিনকে এ কাজে নিযুক্ত করলেন (ইনি প্রথম দলেরও নেতৃত্ব করেছিলেন)। শায়খুল ইসলাম প্রতিনিধি দলের উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত প্রমাণাদিরও বিস্তারিত আলোচনা করা হল যদ্দ্বারা সেই সময় মক্কার আলেমগণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

গালেব শায়খ আবদুল আযীয বিন হাসীনকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে অভ্যর্থনা করলেন, দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে আলোচনায় মিলিত হলেন এবং তার যুক্তি প্রমাণের গুরুত্ব এবং সত্যতা স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু স্থানীয় আলেমগণের প্ররোচনায় তিনি নিজের স্বীকৃতি হতে ফিরে গেলেন। "হরমের ফকীহ্গণ" তাকে এটাই বুঝালেন যে, যদি আপনি ইবনে সউদের আনুগত্য স্বীকার করে নেন তা হলে শরীফী অধিনায়কত্বের উপর ইবনে সউদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কথাটি অন্তর স্পর্শ করার মতই ছিল। বস্তুতঃ তা গালেবের অন্তর স্পর্শ করল এবং নজদী অধিনায়কত্বের আশঙ্কা তার সত্য গ্রহণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। যার প্রতিফল (পববর্তী সময়ে) সমগ্র ইসলামী দুনিয়াকেই ভুগতে হয়েছিল। শায়খ আব্দুল আযীয বারংবার অনুরোধ করলেন যে, স্থানীয় আলেমগণের একটি কমিটি ডাকা হোক এবং বিরোধমূলক বিষয় সম্পর্কে খেলাখুলিভাবে আলোচনা করা হোক। কিন্তু স্থানীয় আলেমগণ তাতে কর্ণপাত করলেন না বরং তাঁরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, "এই ওয়াহ্হাবীদের সাথে আলোচনায় কোন লাভ নেই, কারণ তাঁদের আকীদা আমাদের পূর্ব পুরুষগণের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

হরমে পাকের আলেমগণ (এ সময়) যদি অদূরদর্শিতার পরিচয় না দিতেন এবং শরীফ গালেব এবং আমীর আবদুল আযীযের মধ্যে আপোষ মিমাংসা হয়ে যেত তা হলে মুসলমানের বহু মূল্যবান বিনষ্ট হত না।[৮০]

অতি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, বিশ্র এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেননি।

---

[৮০] রওযাতুল আফকার (২) ১৬২-১৯২ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

নজদের তৃতীয় প্রতিনিধিদল

দ্বিতীয় প্রতিনিধিদলের আলোচনা ব্যর্থ হলে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে গেল। ১২০৫ হিজরীতে সর্বপ্রথম শরীফ গালেবই তার সূচনা করলেন এবং এ সংঘর্ষ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। মধ্যে মধ্যে কোন কোন সময় আপোষও হতে থাকে। ইতোমধ্যে নজদী সৈন্যবাহিনী আরব উপদ্বীপের অন্যান্য এলাকায় তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে থাকে। ফলে ১২১১ হিজরীতে তাঁরা এহ্সার নিকটবর্তী আমায়ের নামক দ্বীপের উপর আক্রমণ চালিয়ে সফলতার সাথে প্রত্যাবর্তন করেন।[৮১] নজদী শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করে শরীফ গালেব পুনরায় আপোষের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি আমীর আবদুল আযীযের নিকট এরূপ একজন আলেম প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন, যিনি মোআহ্হেদীনদের মতবাদ সম্পর্কে মক্কাবাসীদেরকে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল করতে পারেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল স্বয়ং শায়খুল ইসলামের জীবদ্দশায় তাঁর হেদায়াত অনুসারেই গিয়েছিলেন এবং শায়খের লিখিত চিঠিও তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তৃতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণের প্রস্তাব শায়খের ইন্তে কালের (১২০৬ হিঃ) পর এসেছিল, তবুও আমীর আবদুল আযীয বিন মুহাম্মদ বিন সউদ তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কারণ তাবলীগ ছাড়া অন্য কোন বস্তুই তার নিকট অধিক প্রিয় ছিলনা। তিনি শায়খুল ইসলামের বিখ্যাত শাগরেদ আহমদ বিন নাসের বিন ওসমান বিন মোআ'ম্মারকে নেতা নির্বাচিত করে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করলেন।

আহমদ বিন নাসের তার সঙ্গীসহ মক্কায় গমন করে প্রথমে কা'বা গৃহের তওয়াফ করলেন। অতঃপর আমীর আবদুল আযীযের প্রেরিত উপঢৌকন শরীফের নিকট পেশ করলেন। মক্কাবাসীরাও প্রতিনিধিদলকে বন্ধু সুলভ অভ্যর্থনা জানালেন এবং কয়েকদিনব্যাপী স্থানীয় আলেমগণের সাথে উক্ত দলের আলোচনা অনুষ্ঠিত হল। পরিশেষে আহমদ বিন নাসেরের নিকট কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত তার লিখিত জওয়াব কামনা করা হলে শায়খ আহমদ বিন নাসের তার অতি যক্তিপূর্ণ ও বিস্তারিত জওয়াব লিখলেন, যা একটি পুস্তিকাকারে 'الفواكه العذاب في الرد على من

---

[৮১] উরওয়ানুল মাজদ (১) পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

لم يحكم السنة والكتاب' (আলফাওয়াকেহুল উজাব ফির্‌রাদ্দে- আ'লা মান লাময়্যুহাক্কেমুস সুন্নাতা ওয়াল কিতাব- মজমুআয়ে হাদীয়াতুসসানীয়াহ ৫০-৯০ পৃঃ- নামে মুদ্রিত হয়েছে। এ পুস্তিকায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দু'টি বিষয়ের মুদ্রিত হয়েছে। ১) (গায়রুল্লার নিকট) সুফারিফ ও সাহায্য প্রার্থনা এবং (২) নামায পরিত্যাগকারীদের কাফের হওয়া এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার বৈধতা প্রমাণ করা। (পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, সুতরাং এখানে তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক)

এই মুনাজেরা ১২১১ হিজরীতে গালেবের উপস্থিতিতেই এক জনাকীর্ণ মজলিশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইবনে গান্নাম ১২১১ হিজরীর ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ- মক্কাবাসী আলেমগণ শায়খ আহমদের প্রমাণাদির যৌক্তিকতা স্বীকার করা সত্ত্বেও সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলেন না.....।

إنهم اعترفوا باستقامة حججة ومع ذلك جحدوا ... ... الخ

ইবনে গান্নাম স্বীয় গ্রন্থে পূর্ণ পুস্তিকাটিই নকল করে দিয়েছেন।[৮২] ফেলবী কর্ত্তৃক এ প্রতিনিধিদল এবং মুনাজেরার পূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে অথচ ইবনে বিশ্‌র এর উল্লেখ করেননি। বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে।[৮৩]

প্রতিনিধিদলের নেতা শায়খ আহমদ বিন নাসের সম্পর্কে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শায়খ আবদুল আযীয বিন হাসীনের (মৃত হিঃ ১২৩৭ হিঃ) ন্যায় তিনিও শায়খুল ইসলামের শিষ্য ছিলেন। শায়খের ভ্রাতা সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (মৃঃ ১২০৮ হি) এবং তার অন্যতম শিষ্য ঐতিহাসিক ইবনে গান্নামের (মৃঃ ১২২৫ হিঃ) নিকটও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দরঈয়াতে দীর্ঘদিন যাবৎ বিচারপতি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমীর সউদ বিন আবদুল আযীয (১২১৮-১২২৯ হিঃ) কর্ত্তৃক তিনি অধ্যাপনা ও ফৎওয়া প্রদানের জন্য পবিত্র মক্কাধামে প্রেরিত হয়েছিলেন। জুলহিজ্জা মাসের মধ্যভাগে ১২২৫ হিজরীতে (জানুয়ারী ১৮১১ খ্রীঃ) তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন।[৮৪]

---

[৮২] রওয়াতুল আফকার (২) ২২৬-২৬১ পৃষ্ঠা।

[৮৩] Arabia 71-72 page.

[৮৪] উনওয়ানুল মাজদ (১) ১৫২ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

যুদ্ধের পর আপোষ (১২১৩ হিঃ)

নজদী ওয়াহ্হাবীদের অসাধারণ সফলতায় এখন কেন্দ্রীয় সরকারও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।[৮৫]

বাগদাধীপতি সোলায়মান পাশাকে তা রোধের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং তিনি সোয়ায়নী ও আলী পাশার নেতৃত্বে যথাক্রমে সৈন্য প্রেরণ করলেন।[৮৬] কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে ফিরে আসলেন। এর ফলে নজদী সৈন্যরা ইরাকের সীমান্ত অঞ্চলে ক্রমাগত আক্রমণ পরিচালনা করতে লাগল। আমীর আবদুল আযীয আরও অগ্রসর হয়ে বাহ্রায়েন এবং আম্মানের উপকূলীয় অঞ্চল দখল করে নিলেন, যা বসরা এবং বাগদাদের তুর্কী শাসকদের আক্রমণ সত্ত্বেও অতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

নজদীদেরকে হজ্জ হতে বারণ করা এবং এর প্রতিশোধে তাদের উপর আক্রমণ এবং এরাকী হাজীদেরকে অবরোধ করা মক্কার শরীফগণের পক্ষে সর্বদা চাঞ্চল্যের কারণ হয়েছিল। পরিণাম স্বরূপই বাধ্য হয়ে তাঁরা নজদবাসীদেরকে বহুবার হজ্জের অস্থায়ী অনুমতি প্রদান করেছিল এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধও জানিয়েছিল। কিন্তু সুযোগ পেলেই তারা আবার আক্রমণ চালাতে ত্রুটি করাননি। গালেবের এই অভ্যাস সর্বদাই ছিল এবং ১২০৫/১৭৯০, ১২১০/১৭৯৫ এবং ১২১২/১৭৯৮ হিজরীতে ক্রমাগত তৈয়ারীর পর সে আক্রমণও করেছিল। কিন্তু সর্বদাই সে পরাজিত হয়েছিল।[৮৭] ১২১২ হিজরীতে সর্বশেষ এবং কঠোর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় এবং তুব্বার নিকটবর্তী বিখ্যাত খুর্মা গ্রামে মারাত্মকভাবে পরাজয় বরণ করে।[৮৮]

---

[৮৫] ১৩১২ হিজরীতে গালেব বিশেষভাবে ওয়াহ্হাবীদের প্রতিরোধের প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁরা এদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। কিন্তু আমরা দেখছি যে, ইতোপূর্বেই বাগদাদের শাসনকর্তা সোলায়মান পাশা নজদীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। অতঃপর ১২১৩ হিজরীতে সোলায়মানের সহকারী আলী পাশা নজদীদের উপর এরূপ আক্রমন চালায় যে, তাদের জীবনকাল অবশিষ্ট না থাকলে তারা অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। খোলাসাতুল কালাম ২৬৬-২৬৮ পৃঃ)

[৮৬] ১২১১/১৭৯৭ ও ১২১৩/১৭৯৮ খ্রীঃ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য উনওয়ানুল মজদ ১ম খন্ড ১০৭, ৮,৯ ফেলবী ৬৮-৭ পৃ দ্রষ্টব্য।

[৮৭] উনয়ানুল মাজ্দ (১) ৮৬,৮৭, ১০৭, ১১২ ও ১১৩ পৃঃ ফেলবী ৫১, ৫৩, ৬৪ ও ৭৪ পৃষ্ঠা।

[৮৮] এ যুদ্ধ খুর্মার ঘটনা বলে বিখ্যাত। শওয়াল ১২১২ হিজরী (মার্চ ও এপ্রিল ১৭৯৮ সালে) সংঘটিত হয়। পরাজয় বরণ করে গালেব ৩রা জিলকাদা মোতাবেক ১৯শে এপ্রিল ১৭৯৮ মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন– খুলাসাতুল কালাম, ২৬৭ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

তার সহস্রাধিক সৈন্য নিহত হয়। অতঃপর নজদীদের সাথে আপোষ করা এবং তাদেরকে হজ্জের অনুমতি দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ান্তর থাকে না। এলাকার মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করা হয় এবং উতায়বা হরব ও আসীরের উত্তরাঞ্চল শরীফের রাজ্যভুক্ত থাকে।

এ আপোষচুক্তি ১২১৩ হিজরীতে জমাদিউল আউয়ালের শেষের দিকে, ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৮৯] অতঃপর ১২১৩ হিঃ হতে ১২১৫ হিজরী পর্যন্ত নজদ ও ইরাকী হজ্জযাত্রীগণ নিরাপদে হজ্জপর্ব সম্পন্ন করতে থাকেন।

১২১৩ হিজরীর হজ্জ

খুরমার ঘটনার পর শরীফ আমির আবদুল আযীযের নিকট দুগ্ধ পাঠিয়ে আপোষের অনুরোধ করলেন এবং আবদুল আযীযও তা গ্রহণ করলেন। ফলে শরীফ কর্তৃক নজদবাসীদেরকে হজ্জের অনুমতি দেয়া হয়।

এ বৎসর নজদের একটি বিরাট দল হজ্জ সমাধা করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল ইসলামের দুই পুত্র আলী বিন মুহাম্মদ এবং ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ।[৯০]

উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আপোষ চুক্তি হয়ে গেলে যুদ্ধ বন্ধ এবং পূর্ণ নিরাপত্তা ঘোষিত হল। ওয়াহ্হাবীদেরকে হজ্জপর্ব সমাধার অনুমতি দেয়া হল এবং তাদের সাথে কোনরূপ সংঘর্ষ হতে নিবৃত্ত থাকার জন্য জনসাধারণকে কঠোর নির্দ্দেশ দেয়া হল। তখন নজদবাসীগণ নির্বিঘ্নে মক্কার প্রতি প্রান্তে প্রচারকার্য্য চালাবার সুযোগ লাভ করলেন। বস্তুতঃ এ আল্লাহর মহিমাই বটে!![৯১]

আহমদ দাহ্লান হামদ বিন নাসেরের হজ্জ সমাধা করার কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে বিশ্র তাঁর নাম উল্লেখ করেননি।

এ বৎসর আমীর আবদুল আযীয অথবা তাঁর পুত্র হজ্জ সম্পন্ন করতে সক্ষম হননি। কারণ সোলায়মান পাশা কর্তৃক তাঁর প্রতিনিধি আলী নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী তাঁদের মোকাবেলায় পাঠিয়েছিলেন। এ সৈন্য

---

[৮৯] খুলাসাতুল কালাম ৬৬৭ পৃষ্ঠা।

[৯০] উনওয়ানুল মাজদ (১) ২২০ পৃষ্ঠা।

[৯১] খুলাসাতুল কালাম, ২৬৮ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

বাহিনীর প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনায় পিতা-পুত্র উভয় অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এটি ১২১৩ হিজরীর (১৬৯৯) রমযান ও জুলকা'দার ঘটনা।

১২১৪ হিজরীতে হজ্জ

এ বৎসর সউদ বিন আব্দুল আযীয সর্ব প্রথম হজ্জ সম্পন্ন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি নজ্দবাসীদের এক বিরাট কাফেলা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। অতি উত্তমরূপে উম্‌রা ও হজ্জক্রিয়া সম্পন্ন করে তিনি নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এ সফরে মক্কার শরীফ আবতাহ্ নামক স্থানে সউদের অবস্থান স্থলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি ২৮ শে জুলহিজ্জা (মে ১৮০০ খ্রীঃ) তারিখে প্রত্যাবর্তন করেন।

১২১৫ হিজরীর হজ্জ

১২১৫ হিজরীতে আমীর আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ বিন সউদ নিজে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের ইচ্ছা করতঃ নজদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিপুল জনসমাবেশে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু সাত দিবসব্যাপী ক্রমাগত সফর করার পর তিনি ফিরে আসলেন। কিন্তু সউদ অতি শানশওকতের সাথে হজ্জপর্ব সমাধা করেন এবং সহস্রাধিক মুদ্রা দান-খয়রাত ও পারিতোষিক হিসাবে বন্টন করলেন। এটি তার দ্বিতীয় হজ্জ ছিল।[৯২] উভয় বৎসরই সউদের নেতৃত্বে হজ্জের কাফেলা নিরাপদে অতি শান্তির সাথে নজদ সীমা অতিক্রম করেছিল। দ্বিতীয় বৎসর আম্মানের শাসনকর্তাও হজ্জ সমাধা করেছিলেন।[৯৩]

১২১২ হিজরী হতে ১২১৫ পর্যন্ত যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা এবং হজ্জের উপরোক্ত শ্রেণীগত বিবরণ বিশ্বস্ত গ্রন্থ হতে গৃহীত। আমীর শকীবের বর্ণনা সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যের কোন লেখকের লেখার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় বর্ণনাধারায় উলট পালট হয়ে গেছে। অধিকন্তু তাতে আপোষকাল ও হজ্জ সমাধা করার সনের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে মারুতমানের প্রবন্ধে সনের উল্লেখ থাকলেও বর্ণনাধারায় উলট পালট হয়ে গেছে।

---

[৯২] উনওয়ান (১) ১২১ পৃষ্ঠা।

[৯৩] ফেলবী, ৮১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

১৮০২ খ্রীঃ ১২১৬ হিজরীতে কারবালা আক্রমণ

(সাধারণ ইতিহাসে) নজদীদের কারবালা আক্রমণ, নজফ এবং হোসাইন ভ্রাতৃদ্বয়ের দেশের মার্য্যাদাহানির কাল্পনিক কাহিনীকে অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। (প্রকৃত ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত) সুতরাং আমরা নিম্নে প্রকৃত ঘটনাগুলো অতি সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করছিঃ-

"(নজদী) হাজীদের কাফেলার উপর ফিরার পথে ইরাকের বিভিন্ন গোত্র আক্রমণ চালায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদেরকে এ আক্রমণের নির্দেশও দেয়া হয়েছিল, যাতে ওয়াহ্হাবীদের কাফেলার শৃঙ্খলা এবং দায়িত্ব পালনের উপর অপবাদ রটানো যেতে পারে। কিন্তু বাগদাদ এবং আশরাফদের সাথে ওয়াহ্হাবীদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনি। সুতরাং শিয়া গোত্র খাজায়েল কর্তৃক ওয়াহ্হাবী (হাজীদের) কাফেলার উপর যে আক্রমণ চালানো হয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সউদ বিন আবদুল আযীয ১৮ই যুলহিজ্জা ১২১৬ হিজরীতে (২১শে এপ্রিল ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে) কারবালা শহর আক্রমণ করেন। (ফেলবী- ৮১ পৃঃ ও মারুতামানের প্রবন্ধ) এ বৎসরেই (১২১৬ হিঃ) সম্পূর্ণ নজদ, দক্ষিণাঞ্চল, হেজায তেহামা হতে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সউদ কারবালা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং বলাদুল হোসাইনের অধিবাসীদের উপর আক্রমণ করলেন। এও যুলহিজ্জার ঘটনা।[৯৪] মুসলমানেরা ব্যাপকভাবে তা আক্রমণ করলেন। তার দেয়াল অতিক্রম করে জোরপূর্বক তার ভিতরে প্রবেশ করে গেলেন। তার অধিকাংশ অধিবাসীদেরকে তাদের গৃহে আর বাজারে হত্যা করা হল এবং যে কুব্বা তাদের আকীদা অনুসারে হোসাইনের কবরে নির্মিত ছিল তা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হল। কুব্বা এবং তাদের পার্শ্বে যা কিছু নিবেদিত ছিল তা অপসারণ করা হল। কুব্বাটি মূল্যবান প্রস্তরে সুশোভিত ছিল। তা ছাড়া শহরে যে সমস্ত সম্পদ (অস্ত্র-শস্ত্র, মূল্যবান পোশাক, স্বর্ণ, রৌপ্য, অতি মূল্যবান কোরআনের কপি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি) ছিল, তা অধিকার

---

[৯৪] যুলকা'দা ১২১৬ হিঃ মার্চ ১৮০২ ইং। সম্ভবতঃ এটা রওয়ানা হওয়ার তারিখ। আসলে আছে- وفيها سار سعود بالجيوش وذلك في ذي القعدة মারুতমান আক্রমণের বিশুদ্ধ তারিখ লিখেছেন ১৮ই যুলহিজ্জাহ্ ১২১৬ হিঃ (২১ শে এপ্রিল ১৮০২) এবং এটাই সঠিক বলে মনে হয়।

http://www.shottanneshi.com

করলেন। অতঃপর শহরে একবেলার অধিক সময় অবস্থান না করে যোহরের সময় সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে আসলেন। এ আক্রমণে শহরের অধিবাসীদের মধ্যে আনুমানিক দুই হাজার লোক নিহত হয়।[৯৫]

এ ঘটনায় নজদবাসীরা কিছুটা শান্তি লাভ করেছিল বটে, কিন্তু এতে সাধারণ মুসলমানের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। বিশেষতঃ ইরানের শিয়া সম্প্রদায় অত্যধিক ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। কথিত আছে যে, ফতেহ্ আলী শাহ্ কাচার (১২১২/১২৫০ হিঃ- ১৭৯৮-১৮৩৪ খ্রীঃ) এক লক্ষ সৈন্যসহ নজদ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং বাগদাদের শাসনকর্তা সোলায়মান পাশাও এক বিরাট বাহিনী সমাবেশ করছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ ইরানীদের রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেল এবং সোলায়মান কুর্দিদের বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। সুতরাং তাদের নজদ আক্রমণের ইচ্ছা পূর্ণ হল না।[৯৬] (কারবালা আক্রমণে) ইরানাধিপতি ফতেহ আলী শাহ্ কাচারের ক্রোধান্বিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু নজদ আক্রমণের ইচ্ছার কথা অন্যান্য ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। প্রাচ্যের বিখ্যাত পাটনা লাইব্রেরীর একটি পান্ডুলিপি[৯৭] হতে এ সম্পর্কে কিছুটা আলো পাওয়া যায়। তাতে আমীর শাহ্ কাচারের নামে লিখিত একটি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে। উক্ত চিঠিতে নজফবাসীদের শির্কী কার্য কলাপের নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কতল করার বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, যদি ফতেহ্ আলী শাহ্ সেই অপকর্মগুলোর প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করেন তা হলে নজদ-অধিপতিকেই বাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে কাঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ চিঠির সাথে ফতেহ্ আলী শাহের জওয়াবও সন্নিবেশিত রয়েছে। তাতে শাহ্ কাচার নজদের আমীরকে সতর্ক করেছেন এবং তাঁকে সেই সমস্ত অন্যায়াচরণ হতে বিরত থাকার তাকীদ করেছেন।

পত্রের প্রারম্ভে অতি সংক্ষিপ্তভাবে শায়খুল ইসলামের আন্দোলনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এটি সউদ বিন আবদুল আযীয কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে এবং মূল পত্রটি আমীর আবদুল আযীয বিন মুহাম্মদ বিন সাউদের

---

[৯৫] উনওয়ানুল মাজ্দ (১) ১২১-২২ পৃষ্ঠা।

[৯৬] হাযিরুল আলামীল ইসলামী (৪) ১৬৩ পৃষ্ঠা।

[৯৭] ইংরেজী বিস্তারিত পাঠ্যসূচী Catalogue Raionne (১৪ খন্ড) ১৩৩৭।

http://www.shottanneshi.com

পক্ষ হতে লেখা হয়েছে। কারবালা আক্রমণের সময় আমীর আবদুল আযীয শাসনকর্তা ছিলেন এবং তদীয় পুত্র সউদ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। সুতরাং চিঠিতে উভয়ের নাম থাকাই স্বাভাবিক।

এই সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা ১২১৯ হিজরীতে (১৮০৪ খ্রীঃ) লেখা হয়েছিল অর্থাৎ ঘটনার মাত্র আড়াই বৎসর পরে তা লেখা হইয়াছিল। লিপিতে তারিখ দেয়া হয়নি। তবে তা যে কারবালা আক্রমণের নিকটবর্তী সময়েই লিখিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে ফতেহ আলী শাহের পূর্বোল্লিখিত আক্রমণের কোন উল্লেখ নেই। অধিকন্তু মিঃ ফেলবির বর্ণনায় আমরা এও অবগত হতে পারছি যে, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফতেহ আলী শাহ্ এবং সউদ বিন আবদুল আযীযের পারস্পরিক সম্পর্ক উত্তম ও বন্ধুসুলভ ছিল।[৯৮]

অতএব শাহে ইরানের উল্লিখিত নজদ আক্রমণ সম্পর্কে আমরা দৃঢ়তার সাথে কিছুই বলতে পারছি না।

পক্ষান্তরে, ইরাকাধিপতি সোলায়মানের আক্রমণ সম্পর্কেও শুধু একটুকুই বলা যেতে পারে যে, ১২১৭ হিজরীতে অর্থাৎ কারবালা আক্রান্ত হওয়ার অতি অল্পদিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন।[৯৯]

চুক্তিপত্র বাতিল ১২১৭ হিঃ

খুরমা নগরীর ঘটনার পর শরীফে মক্কা ও আমীর নজদের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তা অধিক সময় স্থায়ী হতে পারল না। শরীফ গালেবের নিকট নজদী সৈন্যদের সীমালঙ্ঘন ও চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ পৌঁছতে লাগল। পত্রালাপেও কোন মীমাংসা হল না। তখন শরীফ কর্তৃক তাঁর উজির উসমান মোজায়েফী নজদ সরকারের সাথে আলোচনার জন্য প্রেরিত হলেন। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে পড়লেন এবং প্রত্যাবর্তন করে তাদের পক্ষ হতে গালেবকে মোকাবেলার আহ্বান জানালেন। এদিকে গালেব এবং তদীয় ভ্রাতা আবদুল মুঈনের মধ্যে বিরোধ বেঁধে গেল এবং আবদুল মুঈন সউদের নিকট সাহায্য কামনা করলেন। (তিনিও অগ্রসর হলেন) এবং তায়েফের নিকট উভয় দলের

---

[৯৮] Arabia, P. 90.

[৯৯] উনওয়ানুল মাজদ (১) ১২২ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

সংঘর্ষ বেঁধে গেল। অতঃপর গালেব তায়েফের এক দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। তায়েফ সউদের সৈন্যবাহিনীর অধিকারে এসে গেল। উসমান মুজায়েফী হেজাযের গভর্ণর[১০০] নিযুক্ত হলেন এবং নজদী সৈন্যবাহিনী তার চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত হয়ে পড়ল এবং মক্কা অভিমুখে ধাবিত হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল।

হজ্জের সময় নিকটবর্তী ছিল। সিরিয়ার কাফেলা আবদুল্লাহ পাশার নেতৃত্বে হরম হতে মাত্র তিন দিনের দূরবর্তী স্থানে এসে থামল। সউদের সাথে তারা আপোষ করল এ শর্তে যে, তিন দিনের মধ্যে হজ্জ ক্রিয়া সমাধা করতঃ তারা ফিরে যাবে। গালেব আবদুল্লাহ পাশাকে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ করলেও তিনি পূর্ব নির্ধারিত শর্তানুসারে হজ্জ করার পরই ফিরে গেলেন এবং গালেবের অনুরোধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।[১০১]

বিজয়ী বেশে মক্কা প্রবেশ

(মুহার্‌রম ১২১৮ হিঃ, এপ্রিল ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ)

হজ্জ সমাপ্ত হওয়ার পরেই গালেব জিদ্দায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং সউদ বিন আবদুল আযীয ১২১৮ হিজরীর মুহর্‌রম মাসে (৩০ শে এপ্রিল ১৮০৩ খ্রীঃ)[১০২] বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। মক্কার অধিবাসীদের পক্ষ হতে তাকে কোনরূপ বাধা দেয়া হল না। অতঃপর আমীর সউদ বিন আবদুল আযীয গালেবের ভ্রাতা আবদুল মুয়ীনকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করে নিজে সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

"... ... সউদ কর্তৃক মক্কার অধিবাসীগণকে নিরাপত্তা দান করা হল, তিনি তাদের মধ্যে মুক্তচিত্তে দান-দক্ষিণা ও পুরস্কার বিতরণ করলেন। আমীর সউদ ও অন্যান্য মুসলমান তাওয়াফ (কা'বা প্রদক্ষিণ) ও সয়ী (ছাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে দৌড়ান) হতে অবসর গ্রহণ করলে এলাকাবাসীদেরকে কুব্বা এবং শির্কীয়া তীর্থকেন্দ্রগুলো ভেঙ্গে ফেলার কাজে নিয়োজিত করা হল।

---

[১০০] ১৩১৭ হিজরী সালের শেষের দিকে ১৮০৩ খ্রীঃ।

[১০১] উনওয়ান (১) ১২২ পৃঃ ফেলবী-৮৩ পৃঃ।

[১০২] ডিকশনারী অব ইসলাম, ৬৬০ পৃষ্ঠার মক্কা প্রবেশের তারিখ ২৭শে এপ্রিল দেওয়া হয়েছে। এ ঠিক নয়। সম্ভবতঃ জুয়ইমীরও এ ভুলই উদ্ধৃত করেছেন। (১) ১৯৪ পৃঃ।

http://www.shottanneshi.com

Contents

মক্কার প্রতি অংশেই অতি মাত্রায় এরূপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। সউদ কুড়ি দিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ের মধ্যে মুসলমানগণ কুব্বাগুলোকে ভাঙ্গতে থাকেন। এরূপে মক্কার সমস্ত তীর্থকেন্দ্র এবং কুব্বা গুলো ভুমিসাৎ করার কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়।[১০৩]

সউদ আবদুল মুঈনকে আমীর নিযুক্ত করে নিজে হরম শরীফকে শির্কের কলুষ-কালিমা হতে পাক-সাফ করার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করলেন। কা'বা গৃহের মণি-মুক্তা এবং মূল্যবান সম্পদ বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করা হল। কুব্বাসমূহ ধূলিসাৎ এবং দরগাহের কতিপয় খাদেমকে হত্যা করা হল।[১০৪] ইবনে বিশ্‌র মণিমুক্তা বন্টন এবং খানকাহের খাদেমদের কতল করার বিষয় মোটেই উল্লেখ করেননি।

এটা ছিল সউদের মক্কা প্রবেশের একটি দিক মাত্র। সম্ভবতঃ সাধারণ লোকের এটা মনঃপুত হবে না। এর অপর একটি দিকও লক্ষ্য করুনঃ- পাদরী Hughes এর বিবরণ এই যে, "হরমকে (শির্কের কালিমা হতে) পাক-সাফ করায় স্থানীয় অধিবাসিদের একটুও কষ্ট হয়নি এবং নজদী শাসনকর্তাদের মক্কার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণের পর তথাকার মসজিদগুলো এরূপ আবাদ হয়ে উঠল যে, পবিত্র মক্কা নগরীতে এবাদত-বন্দেগীর এরূপ উদাহরণ রসূলুল্লার যুগের পর আর কোন সময় পরিলক্ষিত হয়নি।[১০৫]

ইউরোপের (পাশ্চাত্যের অপর একজন পন্ডিত (বার্কহার্ট) লিখেছেন-

"পবিত্র নগরীতে প্রবেশের সময় নজদী সৈন্যবাহিনী কোনরূপ অন্যায় আচরণ করেনি। প্রবেশের পর দিবসেই সমস্ত দোকানপাট খুলে যায় এবং সৈন্যবাহিনীর লোকেরা নগদমূল্যে তাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করে নেয়।[১০৬]

তিনি আরও লিখেছেন, মক্কাবাসীগণ এখন পর্যন্ত সউদের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে থাকেন। বিভিন্ন যিয়ারত কেন্দ্রে এবং হজ্জের সময়ে সৈন্যবাহিনীর প্রশংসনীয় কার্যকলাপ বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়ে

---

[১০৩] উনওয়ান (১) ১২২/১২৩

[১০৪] ফেলবী ৮৩ পৃষ্ঠা।

[১০৫] ডিকশনারী অব ইসলাম, ৬৬০ পৃষ্ঠা।

[১০৬] Notes on bedouins etc (ii) P.195 Brydge এর গ্রন্থ A brief of the wahhaby দ্রষ্টব্য।

http://www.shottanneshi.com

থাকে। সউদের সৈন্যবাহিনীর মক্কা শরীফে প্রথমবার প্রবেশের সময় অনুষ্ঠিত ন্যায়াচরণ এখন পর্যন্ত তাদের অন্তরে জাগরিত রয়েছে।[১০৭]

এ ছাড়াও অপরিহার্য্যভাবে লোকদের জামাতের সাথে নামায আদায় করতে বাধ্য করা হয়। রেশমী কাপড় এবং ধুমপান করার উপকরণগুলো বিনষ্ট করা হয়। অনৈসলামিক ট্যাক্স এবং শুল্ক প্রভৃতি রহিত করা হয়।[১০৮] বারংবার জমাতের অনুষ্ঠানও বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বিভিন্ন ফেকহী মতবাদের আলেমবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে (ওয়াক্তে) ইমামতি করতে থাকেন।[১০৯]

নজদবাসীদের আকীদা ও কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য শায়খ আবদুল্লাহ বিন শায়খুল ইসলামের দ্বারা একটি পুস্তিকা লিখিয়ে তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[১১০] এ পুস্তিকায় কুব্বা এবং খানকাসমূহ ভেঙ্গে দেয়ার বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্যান্য বিরোধমূলক বিভিন্ন মসলা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। অধিকন্তু দাহলানের বর্ণনানুসারে শায়খুল ইসলাম বিরচিত "কাশ্ফুশ্ শুবহাত" নামক পুস্তকখানার গঠন ও পাঠনের নির্দেশও জারী করা হয়।[১১১]

শরীফ গালেবের জিদ্দায় আশ্রয় গ্রহণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সউদ মক্কায় চৌদ্দ দিবস অবস্থান করার পর ২২শে মোহার্‌রম ১২১৮ হিঃ তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন, কিন্তু আক্রমণে বিফল হলেন। তাঁর সৈন্য প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল এবং বাধ্য হয়ে তাকে হেজায ত্যাগ করতে হল। মক্কায় তাঁর দু'শত লোক রয়ে গিয়েছিলেন; তাদেরকে গালেবের অনুসারিরা নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলল।[১১২]

আমীর আবদুল আযীযের শাহাদাৎ (রজব ১২১৮ হিঃ)

১৮ ই রজব ১২১৮ হিজরীতে (৪ঠা নভেম্বর ১৮০৩ খ্রীঃ) আমীর আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ বিন সউদ পূর্ব অভ্যাসানুসারে দওঈয়াতে আসরের নামাজ পড়াচ্ছিলেন। ঠিক সিজদার অবস্থায় জনৈক নরপিশাচ

---

[১০৭] দ্বিতীয় খন্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা।
[১০৮] আল হাদীতুস্সানীয়াহ; ৪৩ পৃষ্ঠা।
[১০৯] খুলাসাতুল আহকাম, ২৭৮ পৃষ্ঠা।
[১১০] হাদীয়াতুস্ সানীয়াহ, ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠা।
[১১১] খুলাসাতুল কালাম, ২৭৯ পৃষ্ঠা।
[১১২] হাযিরুল আ'লামিল ইসলামী (৪) ১৬২ পৃষ্ঠা; ফেলবী, ৮৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

ছুরিকাঘাতে তাঁকে শহীদ করে। সাধারণ ধারণা এই যে, হত্যাকারী কোন ইরানী অথবা কুর্দ্দি শিয়া ছিল[১১৩] যার কতিপয় ছেলে কারবালাতে নজদীদের হাতে নিহত হয়েছিল। এর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সে দরঈয়াতে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিল। অতি দরিদ্র ও দরবেশী বেশে দেখে আমীর আবদুল আযীয তার যথেষ্ট খাতিরও করেন। এক বৎসর অবস্থান করার পর সে সুযোগ লাভ করে আমীর আবদুল আযীযকে হত্যা করতঃ তার পাপাসক্ত অন্তরের ঝাল মিটিয়েছিল। আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ বিন সউদ ১১৭৯ হিজরী হতে ১২১৮ হিজরী (১৭৬৫-১৮০৩ খ্রীঃ) পর্যন্ত সর্বমোট উনচল্লিশ বৎসর বাজত্ব করেছেন এবং তাঁর রাজত্বের অধিক সময় স্বয়ং শায়খুল ইসলামের পর্যবেক্ষণেই অতিবাহিত হয়েছিল। ১২০৬ হিজরী পর্যন্ত আবদুল আযীয তাঁর পিতার যুগেই বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম (১১৫৯-১১৭৯ হিঃ) তাঁরই নেতৃত্বে সফলতা লাভ করেছিল। যেমন তাঁর যুগে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ তদীয় স্থলাভিষিক্ত পুত্র সউদের নেতৃত্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। আমীর আবদুল আযীয স্বয়ং শায়খুল ইসলামের সাহায্য লাভ করেছিলেন, সুতরাং তাবলীগের প্রেরণায় তিনি সর্বদা উদগ্রীব থাকতেন। যে স্থানই তাঁর অধিকারভুক্ত হত, সর্বাগ্রে সেখানে তিনি প্রচারক দল গঠন করতেন। প্রজার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন তাঁর মজ্জাগত ছিল। বিস্তারিত বিবরণের এখানে অবকাশ নেই। ইবনে বিশ্‌র কর্তৃক আবদুল আযীযের গুণ গরিমার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।[১১৪] আমরা এ প্রসঙ্গে শুধু আল্লামা কাযী মুহাম্মদ বিন আলী শওকানীর (১১৭৩-১১৫০ হিঃ) একটি সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

বস্তুতঃ শাওকানী আমীর আবদুল আযীযের সমসাময়িক ছিলেন এবং শায়খুল ইসলামের মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগেও তাঁকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না।[১১৫] তিনি বলেছেনঃ

---

[১১৩] সাধারণ ঐতিহাসিকগণ হত্যাকারীকে ইরানী শিয়া বলেছেন। (ফেলবী ৮৪ পৃঃ হাযির (৪) ১৬ পৃঃ) কিন্তু ইবনে বিশ্‌র তাকে কুর্দ্দী বলেছেন (১) ১২৩ পৃঃ এবং "ক্বিলা" বলে শিয়াও বলেছেন। কারণ কুর্দ্দী শিয়া নয় বরং কঠোর সুন্নী বলে খ্যাত। তিনি তার নাম ওসমান বলেও উল্লেখ করেছেন। সে মওসুলের নিকটবর্তী এমারিয়া জনপদের অধিবাসী ছিল (১) ১২৪ পৃষ্ঠা।

[১১৪] (১) ১২৪-১২৮ পৃষ্ঠা।

[১১৫] চতুর্থ অধ্যায়ে দা'ওয়াত ও পঞ্চম অধ্যায়ে ভুল বিবরণ দ্রষ্টব্য।

http://www.shottanneshi.com

"... ... ... যারাই আবদুল আযীযের হুকুমতে প্রবেশ করতেন তারাই নামায, এবং অন্যান্য সমস্ত ইসলামী রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তেন। সিরিয়ার আরব আবদুল আযীযের ভক্তদলের অন্তর্ভুক্ত হলেই তারা ফরায়েযে দ্বীনের কঠোর পাবন্দ হয়ে পড়ে অথচ ইতোপূর্বে তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিল না এবং ভুলত্রুটিসহ কোনমতে কালেমা পাঠ ছাড়া তারা ইসলামের কোন রুকন পালন করত না। ফলকথা এই যে, তারা পূর্বে মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং এখন তারা ঠিক সময় মত নামায আদায় করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।[১১৬] বার্কহার্ট আমীর আবদুল আযীযের তবলীগী প্রচেষ্টা, কাযী নিয়োগ করা এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতির উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। (২৬ পৃষ্ঠা)।

সউদ বিন আবদুল আযীয ১২১৮-১২২৯ হিঃ

আমীর আবদুল আযীযের শাহাদতের পর তাঁর পুত্র সউদ আমীর পদে বরিত হলেন। কথিত আছে যে, শায়খুল ইসলামের জীবদ্দশায়ই তার ইঙ্গিতানুসারে সউদের ইমারতের বয়আত গৃহীত হয়ে গিয়েছিল।[১১৭]

সউদ রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাষ্ট্রে ইসলামী দাওয়াতের প্রসার কাজে দ্রুত তৎপর হয়ে উঠলেন। দূর দূরান্তরে সৈন্য পরিচালনার ভার তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহর উপর অর্পণ করলেন। আবদুল্লাহ এক দিকে হেজাযের খাইবর অধিকার করলেন এবং অপর দিকে বাহরান, আম্মান এবং রাসূল খীমা পর্যন্ত তাঁর বিজয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন।

এখন তুর্কী উর্ধ্বতন মহলেও উদ্বেগের সঞ্চার হল। ইরাকের গভর্নর আলী পাশা, দেমাশকের গভর্নর আবদুল্লাহ্ পাশা এবং জিদ্দার শাসনকর্তা শরীফ পাশাকে এ বিপদ দূরীভূতি করার নির্দ্দেশ দেয়া হল। ইরাকে আরবী এবং কুর্দ্দিদের এক বিরানী গঠন করা হল। কিন্তু যথাসময়ে এ তৈয়ারী সম্পূর্ণ হতে পারল না। এদিকে সউদ সুযোগ পেয়ে বসরা আক্রমণ করে বসলেন। আলী পাশা দূর্গে অবরুদ্ধ থাকলেন। তাকে ছেড়ে দিয়ে নজদী

---

[১১৬] হিঃ ১২০২ মোতাবেক ১৭৮৮ খ্রীঃ রওয়াতুল আফকার (২) ১৫৪ পৃষ্ঠা; উনওয়ানুল মাজ্দ (১) ৮৩ পৃষ্ঠা।

[১১৭] হিঃ ১২০২ মোতাবেক ১৭৮৮ খ্রীঃ রওয়াতুল আফকার (২) ১৫৪ পৃষ্ঠা; উনওয়ানুল মাজ্দ (১)৮৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

সৈন্যগণ জোবায়রার উপর আক্রমণ চালালেন এবং সমগ্র কুব্বা ও শরিয়ত বিগহির্ত তীর্থ কেন্দ্রগুলো ভেঙ্গে ফিরে আসলেন।[১১৮] সউদ সফলতার সাথে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন এবং আলী পাশা কুর্দ্দিস্থানের বিপ্লব দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ফলে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেল।[১১৯]

১৮০৬ খ্রীঃ এবং ১২২০ হিজরীতে পুনরায় মক্কা বিজয়

এখন আমীর সউদ সর্বদিক হতে নিরাপদ হয়ে গেলেন। আম্মান এবং উপকূল অঞ্চলের অধিবাসী তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। ইরাকের দিক হতে নিরাপদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হেজাযকে স্বীয় অধিকারভুক্ত করার ইচ্ছা করলেন।[১২০] ওসমান মুজায়েফী বিনা প্রতিবন্ধকতায় তায়েফ জয় করে নিলেন এবং ১২২০ হিজরীর প্রারম্ভে মদীনাবাসীও তার আনুগত্য স্বীকার করলেন এবং রাষ্ট্রের সমস্ত সিদ্ধান্ত-নির্দ্দেশ পালন করার এবং আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পূর্ব অভ্যাস অনুসারে মদীনার কবরে কুব্বা এবং যিয়ারতের কেন্দ্রগুলোও ভেঙ্গে ফেলা হল।[১২১]

ইতোমধ্যে নজদী বাহিনীর যে সমস্ত সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী সমুদয় এলাকা জয় করে নিয়েছিল তারাও মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। হজ্জের সময় নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। সিরিয়ার কাফেলা অবরোধের জন্য থেমে গেল। এদিকে মক্কাবাসীরা বিচলিত হয়ে উঠল। ফলে গালেব বাধ্য হয়ে নিরাপত্তা কামনা করলেন এবং সউদের আনুগত্যের ওয়াদা দিলেন।[১২২] সিরিয়ার কাফেলাকে হজ্জের অনুমতি দেয়া হল। গালেব তাঁর আনুগত্যের প্রমাণস্বরূপ সউদের নিকট উপঢৌকন পাঠালেন এবং তিনিও তার সেনাধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহ্হাব আবু নুক্তা এবং ওসমান মুজায়েফীর মনযুর কৃত আপোষ চুক্তিতে মনযুরী দান করলেন। ফলে মক্কায় শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করিতে লাগল। দুর্ভিক্ষের পরিসমাপ্তি ঘটিল। সমস্ত রাস্তাঘাটও নিরাপদ হয়ে গেল।[১২৩]

---

[১১৮] যুলহিজ্জা, ১২১৮ হিঃ মার্চ-এপ্রিল ১৮০৪ খ্রীঃ।

[১১৯] উনওয়ানুল মাজ্দ (১) ১৩০ পৃষ্ঠা, ফেলবী.৮৬। ৮৭ পৃষ্ঠা।

[১২০] যুলকাদা ১২১৯ হিঃ/ফেব্রুয়ারী ১৮০৫ ইং।

[১২১] উনওয়ানুল ১৩৫ পৃষ্ঠা ইষ্টাডর্ড (The new world of lslam P.31) এবং Hughes Dictionary of islam P.660) প্রমুখ রসূলুল্লার কবরের কুব্বা ভাঙ্গার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল, বিস্তারিত শেষ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

[১২২] ১২২০ হিজরীর শেষের দিকে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ১৮০৬ ইং।

[১২৩] উনওয়ানুল মাজ্দ (১) ১৩৩-৩৪ পৃঃ। এই দুর্ভিক্ষ যুলহিজ্জাহ্ ১২১৯ হিজরী হতে যুলকা'দা ১২২০ হিজরী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। খুলাসাতুল কালাম, ২৮৫ পৃষ্ঠা। নজদ ও এয়ামনের

http://www.shottanneshi.com

পাশ্চাত্যের দু'জন চিন্তাবিদ পন্ডিতব্যক্তি (বার্কহার্ট এবং ব্রাইজ) যারা এ ঘটনাগুলোর প্রায় প্রত্যক্ষদর্শীই ছিলেন, পূর্বোল্লিখিত বিবরণের বিপরীত ঘটনার নূতনরূপ প্রকাশ করেছেন। তারা লিখেছেনঃ-

"মদীনা মুনাওয়ারার বিজয় ১৮০৪ সালে সম্পন্ন হয়। ইতোপূর্বে হাসান ফেলবী নামীয় এক ব্যক্তি মদীনার শহর অধিকার করে নিয়েছিল এবং শহরকে সউদের হাতে অর্পণ করার পূর্বে কুব্বার ধন ভান্ডার স্বীয় অধিকারভুক্ত করে সে তার নিজস্ব লোকের মধ্যে বন্টন করে দেয়। বিজয়ের অল্পক্ষণ পরে সউদ মদীনায় গমন করেন এবং কুব্বা খুলে তাতে অবশিষ্ট যৎসামান্য সম্পদ ছিল তা নিজের অধিকারে আনয়ন করেন।[১২৪]

সউদের তৃতীয় হজ্জ ১২২১ হিঃ -১৮০৭ খ্রীঃ

আমীর সউদের দু'টি হজ্জের কথা পূর্বে করা হয়েছে।[১২৫] মক্কা পুনরায় তার অধিকারভুক্ত হলে পুনরায় বায়তুল্লার যিয়ারত এবং তবলীগী প্রচেষ্টা সমাপ্ত করার সুযোগ তাঁর ঘটল। অতঃপর তিনি তৃতীয় হজ্জের উদ্দেশ্যে ১২ই যুলকাদা ১২২১ হিজরীতে (২ শে ফেব্রুয়ারী ১৮০৭ খ্রীঃ) দরঈয়া হতে রওয়ানা হলেন। মক্কার পৌঁছে তিনি স্বীয় মর্যাদা অনুসারে সদ্‌কা ও পুরস্কার বিতরণ করলেন।

যুলহিজ্জার শেষের দিকে তিনি মদিনায় গেলেন এবং সেখানের শাসনতান্ত্রিক সুব্যবস্থা সম্পাদন করে ফিরে আসলেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে দাহ্লান মদীনার হুজরা হতে ধন-সম্পদ বের করার কথা উল্লেখ করেছেন।[১২৬] কিন্তু ইবনে বিশ্‌র সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ঐতিহাসিক ব্লেন্ট[১২৭] ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকও

উপরও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। তবে মক্কানগরীই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যুদ্ধ ও অবরোধের কারণে মক্কাবাসীরা এমনিতেই জর্জরিত ছিল, দুর্ভিক্ষ তাদেরকে সর্বস্বান্ত এবং অর্দ্ধমৃত করেছিল। ঐতিহাসিক ফেলবী মক্কা বিজয়ের সাথে লুটতরাজের ও নরহত্যার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়। আহমদ জয়নী দাহ্লান তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী ওয়াহ্হাবীদের অসংখ্য গালিগালাজ করেছেন অথচ তিনিও এ সব তথাকথিত নরহত্যা ও লুটতরাজের উল্লেখ আদৌ করেননি। খুলাসাতুল কালাম ২৯২ পৃষ্ঠা।

[১২৪] বার্কহার্ট (২) ১৯৮ ও ১৯৯ পৃষ্ঠা, ব্রাইজ ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা।

[১২৫] ১২১৪ হিজরী ও ১২১৫ হিজরীতে।

[১২৬] খুলাসাতুল কালাম ২৯৪ পৃষ্ঠা।

[১২৭] A pilgrimage to Nejd (2) 256 page.

http://www.shottanneshi.com

তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে বিশরের নীরবতার কারণে আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারছি না। নজফের ন্যায় যদি হুজরায়ে নববীর সম্পদও সউদ গ্রহণ করতেন এবং তার সৈন্যের মধ্যে বন্টন করতেন, তবে এ নজদী ঐতিহাসিক অবশ্যই তার উল্লেখ করতেন। কারণ তার নিকট এটা কোন আপত্তিজনক ব্যাপারই ছিল না। নজফ ও কারবালার এরূপ ঘটনার বিবরণ স্বয়ং ইবনে বিশ্‌রের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জাবরতী ও[১২৮] স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন সউদের প্রমুখাৎ সম্পদ গ্রহণ করার এবং পুনরায় তা ফিরিয়ে দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে উক্ত ঘটনা সত্য হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং মনে হয় যে, ইবনে বিশ্‌র তার উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করেননি।

এ সফরে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। তা এই যে, সিরিয়ার কাফেলাকে বাদ্যযন্ত্র পরিহার করা প্রভৃতি শর্ত লঙ্ঘন করার জন্য মদীনার পথ হতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।[১২৯] সউদ তুর্কী সৈন্যগণকে মক্কা ত্যাগে বাধ্য করেন এবং গালেব সউদের হাতে বায়আৎ গ্রহণ করেন।[১৩০] এ হজ্জে সউদের সাথে আমীর উমারা এবং সাধারণ লোকের এক বিরাট সামাবেশ ঘটেছিল।

হজ্জ ও সংস্কার

১২২১ হিজরীতে তৃতীয় হজ্জ সমাধা করার পর ১২২৭ হিজরী পর্যন্ত সউদ প্রতি বৎসরই হজ্জ সম্পন্ন করেন এবং হজ্জের ও জনসমাবেশের এ সময়ে তিনি তাবলীগী দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি করেননি। প্রতি বৎসরেই তিনি বিভিন্ন নির্দেশ জারি করেন। মিশর ও সিরিয়ার গিলাফের মিছিল বন্ধ করে দেয়ার এবং কাফেলার সাথে বাদ্য-বাদকতা সপূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।[১৩১]

মক্কা মুকাররমায় আমর বিন মা'রুফ এবং নহী আনিল মুনকারের প্রাদুর্ভাব ঘটল। বাজারে এখন ধুমপানকারী দেখা যাইত না। বাদশাহ্ সউদ বিশেষভাবে নামায প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে "আস্‌সালাত" "আস্‌সালাত", বলে ধ্বনি করা হত।[১৩২]

---

[১২৮] আজাইবুল আসার (৪) ২৯৯ পৃষ্ঠা।
[১২৯] খুলাসাতুল কালাম-২৯৪ পৃষ্ঠা।
[১৩০] উনওয়ান (১) ১৩৮ পৃষ্ঠা।
[১৩১] খুলাসাতুল কালাম-২৯৪ পৃষ্ঠা।
[১৩২] ১২২৩ হিজরী/ ১৮০৯ ইং; উনওয়ান (১) ১৪১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

১২২৫ হিজরীতে স্বয়ং ইবনে বিশর হজ্জ সমাধা করেন। তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন) আমিও এ বৎসর হজ্জ সমাধা করি। আমি আমীর সউদকে ইহরাম অবস্থায় একটি বাহনে (উষ্ট্রে) আরোহিত অবস্থায় দেখেছি। তিনি এ বাহনের পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ খুৎবা (ভাষণ) দান করেন, যাতে তিনি লোকদের নসীহত করেন। হজ্জের বিভিন্ন মাসায়েল শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লার বরকতগুলো যথাঃ একতা, শান্তি, সম্পদের সমৃদ্ধি হওয়া এবং দাম্ভিকের অনুগত হওয়া প্রভৃতি স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, দুর্বল হতে দুর্বলতর ব্যক্তিকেও পরম শক্তিশালী ব্যক্তির নিকট হতে তার দাবী আদায় করে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। বাহন-পৃষ্ঠ হতে তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে, মক্কা শরীফে কেউ যেন কোন অস্ত্র উত্তোলন না করে, কোন স্ত্রীলোক উত্তম বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে যেন বহির্গত না হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ হুকুম অমান্যকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তি প্রদানের কথাও উল্লেখ করেন। বাজারের লোকদেরকে নামাযের জন্য উৎসাহিত করার নিমিত্ত লোক নিয়োগ করলেন। এখন নামাযের সময় আপনারা কাকেও বিমুখ দেখতে পাবেন না। অধিকন্তু এ সময় বাজারে তামাক অথবা অনুরূপ মাদকদ্রব্য প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার করার সাহস কেউ করতে পারেনি।[১৩৩]

১২২৬ হিজরী (১৮১২ খ্রীঃ) সম্পর্কে ইবনে বিশর লিখেছেন যে, মক্কা মুকাররমায় এখন কোন শরীয়ত বিগর্হিত কার্য [ধুমপান, নামায ত্যাগ করা এবং আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারও শপথ গ্রহণ প্রভৃতি] পরিলক্ষিত হয় না।

ঐতিহাসিক আবদুর রহমান বিন হাসান জবরতী মিশ্‌রী সউদ বিন আবদুল আযীযের সংস্কারসমূহ সর্বাপেক্ষা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

তিনি মোহাররম ১২২১ হিজরীর ঘটনাবলীতে শরীফ গালেব এবং আমীর সউদের আপোষ মীমাংসার উল্লেখ করে লিখেছেন-

অন্যায়াচরণের প্রাদুর্ভাব তিনি (সউদ) সমূলে উৎপাটিত করলেন এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যে ধুমপান করা রহিত করলেন।

জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করার এবং যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিলেন, রেশমী কাপড় ব্যবহার (পুরুষদের জন্য) নিষিদ্ধ করলেন। অবৈধ কর ও শুল্ক আদায় বন্ধ করতঃ সাধারণ অন্যায় আচরণও রহিত করা হল।

---

[১৩৩] উনওয়ানুল মাজদ (১) ১৮১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

বস্তুতঃ মক্কার প্রাক্তন শাসন কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে সীমা লঙ্ঘন করে চলেছিলেন। অধিবাসীদের নিকট হতে তারা প্রতি লাশের উপর পাঁচ অথবা দশ ফ্রাঙ্ক (মুদ্রা) কর আদায় করছিলেন। যদি কোন মৃতের অভিভাবক সেই কর আদায় করতে অক্ষমতা প্রকাশ করত, তবে তাদেরকে লাশ দাফন করার অনুমতি দেয়া হত না। এ ছাড়াও অসংখ্য বিদআৎ ও নূতন কর আদায়ের ব্যবস্থা তারা করেছিলেন। বাজারের ক্রয় বিক্রয় এবং দোকানের উপরও কর ধার্য করা হয়েছিল। অনেক সময় এরূপও হত যে, একজন লোক শান্তিতে তার ভাড়াটিয়া গৃহে বসে আছে, হঠাৎ তাকে গৃহ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া হত। সরকারী কর্মচারীরা বলত, মালিকের ঘরের প্রয়োজন, তুমি ঘর খালি করে দাও এবং কিছু (সালামী) দিয়ে আপোষ কর ইত্যাদি.....। শরীফ এ সমস্ত অনাচার বন্ধ করার এবং কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাওহীদ ও সুন্নাতের অনুসরণ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন এবং লোকেরা পরবর্তী সময়ে যে সব ব্যাপারের উদ্ভব ঘটিয়েছিল যথা গায়রুল্লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, কবরের উপর কুব্বা নির্মাণ, মূর্তি ও প্রদর্শনীর প্রাদুর্ভাব, চৌকাঠ চুম্বন করা, গায়রুল্লার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ, ফলকথা সর্বপ্রকার বিদআৎ হতে বিরত থাকার জন্য শরীফ কঠোরভাবে ওয়াদা করলেন, যাতে সৃষ্টজীবকে কোন না কোনভাবে আল্লার সাথে অংশিদার করা হয়ে থাকে, তা হতে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করলেন। এ সমস্ত সংস্কারের পর রাস্তা ঘাট নিরাপদ হয়ে গেল, মক্কা মদীনা এবং জিদ্দার পথ খুলে গেল।[১৩৪]

ঐতিহাসিক বার্কহার্টও নামাযের জন্য কঠোরতা অবলম্বন এবং শাস্তি প্রদানের বিষয় উল্লেখ করেছেন।[১৩৫]

কতিপয় সংগ্রাম ও বিজয়

হেজায বিজয়ের পর সউদের সৈন্য বাহিনীর তৎপরতা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বরং ১২১৩ হিজরীতে (১৮০৮ খ্রীঃ) তারা নজফ আক্রমণ করে। কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি।[১৩৬] পথিমধ্যে সামাওয়াহ্ এবং জোবায়র নামক স্থানেও আক্রমণ করা হয়।

---

[১৩৪] আজায়েবুল আসার (৪) ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা।

[১৩৫] উনওয়ান (১) ১৪৮ ও ১৪৯ পৃষ্ঠা।

[১৩৬] উনওয়ান (১) ৩৫ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

১২২৫ হিজরীর রবিউল আখের মাসে আমীর সউদ সিরিয়ার দিকে গমণ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালিয়ে যথেষ্ট সম্পদ নিয়ে সফলতার সাথে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৩৭] ইবনে বিশরের বর্ণনা অনুসারে এ আক্রমণের ফলে সিরিয়াবাসীর অন্তরে সউদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

বসরা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বারংবার আক্রমণ চালান হয়। কিন্তু তাতে কোন স্থায়ী ফল হয়নি।

১২২৪ হিজরীতে রা'সূল খীমা

উপরোল্লিখিত যুদ্ধ ছাড়াও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে একটি ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। পারস্য উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দারা সাধারণতঃ জওয়াজিম গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিল। তারা দীর্ঘদিন হতে ব্যবসায়ী জাহাজগুলো আক্রমণও করত এবং তাতে সফলও হত। এখন কয়েক বৎসর হতে আম্মান ও পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় সউদের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল এবং এ নৌবাহিনীও (Pirates) সউদের অধীনস্থ ছিল। উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে এ সামুদ্রিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ইংরেজরা যথেষ্ট চেষ্টা করে। অবশেষে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের (রমযান ১২২৪ হিঃ) সেপ্টেম্বরে বোম্বাই সরকার তাঁদের কেন্দ্র রা'সূল খীমার উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায় এবং নৌবাহিনীকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।[১৩৮] ১২ নভেম্বরে ১৮০৯ খ্রীঃ (শাওয়াল ১২২৪ হিঃ) পর্যন্ত রা'সূল খীমা ভস্ত ীভূত হয়ে গিয়েছিল।। সুতরাং নৌবাহিনীকে তাদের কেন্দ্র পরিবর্তন করতেই হয়েছিল। যদিও এ পরাজয়ে নজদবাদীর স্থানীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আম্মানের অভ্যন্তরে তাদের সেনাবাহিনীর তৎপরতা চালু ছিল তবুও জুয়ায়মিরের ভাষায় "মিসরীয়দের আক্রমণের পর্বে নজদীদের উপর যে প্রচন্ড আঘাত লেগেছিল তা এ ইংরেজদের দ্বারাই লেগেছিল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হতে একটি রা'সূল খীমার নৌ-অধিবাসীদের (Pirates Inhabitants) বিরুদ্ধে পৌঁছেছিল। কেন্দ্রের উপর বোমা বর্ষণ করে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়া হয়।[১৩৯] ব্রাইজ (Bryege)[140]

---

[১৩৭] উনওয়ান (১) ১৪৮ ও ১৪৯ পৃষ্ঠা।

[১৩৮] উনওয়ান (১) ১৪৬ পৃষ্ঠা; ফেলবী, ৯২ পৃষ্ঠা।

[১৩৯] Arabia The cradle of Islam.

http://www.shottanneshi.com

ওয়াহ্হাবীদের সীমালঙ্ঘন, রা'সূলখীমা অতিক্রম এবং তাদের শাস্তি বিধানের ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি কর্নেল স্মিথের এ উক্তিরও উল্লেখ করেছেন যে, ওয়াহ্হাবী শক্তির প্রতি এটাই ছিল প্রথম নৈতিক আঘাত।

মিসরীয় আক্রমণঃ (১২২৬ হিঃ ১৮১১ খ্রীঃ)

১২২৬ হিজরীর (১৮১১ খ্রীঃ) শেষের দিকে নজদী হুকুমতের উপর মিসরীয় আক্রমণ আরম্ভ হয়। এ সময় নজদী হুকুমত উত্তরে হলব হতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ইরাক হতে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সময় পর্যন্ত রা'সুল খীমার পরাজয় ছাড়া এ উদীয়মান হুকুমাতকে কোন উল্লেখযোগ্য কঠোর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি।

নজদী প্রভাব ও নজদী হুকুমতের শক্তি বৃদ্ধির খবর তুর্কী আস্তানায় পৌঁছেছিল। বাগদাদ, দামেশ্‌ক এবং জিদ্দার শাসনকর্তা তাদের মোকাবেলায় অসমর্থ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে (তুর্কী) বাবে আলী (উর্দ্ধতন মহল) কর্ত্তৃক মোহাম্মদ আলী পাশা খাদীবে মিসর নজদীকে নজদীদের পরাস্ত করার নির্দেশ দেয়া হল।[১৪১]

কথিত আছে যে, এ শর্তেই তাকে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মিসরের পাশা নিয়োজিত করা হয়েছিল। "সাপও মারবে লাঠিও ভাঙ্গবে না" প্রবাদটি বোধ হয় এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে। খাদীবে- মিসর মোহাম্মদ আলীর[১৪২] ক্রামশিক শক্তি বৃদ্ধি বাবে আলীর (উর্দ্ধতন মহলের) জন্য একটি স্থায়ী বিপদে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং সউদ ও খাদিবে মিসরের সংঘর্ষ আস্ত ানার অধিপতিদের পক্ষে সর্বাবস্থায় অলাভজনক ছিল না।

মোহাম্মাদ আলীর পুত্র ত্বোসুন (মৃঃ হিঃ-১৮১৬ খ্রীঃ) দশ হাজার সৈন্য সহ উপকূলবর্তী এলাকায় অবতরণ করে এবং অতি সহজে হয়ানেম্বার

---

[১৪০] ব্রাইজ; ৩৫-৪৪; বার্কহার্ট, ২০, পৃষ্ঠা।

[১৪১] ১২২৬ হিজরী মোতাবেক ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে।

[১৪২] মোহাম্মদ আলী পাশা মিসরের বর্তমান রাজ পরিবারের পূর্ব পুরুষ ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি জার্মান বংশোদ্ভূত ছিলেন। তার স্থলাভিষিক্ত ইবরাহিম পাশার এ উক্তি খ্যাতি লাভ করেছিল যে, আরবী ভাষা এবং আরবী সংস্কৃতি আমাদেরকে আরবী বানিয়ে দিয়েছে। মোহাম্মদ আলীর জন্ম হয়েছিল ১১৮২ হিঃ ১৭৬৮ খ্রীঃ এবং মৃত্যু ১২৬৫ হিঃ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।

http://www.shottanneshi.com

বন্দরটি দখল করে লয়।[১৪৩] অতঃপর সে মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে জদীদার নিকটবর্তী সংকীর্ণ রাস্তায় সউদ তনয় আবদুল্লাহ ও ফয়সাল দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবেলা করে তাকে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধে প্রায় ১২শত মিসরী নিহত হয়।[১৪৪] ত্বোসুন ইয়াম্বুর দিকে পশ্চাদাপসরণে বাধ্য হয়।[১৪৫] ত্বোসুন কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর পুনরায় মদীনায় দিকে অগ্রসর হয় এবং দু'মাস অবরোধের পর মদীনাও মিসরীয়দের অধিকারভুক্ত হয়ে যায়।[১৪৬] ত্বোসুন ত্বরিত জিদ্দায় পৌঁছলে হেজাযের নজদী সেনাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ বিন সউদ মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং মিসরী সৈন্যরা অতি সহজে মক্কাও অধিকার করে লয়।[১৪৭] কিছুদিন পর তায়েফও তাদের অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। আহমদ দ্বাহলান লিখেছেন, এ বিজয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তারা পাঁচদিন পর্য্যন্ত উৎসব পালন করে। অতঃপর তাফেফের নিকটবর্তী তোরবা নগরের নিকট উভয় দলের সংঘর্ষ ঘটে এবং মিসরীয়রা পরাজয় বরণ করে।[১৪৮] তোরবার ঘটনার পর সউদের গভর্নর উসমান মুষায়েফী উৎসাহিত হয়ে তায়েফের দিকে অগ্রসর হলেন কিন্তু এবার তিনি পরাজিত হলেন। তাঁর বহু লোক হতাহত হয় এবং পরিশেষে তিনি নিজেও গ্রেফতার হয়ে যান।[১৪৯] গালেব তাঁকে মোহাম্মদ আলী পাশার নিকট মিসরে পাঠিয়ে দিলেন। মোহাম্মদ আলী হেজাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। তার অনুপস্থিতিতেই

---

[১৪৩] ১৮১১ খ্রীঃ ১২২৬ হিজরী।

[১৪৪] বার্কহার্টঃ ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

[১৪৫] ১২২৬ হিঃ জিকা'দা মাসের শেষের দিকে, মোতাবেক ডিসেম্বর ১৮১১ খ্রীঃ মারুতমান মিসরীয়দের পরাজয়ের তারিখ ৭ই নভেম্বর ১৮১১) দিয়াছেন। বার্কহার্ট ২২৯ পৃঃ) এবং ব্রাইজ (৫১ পৃঃ) এ অগ্রসর হওয়ার তারিখ ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী লিখেছেন।

[১৪৬] জীকা'দা ১২১০ হিঃ/ নভেম্বর ১৮১২ খ্রীঃ উনওয়ান (১) ১৫৮ পৃঃ; ফেলবী ৯৪ পৃঃ।

[১৪৭] মোহররম ১২২৮ হিঃ/জানুয়ারী ১৮১৩ খ্রীঃ উনওয়ান ১৬৩ পৃঃ।

[১৪৮] শা'বান ১২২৮ হিঃ, আগষ্ট ১৮১৩ খ্রীঃ উনওয়ান ১৬১ পৃঃ।

[১৪৯] ১০ই রমযান ১২২৮ হিঃ/৬ই আগষ্ট ১৮১৩ খ্রীঃ উনওয়ান ১৬২ পৃঃ ফেলবী (৯৬ পৃঃ) ওসমান মোযায়েফীর গ্রেফতারী ও হত্যার ঘটনাকে পরে উল্লেখ করেছেন। আহমদ দাহলান (২৯৬) ও ইবনে বিশ্‌র (১৬২) উভয়েই এ ঘটনাকে মোহাম্মদ আলী পাশার হেজায আগমনের পর্বে উল্লেখ করেছেন। বার্কহার্ট (২৪৬) ও ব্রাইজের (৬১) বিবরণ এই যে, ওসমান মোযায়েফীকে গ্রেফতার করার জন্য পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। তারা উভয়ে গ্রেফতারীর তারিখ ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর বলে উল্লেখ করেছেন বসল যুদ্ধের পর যার উল্লেখ পরে আসছে।

http://www.shottanneshi.com

ওসমান মোযায়েফীকে খচ্চরের উপর আরাহণ করিয়ে সমগ্র কায়রো শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়। অতঃপর তাকে রাজধানীর আস্তানায় প্রেরণ করা হয় সেখানে তার মৃত্যু তার অপেক্ষায় ছিল।[১৫০] আহমদ দাহ্লানের ন্যায় ওসমান মোযায়েফীর চরম শত্রুও[১৫১] তার নৃশংস হত্যাকান্ডে আক্ষেপ করে লিখেছেন-

ওসমান মোযায়েফী যখন মিশরে উপস্থিত হলেন তখন মোহাম্মদ আলী পাশার সহকর্মীরা তার আলোচনা ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। বস্তুতঃ তাঁর গাম্ভীর্য্য ও মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে গভীর দাগ কাটে। প্রকৃতপক্ষে তার চেহারায় শরাফত ও ভদ্রতার চিহ্ন বিকশিত ছিল। এমনকি এরূপ একজন ভদ্র লোককে রাজধানী প্রেরণে বহুলোক আক্ষেপ করতে লাগলেন। তারা উত্তররূপেই বুঝিতে পেরেছিলেন যে, রাজধানীতে পৌঁছলে তাঁর বেঁচে থাকা আদৌ সম্ভবপর নয়।[১৫২]

যুদ্ধ ও বিজয়ের গতি দেখে মোহাম্মদ আলী বিচলিত হয়ে স্বয়ং হেজাযের দিকে রওয়ানা হলেন এবং শাওয়ালের শেষের দিকে[১৫৩] জিদ্দায় উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথমে শরীফ গালেবকে অপসারিত করলেন[১৫৪] এবং তাকে গ্রেফতার করে মিশরে এবং সেখান হতে শ্লোনিকা পাঠিয়ে দেয়া হল এবং দু' বৎসর পর তথায় তিনি ইন্তেকাল করলেন।[১৫৫] গালেবের ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াহ্ইয়া বিন সরওয়ারকে নামকাওয়াস্তে আমীর নিযুক্ত করা হল এবং যাবতীয় কর্তৃত্ব হেজাযের নবনিযুক্ত গভর্ণর আহ্মদ পাশার উপর ন্যস্ত হল। হেজাযকে ওয়াহ্হাবীদের অধিকার হতে বাহির করে মিসরের একটি উপনিবেশে পরিণত করা হল।[১৫৬]

---

[১৫০] ১২২৮ হিজরীর শেষের দিকে (ডিসেম্বর ১৮১৩ খ্রী)

[১৫১] খুলাসাতুল কালাম, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

[১৫২] খুলাসাতুল কালাম, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

[১৫৩] ১৪ই শাওয়াল ১২২৮ হিঃ/১০ই অক্টোবর ১৮১৩ খ্রীঃ খুলাসাতুল কালাম, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

[১৫৪] ফেলবী জিদ্দা আগমনের তারিখ ২৮ শে আগষ্ট ১৮১৩, লিখেছেন। অনুরূপভাবে মারুতমানও আগষ্টের শেষের দিকে লিখেছেন।

[১৫৫] রমযানের শেষের দিকে ১২৩১ হিঃ জুলাই ১৮১৬ খৃঃ উনওয়ান, ১৮৫ পৃঃ আররেহ্লাতুল হেজকাযীয়াহ্ ৮৯ পৃঃ; বার্ক হার্ট; ২৬২ পৃঃ।

[১৫৬] হেজায অতঃপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত মিসরের অধীনে থাকে।এই সময়েই মোহাম্মদ আলী ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মোহাম্মদ আলীর পুত্র সিরিয়াও দখল করে নেয়। অতঃপর সুলতান আবদুল মজীদ যখন

http://www.shottanneshi.com

এই কর্তৃত্বের জন্য শরীফ গালেব কত কিছুই না করেছিলেন। যে কোন ওয়াহ্হাবীদের সাথে সে চাতুরী করত, তাঁদের আকীদাসমূহের জোর সমর্থন করত, কোন সময় কুব্বা ধ্বংস করতে নির্দেশ দিত আর কোন সময় মোয়ায্যিনদেরকে (আযানের পর) সালাম বলতে নিষেধ করত।[১৫৭]

এ সমস্ত সে এ জন্যই করত যাতে সউদ তাকে অপসারিত না করেন।[১৫৮] সউদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, তিনি গালেবের কর্তৃত্ব কায়েম রেখেছিলেন। পক্ষান্তরে মোহাম্মদ আলী ছিলেন নিছক দুনিয়াদার। তিনি হেজাযে উপনীত হয়েই গালেবের কর্তৃত্ব খতম করে দিলেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সর্বাগ্রে তাকেই শেষ করলেন। মোহাম্মদ আলী যে প্রতারণার সাহায্যে গালেবকে গ্রেফতার করলেন তার বিস্তারিত বিবরণ খুলাসাতুল কালামে পাঠ করুন।[১৫৯] মিঃ ব্রাইজও [১৬০] এর বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন যা খুলাসাতুল কালামের অনুরূপ। গালেব এবং মোহাম্মদ আলীর পারস্পরিক বিরোধের উপরও তিনি আলোকপাত করেছেন।[১৬১] গালেব ও মোহাম্মদ আলীর উল্লেখ করে তিনি অন্যত্র লিখেছেনঃ-

মোহাম্মদ আলী এবং গালেবের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর ধূর্ত (So accomplished in deceit) ব্যক্তিদের পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার আশা করাই সম্ভবপর ছিল না।[১৬২]

মিঃ বার্কহার্টও মোহাম্মদ আলী পাশার অসাধু উদ্দেশ্য এবং ধূর্তামির বারংবার অভিযোগ করেছেন।[১৬৩] কিন্তু গালেবের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। গালেব যখন গ্রেফতার হয়ে মিসরে পৌঁছলেন তখন বার্কহার্ট সেখানেই উপস্থিত ছিলেন এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিবরণও লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৬৪]

১২৫৫ হিজরীতে রাজতখ্তে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন হেজায সরাসরি (তুরস্কের) কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে আসল। -খুলাসাতুল কালাম।

[১৫৭] আর রেহালাতুল হেজাযীয়াহ, ৮৯ পৃষ্ঠা।

[১৫৮] খুলাসাতুল কালাম ২৯৪ পৃষ্ঠা।

[১৫৯] প্রতারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, মোহাম্মদ আলী নিমন্ত্রণের মাধ্যমে তাকে গভর্নর হাউজে ডাকলেন। তার লোক আত্মগোপন করেছিল। বেচারাকে একা অসহায় অবস্থায় পেয়ে তারা গ্রেফতার করে নেয় এবং অলস হেজাযবাসী মাথায় হাত মেরে বসে থাকে।

[১৬০] ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা।

[১৬১] ৬১-৬৯ পৃষ্ঠা।

[১৬২] ৪৭ পৃষ্ঠা।

[১৬৩] ২৪২ পৃষ্ঠা।

[১৬৪] ২৫৯-২৬২ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

মোহাম্মদ আলী ও মিসরীয়দের অবস্থা তখনও সন্তোষজনক ছিল না। হেজায, আসীর এবং ইয়ামানের উপকূলীয় অঞ্চল অতি সহজে তারা অধিকার করে নিয়েছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে তখনও নজদীদের প্রভাব ছিল। সুতরাং মোস্তফা বে কে তাঁদের প্রতিরোধের জন্য প্রেরণ করা হল। তরবাহ্ নামক স্থানে উভয়দলের মধ্যে সংঘর্ষ বধিল এবং মিসরীয়রা পরাজিত হল।[১৬৫] অতি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, নজদীদের এ সংগ্রামে গালীয়া নাম্নী জনৈকা বিদুষী বীর নারী নেতৃত্ব করেছিলেন।[১৬৬] মিঃ বার্কহার্ট এ বীর মহিলার উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন।

মুহাররম ১২২৯ হিজরীতে (জানুয়ারী ১৮১৪ খ্রী) সমুদ্রযোগে মিসরীয় সাহায্য পৌঁছে যায় এবং কূলকোযার নিকট উভয় দলে পুনরায় ভীষণ সংঘর্ষ ঘটে এবং মিসরীয়রা পরাজিত হয়।[১৬৭]

সউদের ইন্তেকাল (১২২৯ হিঃ ১৮১৪ খ্রীঃ)

নজদী ও মিসরীয়দের সংঘর্ষ এখনও ভীষণ বিপর্যয় অতিক্রম করছিল এবং নজদীরা পুনরায় নব পর্যায়ে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, এমনি সময়ে স্বয়ং বাদশা সউদ নিজেই কাফেলাকে ত্যাগ করে দুনিয়া হতে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। আমীর সউদ বিন আবদুল আযীয বিন মুহাম্মদ বিন সউদ ১১ই জমাদিউল উলা ১২২৯ হিজরী ১ সোমবার রাত্রিতে (১লা মে ১৮১৪ খ্রীঃ) ইন্তেকাল করেন। ফলে মোহাম্মদ আলী পাশার যুদ্ধের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং নতুন নজদী সরকারের শ্রীবৃদ্ধির আশা হয়ে যায় সুদূর পরাহত।

সউদের চরিত্র মহিমা

উপরোক্ত যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে সউদ একজন অদ্বিতীয় নিষ্ঠাবান শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ১১৬০ অথবা ১১৬৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।[১৬৮]

---

[১৬৫] যিলহিজ্জার শেষে ১২২৮ হিঃ/ডিসেম্বর ১৮১৩ খ্রীঃ উনওয়ান ১৬৩-১৬৪ পৃষ্ঠা।
[১৬৬] বার্কহার্ট ২৬৮-১৬২ পৃষ্ঠা।
[১৬৭] উনওয়ান ১৬৪ পৃঃ।
[১৬৮] আলবদরুত্ তাহল' (১) ২৬৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

শায়খুল ইসলামের ন্যায় উস্তাদ ও মুরুব্বী পেয়ে তিনি ইল্ম ও আমলের বাস্তবরূপ ধারণ করেছেন। শায়খুল ইসলামের শিক্ষাগারে তিনি একাদিক্রমে কয়েক বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করে হাদীস এবং ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর বক্তৃতা ও লেখা উভয়ই প্রাঞ্জল ছিল।

যুদ্ধ চলাকালে সাধারণতঃ মাগরিবের নামাযের পর তিনি ওয়ায করতেন এবং লোকদের ধৈর্য্যধারণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিতেন। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবাগণের আদর্শ বর্ণনা করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধে অটল থাকার জন্য তিনি সৈন্যগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। যুদ্ধ সমূহে দুশ্মনের চরম হিংসা ও বিদ্বেষ সত্ত্বেও শিশু, স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধের প্রতি আঘাত করা হত না। গনীমতের মালে কোন পক্ষপাতিত্ব করা হতো না। যুদ্ধ সমাপ্ত হলেই তার পঞ্চমাংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হত। আবার সৈন্যদের মধ্যে পদাতিক ও অশ্বারোহীদের পার্থক্য রক্ষা করা হত অর্থাৎ পদাতিক সৈন্য আরোহীদের অর্ধেক অংশ লাভ করতেন। ফলকথা, যুদ্ধ গুলোতে সম্পূর্ণভাবে ইসলামী আইনসমূহ প্রতিপালনের চেষ্টা করা হত। এ হচ্ছে সউদের যুদ্ধকালীন অবস্থা। পক্ষান্তরে প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর কোন সাধারণ স্থানে সমবেত হতেন এবং তাদের মধ্যে উপবেশন করতেন আমীর সউদ এবং তাঁর বংশধরগণ। তাঁদের সঙ্গে থাকতেন শায়খুল ইসলামের বংশধরগণও। তাঁদের মধ্য হতে কোন যোগ্য ব্যক্তি সেখানে ওয়ায ও দরসের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রাতঃকালীন মজলিশে সাধারণতঃ আবদুল্লাহ বিন শায়খুল ইসলাম দরস দিতেন। তফসীর ইবনে জারীর এবং তফসীর ইবনে কসীরের দরস দেয়া হত। দরস হতে অবসর হলেই আমীর সউদ মহলে আসন গ্রহণ করতেন এবং সাধারণ লোকের ফরিয়াদ শ্রবণ করতেন। তাদের অভাব অভিযোগ বিদূরিত করার ব্যবস্থা করতেন। দুপুর বেলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর যোহরের নামায সমাপনান্তে মহলের অভ্যন্তরেই শিক্ষার মজলিম অনুষ্ঠিত হত। এ অনুষ্ঠানে শায়খুল ইসলামের বংশধর কেউই থাকতেন না। কারণ যোহরের পর তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাগার ছিল এবং তাঁরা তথায় অধ্যাপনার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সুতরাং মধ্যহ্নের এ মজলিশে আমীর সউদ নিজেই শিক্ষক হিসাবে তার জ্ঞান গরিমার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। সাধারণঃ ইবনে কাসীর এবং রিয়াজুস সালেছীন পাঠ

http://www.shottanneshi.com

করা হত এবং সউদ তার ব্যাখ্যা করতেন। এ অধ্যাপনা সমাপ্ত করে পুনরায় দুই ঘন্টা ব্যাপী সাধারণ লোকের বিচার আচারে মনোনিবেশ করতেন, তাদের আবেদন নিবেদন শ্রবণ করতেন এবং আসর পর্যন্ত তাদের অভাব অভিযোগ প্রতিকারে ব্যয় করতেন।

মাগরিবের নামাযান্তে আবার শাহী মহলে অনুষ্ঠান হত। এতে সকলেই সমবেত হতেন। আমীর তথায় উপস্থিত থাকতেন। শায়খ সোলায়মান বিন আবদুল্লাহ বিন শায়খুল ইসলাম (মাকতুল ১২৩৩ হিঃ) সহীহ্ বুখারী শরীফের দরস দিতেন। ঐতিহাসিক ইবনে বিশ্‌র স্বয়ং উক্ত মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শায়খ সোলায়মান বিন আবদুল্লার জ্ঞান গভীরতা ও সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির উচ্চতম প্রশংসা করেছেন। আমীর সউদের বিশাল জীবনের এ অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য উনওয়ানুল মাজ্‌দ ১ পাঠ করাই যথেষ্ট হবে।

মিঃ ব্রাইজ সউদের বিচক্ষণতা এবং রণকৌশলের উল্লেখ বিশেষভাবে করেছেন।[১৬৯]

মিঃ বার্কহার্ট[১৭০] তাঁর বিশেষ গুণরূপে এটাই উল্লেখ করে লিখেছেন যে, সউদ আক্রমণের সময় বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন। হাওয়ান (সিরিয়া) পৌঁছতে তাঁর ৩৫ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এ আক্রমণের খবর মাত্র দু'দিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

আবদুল আযীয বিন সউদ এবং বিশেষত সউদ বিন আবদুল আযীযের সময় দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার উল্লেখ করে বার্ক হার্ট লিখেছেন।[১৭১]

"সম্ভবতঃ পয়গাম্বরে আরবীর পরবর্তী সময়ে এই প্রথমবারই দেশে এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বেদুঈনেরাও নিজেদের মাল সম্পদ এবং চতুষ্পদ জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণ হতে চিন্তামুক্ত হয়ে শান্তিতে ঘুমাবার সুযোগ লাভ করেছিল।

অনুরূপভাবে তাঁর এরূপ প্রভাব জনসাধারণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, একজন সাধারণ হাবশী দাস এককভাবে যে কোন বৃহৎ গোত্রের সরদারকেও গ্রেফতার করে দরঈয়াতে নিয়ে আসত।[১৭২]

---

[১৬৯] ৮০ পৃষ্ঠা।
[১৭০] ১৭০ পৃষ্ঠা।
[১৭১] ১৩০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

আবদুল্লাহ বিন সউদ বিন আবদুল আযীয হিঃ ১২২৯-১২৩৩ পর্যন্ত ১৮১৪-১৮১৮ খ্রীঃ

সউদের ইন্তিকালের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বীরত্বে তিনি তাঁর পিতা অপেক্ষা কম ছিলেন না। কিন্তু সতর্কতা ও রাজনীতিতে তিনি অনেক পিছনে ছিলেন। নিজেকে বিপদে পরিবেষ্টিত দেখে তিনি সেই প্রতিপক্ষের সাথে আপোষের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যে শত্রু (মোহাম্মদ আলী) নজদকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করার শপথ গ্রহণ করেছিল সে কেন আপোষ করবে? আর পরে সে কোন কারণবশতঃ আপোষ করল বটে, কিন্তু অধিক সময় চুক্তিবদ্ধ থাকতে পারল না। আসুন, আমরা আবার যুদ্ধের ময়দানের দিকে ধাবিত হই। লোহিত সাগরের উপ-কূলবর্তী কুনফুজ নগর পূর্বেই তাদের অধিকারে এসে গিয়েছিল। এখন মুহাম্মদ আলী আবেদীন বেকের নেতৃত্বে একটি বিরাট সেনাবাহিনী জহরানের (ইয়ামন) দিকে প্রেরণ করল এবং পথিমধ্যে কুনফুজার নিকট মিসরীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার খবর পেয়ে নজদীরা তাদের উপর আক্রমণ করে কুনফুজাহ পুনরায় দখল করে নিল।[১৭৩] জহরানের (ইয়ামন) সংঘর্ষেও মিসরীয়রা পরাজিত হল।[১৭৪] এতে সউদের দ্বিতীয় পুত্র ফয়সলের সাহস বেড়ে গেল। তিনি তখনও তায়েফের নিকট অটল হয়ে রয়েছিলেন। তখন তায়েফ আক্রমণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। ত্বোসুন বিন মোহহাম্মদ আলীও বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এমনি সময়ে মুহাম্মদ আলী তার সাহায্যে এসে পৌঁছল এবং ফয়সল আবার পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলেন। তাফেফের নিকটবর্তী বসল নামক স্থানে কঠোর যুদ্ধ হয় এবং তাতে মিসরীয়দের বিজয় ঘটে।[১৭৫]

"এ যুদ্ধে পাঁচ হাজারের অধিক ওয়াহ্হাবী নিহত হয়। একটি মস্তকের মূল্য ছয় ডলার রাখা হয়েছিল। মুহাম্মদ আলীর সম্মুখে লাশের স্তুপ লেগে যায়।"

---

[১৭২] ঐ ১৩৯ পৃষ্ঠা।

[১৭৩] জমাদিউল ১২২৯ হিঃ, মে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ।

[১৭৪] শওয়াল ১২২৯ হিঃ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৮১৪ খ্রীঃ।

[১৭৫] ১২৩০ হিঃ প্রথমদিকে তার ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে।

http://www.shottanneshi.com

"এ যুদ্ধের পর ওয়াহ্হাবীদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা ভুল করল এই যে, পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে তারা খোলা ময়দানে বেরিয়ে হয়ে গিয়েছিল, অথচ সউদের অসীয়ত ছিল যে, মিসরীয় ও তুর্কীদের সাথে খোলা ময়দানে কখনও যেন যুদ্ধ করা না হয়।[১৭৬]

বসলের যুদ্ধের পর মোহাম্মদ আলী যে নির্যাতন ও জুলুম চালিয়েছিল তা অতি নিষ্ঠুর লোমহর্ষক ও মর্ম্ম বিদারক। প্রত্যক্ষদর্শী বার্কহার্ট সেই অত্যাচারের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। একটি অতি ক্ষুদ্রতম ঘটনা এই যে, ওয়াহ্হাবীদের লাশ কুকুরের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।[১৭৭] অতঃপর মুহাম্মদ আলী অগ্রসর তরবাহ্ও অধিকার করে নেয়।[১৭৮]

তরবাহ্ অধিকার করার পর পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোকে বশবর্তী করে তিনি আসীর পর্য্যন্ত পৌঁছেন এবং তথা হতে কুনফুজার পথে মক্কায় ফিরে আসেন। অতঃপর অনিবার্য্য কারণবশতঃ তাকে মিশর যেতে হয়।[১৭৯]

মুহাম্মদ আলী আসীরের যুদ্ধ শেষ করে তেহামাহ্ পৌঁছার পূর্বেই তার পুত্র মদীনায় বসে নজদ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে কসীম নগরের কতিপয় বিখ্যাত স্থান রস প্রভৃতি দখল করে লইল। কিন্তু এ সময়ে নজদী সৈন্যের প্রতিবন্ধকতায় মদীনার সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং তার পিতার কোন খবর সে অবগত হতে পারল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি তখন মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ান হয়ে গিয়েছিলেন। মুহাম্মদ আলী ১৫ই রজব ১২৩০ হিঃ (২৩শে জুন ১৮১৫ খ্রীঃ) মিসরে পৌঁছলেন এবং এদিকে আবদুল্লাহ বিন সউদ ত্বোসুন ও তার সৈন্যকে বেষ্টন করে ফেললেন। মিসরীয়রা দীর্ঘ দুই মাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ থেকে আপোষ করতে বাধ্য হল।

আপোষ ও প্রতারণা

উভয় দলে আপোষ-চুক্তি হয়ে গেল। ত্বোসুন ও আবদুল্লাহ উভয়ই যুদ্ধ বন্ধে রাযী হলেন। এতে আরও স্থিরীকৃত হল যে, তুর্কী তথা মিসরীয়গণ নজদও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে তাদের দখল প্রত্যাহার করবে। তুর্কী, সিরিয়া এবং মিসর হতে নজদে যাতায়াতকারীদের পক্ষে সমস্ত বাধাই

---

[১৭৬] বার্কহার্ট ৩১৭-৩১৮ পৃঃ

[১৭৭] ঐ ৩২৩ পৃঃ ব্রইজ ৯২ পৃঃ।

[১৭৮] খ্রীঃ লিখেছেন।)

[১৭৯] জবরতী (৪) ২২০ পৃষ্ঠা, বার্কহার্ট মোহাম্মদ আলীর কায়রো পৌঁছার তারিখ ২৫শে জুন ১৮১৫ খ্রীঃ লিখেছেন, ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

অপসারিত হবে এবং সকলের জন্য হজ্জ করার স্বাধীনতা থাকবে। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল ১লা শাবান ১২৩০ হিজরীতে (৯ই জুলাই ১৮১৫খ্রীঃ) মিসরীয়গণ বসরা হতে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। আবদুল্লাহ্ বিন সউদ আপোষপত্রসহ দু'জন বিশেষ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মাহমুদ ও কাযী আবদুল আযীয বিন হামদকে তাদের সাথে পাঠালেন যাতে তারা পৌঁছয়া মোহাম্মদ আলীর নিকট তা পেশ করেন। তারা উভয়েই সফলতার সাথে মিসর হতে ফিরে আসলেন এবং চুক্তিপত্র পূর্ণত্ব লাভ করল।[১৮০]

বলা হয়ে থাকে যে, এ আপোষ চুক্তি অনুসারে আবদুল্লাহ্ বিন সউদ সোলতানের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে তিনি রাজধানীতে হাজির হওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।[১৮১] ত্বোসুনও নজদী এলাকা খালি করার এবং নজদীগকে হজ্জের পূর্ণ স্বাধীনতা দানে ওয়াদাবদ্ধ হলেন।[১৮২]

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল এই যে, সেই সময় আবদুল্লার অবস্থা ভাল ছিল। সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল হতে তার নিকট সাহায্য আসছিল। যদি তিনি সময়ের নাজুকতা যথার্থভাবে অনুভব করতেন এবং ইচ্ছা করতেন, তবে সাময়িকভাবে হলেও তিনি মিসরীয়দের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের সমূলে উৎপাটিত করতে পরতেন। কিন্তু আপোষ করে তিনি সেই সুবর্ণ-সুযোগ হারিয়েছিলেন। ত্বোসুন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মদীনায় ফিরে গেলেন।[১৮৩]

ইবনে বিশ্‌র এবং ফেলবীর উপরোক্ত মন্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, ত্বোসুন এবং আবদুল্লার মধ্যেকার আপোষ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ইবনে বিশর এও লিখেছেন যে, আবদুল্লার দূত মিশর হতে সফলতার সাথে ফিরে এসেছিলেন।[১৮৪]

---

[১৮০] উনওয়ান, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

[১৮১] বার্কহার্ট, ইবনে বিশ্‌র ও জবরতীর ন্যায় বিশ্বস্ত ও সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ রাজধানীতে হাজির হওয়ার কথা মোটেই উল্লেখ করেননি অথচ বেস্নন্ট ও ফেলবী প্রমুখ বিশেষ গুরুত্বের সাথে তা উল্লেখ করেছেন।

[১৮২] ফেলবী ৯৭ পৃঃ , বেস্নন্ট (২) ২৫৮ পৃষ্ঠা।

[১৮৩] বার্কহার্ট, ৩৪৭ পৃঃ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষের দিকে।

[১৮৪] উনওয়ান, (১) ১৮৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

পক্ষান্তরে ফেলবী বলছেন, মোহাম্মদ আলী এ চুক্তি পছন্দ করলেন না এবং দরঈয়াকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করার হুম্‌কি দিয়ে আবদুল্লাহকে যথাশীঘ্র "আস্তানায়" হাজির হওয়ার হুকুম করলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ নিজেকে শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট হেয় করতে প্রস্তুত হলেন না বরং তিনি তাঁর রাজধানীকে মজবুত করতে এবং তার অনুগত গোত্রগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে লাগলেন।[১৮৫]

মিসরে আবদুল্লার দূত

ইবনে বিশ্‌র এবং ফেলবী ছাড়া জবরতী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকের বিবরণে জানা যায় যে, আপোষ চুক্তির পূর্ণত্ব সর্বোতঃভাবে মোহাম্মদ আলীর স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এ উদ্দেশ্যেই আবদুল্লাহ কর্তৃক দু'জন তাঁর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ এবং ত্বোসুনের সন্ধির পর দূতদ্বয় ১লা শাবান ১২৩০ হিজরীতে (৯ই জুলাই ১৮১৫ খ্রীঃ) মদীনার পথে মিসর রওয়ানা হলেন। শওয়ালের প্রথমদিকে তাঁরা মিসরে উপনীত হলেন[১৮৬] এবং পাশার খেদমতে হাজির হলেন।

"কিন্তু পাশা এ সন্ধিকে সুনজরে দেখলেন না। ফলে দূতদ্বয়ের সাথে সহানুভূতি এবং সম্মানও প্রদর্শন করলেন না বরং তাঁদের সাথে রুঢ় ব্যবহার করলেন।[১৮৭]

জবরতী আরও লিখেছেন, নজদী দূতগণ অতি বিনীতভাবে আলোচনা করেন। সউদ বিন আবদুল আযীযের কঠোরতা এবং আবদুল্লাহ বিন সউদের নম্রতার উল্লেখও করলেন। জবরতী নজদী দূতদ্বয়ের জ্ঞানগরিমা ও চরিত্র মাহাত্মের প্রশংসা করেছেন। ঐতিহাসিক বার্কহার্টও দূতগণের জ্ঞান ও মাহাত্মের প্রশংসা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁদের আলোচনায় মিসরীয় আলেমগণও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।[১৮৮]

সে সময়ের নজদীদের জ্ঞান ও চরিত্র মাহাত্মের অনুমান করার জন্য সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক জবরতীর এ মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন–

---

[১৮৫] ফেলবী, ৯৭ পৃষ্ঠা।
[১৮৬] জবরতী (৪) ২২৯ পৃষ্ঠা।
[১৮৭] ঐ।
[১৮৮] বার্কহার্ট ১১৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

দূতদ্বয় এমন সময়ে জামে' আজহারে পৌঁছলেন যখন কোন অধ্যাপক সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তারা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের অনুসারী এবং হাম্বলী ফিক্হের কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তাদেরকে বলা হল যে, মিসরে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। দূতদ্বয় তফসীর ও হাদীসের বিভিন্ন কিতাব (যথা খাজিন ও কাশশাফ, বাগবী, সেহাসেত্তা প্রভৃতি) ক্রয় করলেন। আমি (জবরতী) তাদের সাথে দু'বার সাক্ষাৎ করেছি। তাদের মধ্যে আমি প্রীতি, ভাষার লালিত্য, বিশাল দৃষ্টিভঙ্গি এবং অগাধ অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করেছি। তাদের নম্রতা, বিনয়ী স্বভাব, চরিত্র মাধুর্য্য বুদ্ধিমত্তা ফেক্হী মসলা মাসায়েলে দক্ষতার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। দূতদ্বয়ের একজনের নাম আবদুল্লাহ্, অপরজনের নাম আবদুল আযীয ছিল এবং শেষোক্ত ব্যক্তি সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।[১৮৯]

আবদুল্লাহ বিন সউদের দূতগণের অবস্থা এবং তাঁদের সাথে মুহাম্মদ আলী পাশার ব্যবহারের ঘটনা সম্পর্কে পাঠক একজন মিসরী ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য পাঠ করেছেন। বিস্তৃত বিবরণের এখানে স্থানাভাব। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, ঐতিহাসিকগণের মতানৈক্য[১৯০] অনুসারে বিভিন্ন[১৯১] কারণবশতঃ মুহাম্মদ আলী পাশা আপোষ চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তদীয় পুত্র ত্বোসুনকে–যে জুলকা'দা পর্যন্ত হেজাযে অবস্থান[১৯২] করেছিল- মিসরে ফিরিয়ে নিলেন। তিনি ১২৩০ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দিকেই মিসর পৌঁছে এক বৎসর পর ইন্তেকাল করলেন।[১৯৩] ইন্তেকালের পূর্বেই তাকে নেতৃত্ব হতেও অপসারিত করা হয়েছিল। মারুতমানের এরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক নয় যে, ত্বোসূনের ইন্তেকালের পরই (তার ভ্রাতা) ইবরাহীমকে এ সংগ্রামের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ইবরাহীমকে এ কাজে প্রেরণের সিদ্ধান্ত ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং উক্ত সালের আগষ্ট মাসে অর্থাৎ ত্বোসুনের ইন্তেকালের পূর্বেই তিনি কায়রোর দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন।[১৯৪]

---

[১৮৯] জবরতী ২২৯ পৃষ্ঠা।

[১৯০] দেখুন ইবনে বিশর (১) ১৮৫; মারুতমান, ফেলবী ৯৭ পৃঃ হাযিরুল আলামিল ইসলামী (৪) ১৬৬ পৃঃ।

[১৯১] খুলাসাতুল কালামঃ ৩৮ পৃষ্ঠা।

[১৯২] বেল্ট, (২) ২৫৮ পৃঃ।

[১৯৩] ৭ই যুলকা'দা ১২৩১ হিঃ, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮১৬ জবরতী (৪) ১৬৪ পৃষ্ঠা।

[১৯৪] বাকহার্ট. ০৪ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

ইবনে বিশরের বর্ণনানুসারে আবদুল্লাহ বিন সউদ পরবর্তী বৎসর ১২৩১ হিজরীতেও (১৮১৬) বিভিন্ন উপঢৌকনসহ দু'জন দুত মুহাম্মদ আলীর নিকট মিসরে পাঠালেন। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল হাসান বিন মযরুন ও অপরজন ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন আওন। এবার তারা বুঝতে পারলেন যে, মিসর অধিপতি তার ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। (وجدوه قد تغير) অথচ বাস্তবে মুহাম্মদ আলী চুক্তিপত্রের সমর্থন কোন সময়েই করেননি। কিন্তু পূর্ববর্তী দূতগণের নিকট তিনি স্পষ্ট জবাব দেননি। এতে ইবনে বিশর[১৯৫] এবং নজদবাসীরা আপোষের চূড়ান্ত হওয়ার এবং তাদের দুতদ্বয় সফলকাম হয়েছেন (ورجعو منه وانتظم الصلح) বলে ধারণা পোষণ করেছিলেন।[১৯৬] ইবনে বিশর আরও লিখেছেন যে, মুহাম্মদ আলী পাশা কতিপয় বেদুইনের কানকথায় প্রতারিত হয়ে চুক্তিভঙ্গ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের কতিপয় সমসাময়িক ঐতিহাসিকের মতামত উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আশা করি।

"এখন প্রশ্ন থাকছে এই যে, চুক্তির চূড়ান্ত হওয়া মুহাম্মদ আলীর মঞ্জুরী সাপেক্ষ রাখা হয়েছিল, না ত্বোসুন (যে সম্মানে Rank স্বীয় পিতার সমতুল্য ছিল) কর্তৃক তার চূড়ান্ত মীমাংসা (As a thing dong) করা হয়েছিল? ফলকথা, ব্যাপার যাই হোক না কেন, আপোষ করে সে তার ক্ষতিই করেছিল।"

মুহাম্মদ আলী কর্তৃক তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি সাময়িক যুদ্ধ (Armistice) বিরতিরূপে পেশ করা হয়েছিল।[১৯৭]

বার্কহার্ট এ আপোষ আলোচনায় আবদুল্লাহ বিন সউদের সরলতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। তাঁর চিঠিগুলো বার্কহার্ট নিজে দর্শন করেছেন। বার্কহার্ট ও ব্রাইজ উভয়ে এও বলেছেন যে, পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদ আলী আল হেসার অতি উর্বর শহর দাবী করেন এবং এর উপরই চুক্তিপত্রের স্বীকৃতি ন্যস্ত করেন।

---

[১৯৫] ইবনে বিশর (১) ১৮৫ পৃষ্ঠা।

[১৯৬] উনওয়ান, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

[১৯৭] বার্কহার্ট, ২৫২ পৃষ্ঠাঃ ব্রাইজঃ১০৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

Contents

ইব্রাহীম পাশা

ফলকথা প্রকৃত ঘটনা যাই হোক না কেন, আবদুল্লাহ্ বিন সউদ এবং ত্বোসুনের আপোষচুক্তি না পছন্দ করে মিসরের শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী পাশা নজদ অভিযানের জন্য তার দ্বিতীয় পুত্র ইবরাহীমকে[১৯৮] নির্বাচন করলেন। ত্বোসুনের প্রত্যাবর্তনের পর হতেই প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তবে ইবরাহীমের যাত্রা দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুলতবী ছিল। বস্তুতঃ সে একটি বিরাট বাহিনীসহ ৬ই জুলকা'দা ১২৩১ হিজরীতে (২১শে সেপ্টেম্বর ১৮১৬ খ্রী) মদীনার নিকটবর্তী বন্দর ইয়াম্বুতে পৌঁছল এবং সোজা মদীনার দিকে ধাবিত হল। অতঃপর হানাকিয়া নামক জলাশয়ের নিকট অবস্থান করল। আশপাশের বেদুঈন গোত্রগুলো তার অনুগত হতে লাগল। হরব, মুতাইয়ের, উতায়বা, এবং উনায়যাহ গোত্রের জনতা (বেদুঈন) দলে দলে তার পতাকাতলে সমবেত হয়ে গেল।[১৯৯] ইবরাহীম হানাকিয়া জলাশয়ের নিকট কয়েক মাস অবস্থান করে। ফলে পার্শ্ববর্তী বেদুঈন গোত্রের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে এবং তারা দলে দলে তার নিকট সমবেত হতে থাকে। আবদুল্লাহ এটা অনুভব করে তাকে বাধা দিতে অগ্রসর হলেন এবং মাদিয়াহ্ জলাশয়ের নিকট সংঘর্ষ বাধল, কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন সউদের সৈন্যবাহিনী মিশরী তোপের মোকাবেলা করতে অক্ষম হল।[২০০] সুতরাং আবদুল্লাহ কুসায়রের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। ইবরাহীম তার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং 'রস' নামক স্থানে এসে থেমে যায়। তিনমাস অবরুদ্ধ থাকার পর নগরবাসীরা তার নিকট নিরাপত্তা কামনা করে।[২০১] এ দীর্ঘ অবরোধ এবং পর পর সংঘর্ষে সাতশত মিসরী নিহত হল। কিন্তু নগরবাসীরা নিরাপত্তা কামনা করায় মিসরীয়দের রাস্তা সাফ হয়ে গেল এবং কোন শক্তিই তাদের গতিরোধ করার থাকল না।

---

[১৯৮] কথিত আছে যে, ইবরাহীম পাশা মোহাম্মদ আলীর ছেলে ছিল না বরং মোহাম্মদ আলী ইবরাহীমের মাতাকে বিবাহ করে তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। উনওয়ান (১) ১৮৮ পৃঃ ফেলবী ৯৮ পৃঃ হোগার্থ ১০১ পৃঃ।

[১৯৯] ১২৩১ হিজরীর শেষের দিকে, নভেম্বর ১৮১৬ খ্রীঃ।

[২০০] জমাদিউল আখেরাহ্ মধ্যম ভাগ ১২৩২ (মে ১৮১৭ খ্রীঃ)

[২০১] শা'বান ১২৩২ হিঃ ; জুলাই ১৮১৭ খ্রীঃ।

http://www.shottanneshi.com

Contents

সামান্য আক্রমণের পর তারা উনায়যাহ ও খবরা অধিকার করে নিল। বুরায়দাও অধিকার করতে তাদের বেগ পেতে হল না।[২০২] অবশ্য শাকরাতে নজদীরা তাদের সাথে কঠোর সংঘর্ষে লিপ্ত হল, কিন্তু মিসরীয় সৈন্যের ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের[২০৩] Vaissiere কৌশলের সামনে তারা কৃতকার্য্য হতে পারল না এবং শাকরাবাসীরাও অবশেষে নিরাপত্তা ভিক্ষা চেয়ে নিল।[২০৪] অতঃপর জর্মীর নিকটবর্তী স্থানে আরও একটি কঠোর সংঘর্ষ বাঁধে। নজদী এলাকার মধ্যে রাজধানী দরঈয়ার পর সর্বাপেক্ষা মজবুত শহর জর্মীই ছিল। এর পূর্বে রস ও শাকরার অধিবাসীরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু অবশেষে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, মিসরীয় সৈন্যেরা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা জর্মী জয় করেছিল। বাজারে এবং গৃহাভ্যন্তরে তথাকার অধিকাসীকে হত্যা করা হয়। তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়। মিঃ ((২) ২৬০ পৃঃ) বর্ণনানুসারে তুর্কী সৈন্যদের হাত হতে মহিলাদের ইজ্জত সম্ভ্রমও রক্ষা পায়নি। ১৭ই রবিউস্সানী ১২৩৩ হিজরীতে (২৪ শে ফ্রেব্রুয়ারী ১৮১৮ খ্রীঃ) মিসরীয়রা জর্মীতে প্রবেশ করে। বস্তুতঃ এটাই নজদী রাজত্বের পতনেরই ঘোষণা ছিল।

সউদ বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ অপর কতিপয় দরঈয়বাসীর সাথে শহরের একটি দূর্গে আটকা পড়েন।

অবশেষে তাদেরকেও নিরাপত্তা দান করা হল এবং তারাও দরঈয়ায় চলে গেলেন। তাদের সাথে শাকরার তিন সহস্রাধিক শিশু ও নারী ছিল। আমীর আবদুল্লাহ তাদেরকে দরঈয়াতে আশ্রয় দান করলেন।[২০৫]

---

[২০২] মোহররম ১২৩৩ হিঃ, নভেম্বর ১৮১৭ খ্রীঃ।

[২০৩] ইবরাহীমের সাথে সেই ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও ইতালীয় চারজন Scits, Genili, todeschini, Socio. নামীয় ডাক্তারও ছিলেন, (হোগার্থঃ ১০ পৃঃ) তন্মধ্যে Scits তাঁর বিশেষ চিকিৎসক ছিলেন। আসীর এবং ইয়ামনের যুদ্ধেও মিসরী বাহিনীতে কতিপয় ইউরোপীয় অফিসার ছিলেন, (হোগার্থ ১২৩-১২৭ পৃঃ) বার্কহার্ট ত্বোসুনের সৈন্যবাহিনীর জনৈক ইংরেজ অফিসারের বীরত্বের উল্লেখ করেছেন। ইনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইবরাহীম আগা নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন যে, স্বয়ং আবদুল্লাহও তাদের বীরত্বের প্রশংসার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

[২০৪] ১৪ ই রবিউল আউয়াল ১২৩৩ হিঃ, ২২শে জানুয়ারী ১৮১৮ খ্রীঃ ব্লেন্ট (২) ২৬০ পৃষ্ঠা।

[২০৫] উনওয়ান (১), ১৯৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

দরঈয়ার পতন

ইবরাহীম পাশা তখন দরঈয়ার সামনেই ছিল। সে ছয় মাস পর্যন্ত তা অবরোধ করে রাখল। প্রতিদিন উভয় দলে সংঘর্ষ হত এবং বিপুল সংখ্যক মিসরী সৈন্য নিহত হত, তাদের জন্য অহরহ নিত্যনূতন সাহায্য পৌঁছতে ছিল। পক্ষান্তরে, দরঈয়ার দিন দিন শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হতে ছিল (অথচ সাহায্য পাওয়ার কোন উপায়ও ছিল না)। আমীর আবদুল্লাহ বিন সউদ, তাঁর বংশীয়গণ এবং শায়খুল ইসলামের পুত্র পৌত্রগণ সকলেই বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু অবশেষে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল এবং নগরবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব করতে বাধ্য হলেন।[২০৬] আবদুল্লাহ বিন সউদ তখনও অস্ত্র সংবরণ করতে দ্বিধা করছিলেন। কিন্তু শহরের অভ্যন্তরে স্বীয় বংশীয় দূর্গে (তোরায়কে) অবরুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু দূর্গের দেয়াল অকেজো হয়ে পড়ায় প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং তিনি বাধ্য হয়ে ইবরাহীমের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। এটাই সর্বপ্রথম সউদী হুকুমতের আর ফেলবীর ভাষায় (First wahhabi Rmpire এর পতনের ঘোষণা ছিল যার প্রতিষ্ঠায় শায়খুল ইসলাম ও তাঁর সঙ্গীদের কঠোর পরিশ্রম ছিল।

আবদুল্লাহ বিন সউদের পরিণাম

আপোষের দু' দিন পরেই আবদুল্লাহ বিন সউদকে মিসরের দিকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হল। তার নিজস্ব লোকও তিন চারজন তার সাথে ছিলেন। হিজরী ১২৩৪ সনের মোহররম মাসের (নভেম্বর ১৮১৮) প্রথমদিকে তিনি মিসরে পৌঁছলেন। অতি হাস্যজনকভাবে তাদেরকে মিসরে প্রবেশ করানো হল। মিশরবাসীরা তাদেরকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল। ফলকথা একজন পরাজিত শাসনকর্তার সাথে যত প্রকার দুর্ব্যবহার করা যেতে পারে তাতে তারা কোন ত্রুটি করল না। মোহাম্মদ আলীর নিকট আবদুল্লাহ বিন সউদ হাজির হলেন। নিয়মতান্ত্রিক কিছু আলোচনাও হল এবং ১৯শে মোহাররম তাঁকে ইসকান্দারীয়া এবং সেখান থেকে আস্তানায় (রাজধানীতে) পাঠিয়ে দেয়া হল। বস্তুতঃ মৃত্যু

---

[২০৬] ৭ই জি'কাদা ১২৩৩ হিঃ ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮১৮ খ্রীঃ। উনওয়ান, (১) ২০৬ পৃঃ; মারুতমান দরঈয়া পতনের তারিখ ৬ই সেপ্টেম্ব ১৮১৮ খ্রীঃ লিখেছেন।

http://www.shottanneshi.com

তাঁর জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল। ১৭ই ডিসেম্বর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৮ই সফর ১২৩৪ হিঃ) আবদুল্লাহ বিন সউদ এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে আয়াসোফীয়ার আঙ্গিনায় ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন) উল্লেখযোগ্য যে, তাদেরকে রাজধানীতে জঘন্যভাবে পরিভ্রমণও করানো হয়েছিল। আবদুল্লাহ বিন সউদ বিন আবদুল আযীয পর্যন্ত নজদের আমীরগণের সেই সূত্র সমাপ্ত হয়ে যায় যারা স্বয়ং শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আবদুল আযীয বিন সউদ বিন আবদুল আযীয শায়খুল ইসলামের সরাসরি শিষ্য ছিলেন। তবে আবদুল্লাহ বিন সউদের বয়স অবশ্য শায়খুল ইসলামের ইন্তেকালের সময় (১২০৬ হিঃ) অতি অল্প থাকায় সম্ভবতঃ তিনি শায়খুল ইসলামের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু তিনি যে শায়খুল ইসলামের স্বর্ণযুগ সচক্ষে দেখে ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আবদুল্লাহ বিন সউদ শান্তির সাথে শাসনকার্য্য পরিচালনার সুযোগ মোটেই পাননি। তথাপি দরস, তবলীগ এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বিধানে স্বীয় পিতা ও পিতামহের পূর্ণ অনুসরণ করে গেছেন। এ সম্পর্কে কোন নূতন কথা উল্লেখ করার মত নেই।[২০৭]

অন্যান্য লোকের পরিণাম

দরঈয়ার ভিতরে ও বাইরে ক্রমান্বয়ে ছয়মাস পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ চলেছে। এর বিস্তারিত আলোচনার এখানে স্থানাভাব। প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক ইবনে বিশ্‌র এর বিস্তারিত বিবরণ এমন কি শহরের বিভিন্ন ঘাঁটি এবং অবস্থান স্থলেরও যথেষ্ট উল্লেখ করেছেন।[২০৮]

এই সর্বনাশা যুদ্ধে শুধু সউদ বংশের নেতৃস্থানীয় ২১জন বিশিষ্ট পুরুষ শহীদ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কতিপয়ের নাম এই ফয়সল বিন সউদ, ইব্‌রাহীম বিন সউদ ফাহ্‌দ বিন আবদুল্লাহ, ফাহ্‌দ বিন তুর্কী বিন আবদুল্লাহ্ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ, মোহাম্মদ হাসান বিন সউদ, ইব্‌রাহীম বিন হাসান বিন মুশারী, আবদুল্লাহ বিন হাসান মুশারী, আবদুর

---

[২০৭] উনওয়ান (১) ২০৯ পৃষ্ঠা।

[২০৮] উনওয়ানুল মাজদ (১) পৃষ্ঠা হতে ২০৮ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

রহমান বিন হাসান বিন মুশারী, আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম বিন হাসান বিন মুমারী, ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ্ বিন ফরহান, আবদুল্লাহ্ বিন নাসের বিন মুশারী, মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ, সউদ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ, মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ এবং শায়খুল ইসলামের স্ববংশীয় নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শহীদ হয়েছিলেনঃ সোলায়মান বিন আবদুল্লাহ বিন শায়খুল ইসলাম, আলী বিন আবদুল্লাহ বিন শায়খ ও মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন হাসান বিন শায়খুল ইসলাম। এদের মধ্যে সোলায়মানের লাশকে খন্ড বিখন্ড করে ফেলা হয়। কী সর্বনাশ প্রতিরোধ লিপসা।[২০৯]

আলে সউদ এবং আলে শায়খ ছাড়াও এ যুদ্ধে নিম্নোক্ত বিখ্যাত কতিপয় আলেমও শাহাদাৎ বরণ করেন। তাঁদের অধিকাংশকেই অতি নির্যাতীত ও নিম্নভাবে হত্যা করা হয়েছিল-

আলী বিন হাম্দ বিন রাশেদ উরায়নী, কাযী খরজ, সালেহ বিন রশিদ আলহারবী, আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন সোয়ায়লম, হাম্দ বিন ঈসা বিন সোয়ায়লম, মোহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বিন সদহান।[২১০]

অধিকন্তু এ শহীদগণ ছাড়াও কোন কোন বিখ্যাত যশস্বী আলেমের সাথে ইবরাহীম পাশা চরম দুর্ব্যবহার করে। কাযী আহমদ বিন রশিদ হাম্বলী মদীনার বিখ্যাত আলেম আমীর আবদুল্লাহর কাছে অবস্থান করেছিলেন। তাকে নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করা হয়, এমনকি তাঁর দাঁত তুলে ফেলা হয়। এই কাযী আহমদ বিন রশিদ যাঁর পূর্ণ নাম আহমদ বিন হাসান বিন রশিদ এহসার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ফিক্হে হাম্বলীর বিশিষ্ট ও বিখ্যাত আলিম ছিলেন। সাধারণতঃ তিনি আল্ হাম্বলী নামে খ্যাত ছিলেন। প্রথমে তিনি শায়খুল ইসলামের আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর সাহায্যকারী হয়ে পড়েন। মদীনাতুল রসূলের প্রতিবেশী হওয়া পছন্দ করে তিনি সেখানেই বাসস্থান গ্রহণ করেন। দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। (১২৪৯হিঃ)। আস সুহবুল ওয়াবেলাহ্ গ্রন্থে (৩৩-৩৫ পৃষ্ঠা।) তাঁর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু তাঁর দা'ওয়াত গ্রহণ সম্পর্কে আস্ সুহুবের লেখক বিস্ময়কর তাবিল করেছেন। এ সূত্র

---

[২০৯] উনওয়ান ১-২১০ পৃষ্ঠা।

[২১০] উনওয়ান (১) ২০৮ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

পরম্পরায় শায়খ আবদুল আযীয হাসীন নাছেরীর (মৃঃ ১২৩৭ হিঃ) ন্যায় বিখ্যাত প্রবীণ মর্য্যাদাশীল আলেমের সাথে দুর্ব্যবহারের ঘটনাও উল্লিখিত হয়েছে। শাকরা বিজয়ের সময় শায়খ আবদুল আযীয সেখানেই ছিলেন। ইবরাহীম পাশা তাকে ডেকে পাঠান। তিনি বার্দ্ধক্যের জন্য আসতে অসমর্থ ছিলেন। তাঁকে জোরপূর্বক ইবরাহীম পাশার দরবারে হাজির করা হয়। فجي به محمولا তিনি দরবারে নীত হলে মসনুন তরীকায় বলেন, সালামুন আলায়কা ইয়া ইবরাহীম। মিসরী পাশা অহঙ্কারে রুষ্ঠতা প্রকাশ করে বৃদ্ধ আলেমের সাথে কৌতুক করতে আরম্ভ করে। কিন্তু শায়খ তাকে উপদেশ দেন এবং ক্ষমা সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত তেলাওয়াত করেন। পাশা তিরস্কারের ভাষায় বলেন, যাও বৃদ্ধ আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।[২১১]

ইনি সেই শায়খ আবদুল আযীয যিনি শায়খল ইসলামের বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই দু'বার[২১২] প্রতিনিধি হিসাবে হেজাযে প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রথম অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (দেখুন প্রথম অধ্যায়)

মিসরীয়দের এ অত্যাচার হতে যে সমস্ত সৌভাগ্যবান বেঁচে ছিলেন তাদের মধ্যে তুর্কী বিন আবদুল্লার দ্বারা উত্তরকালে নজদী হুকুমতের পুনরুদ্ধার ঘটেছিল। সউদ বংশের কতিপয় লোক তখনও বেঁচেছিলেন। তারা পুনরায় যখন দরঈয়ায় পৌঁছলেন তখন মিসরীয় শাসনকর্তা তাদেরকে গ্রেফতার করে মিসরে পাঠিয়ে দেন।[২১৩] তারা ও অন্যান্যরা সকলেই সপরিবারে মিসরে প্রেরিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা প্রবাস জীবন যাপন করেন। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ সেখানেই ইন্তে কাল করেন এবং অধিকাংশ লোক অবস্থা অনুকূল হলে মিসর হতে নজদে প্রত্যাবর্তন করেন।[২১৪] এ প্রবাসী কাফেলা ১৮ই রজব ১২৩৪ হিঃ (১৩ ই মে ১৮১৯ সালে) মিসরে পৌঁছে। নর-নারী ও শিশুদের সংখ্যা ছিল ন্যূনাধিক চারিশত।[২১৫]

---

[২১১] উনওয়ান () ১৯ পৃষ্ঠা।

[২১২] ১১৮৫ হিঃ ও ১২০৪ হিজরীতে

[২১৩] ১২৩৬ হিজরী, খুলাসাতুল কালাম, ৩০৩ পৃষ্ঠা।

[২১৪] সেই প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে নজদের দুইজন বিখ্যাত আলেম শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান বিন শায়খুল ইসলাম এবং তার পুত্র শায়খ আবদুল লতীফ বিন আবদুর রহমান বিন হাসানও ছিলেন। পুস্তকের ১ম খন্ডে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে।

[২১৫] জবরতী (৪) ৩০৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

দরঈয়ার সর্বনাশ

দরঈয়া ১২৩৩ হিজরীর জুলকা'দা মাসের দিকে মিসরীয়দের অধিকারভূক্ত হলেও তার ধ্বংস সাধন কার্য্য এক বৎসর ধরে চলতে থাকে। ইবরাহীম পাশা নিজে প্রায় নয় মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। দৈনন্দিন নিত্য নির্দ্দেশ জারী করা হত এবং কঠোরভাবে তা কার্যকরী করা হত। দরঈয়াকে এরূপ বরবাদ করা হল যে, সউদ বংশের রাজধানী পুনরায় আর উত্থান করতে সক্ষম হল না।

১২৩৪ হিজরীর শা'বানে (জুন ১৮১৯খ্রীঃ) মোহাম্মদ আলী পাশার নির্দেশ পৌঁছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার যোগ্য পুত্র ইবরাহীম পাশা দরঈয়া বিনষ্ট করার নির্দেশ দেয়। ফলে মিসরীয় সৈন্যরা সমগ্র শহরের ভিত্তিই উৎপাটিত করে দেয়। সমগ্র বাগ-বাগিচার বৃক্ষ-লতা কাটিয়া ফেলা হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাদের শাস্তি হতে রেহাই পায়নি। গৃহে আগুন লাগাইয়া দেয়া হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত শহর ভস্মীভূত হয়ে যায়।[২১৬]

এটা মিসরীয়দের প্রতিশোধ উন্মাদনার জঘন্যতম প্রদর্শনী ছিল। শায়খের দা'ওয়াত আরম্ভ হওয়ার পর্বে এ দরঈয়া শহরটি একটি ক্ষুদ্র নগরী ছিল। শায়খের দা'ওয়াতের বদৌলতে তা কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করে এবং সউদ বংশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং প্রবল প্রেরণাদানে তা অল্পদিনের মধ্যেই একটি জনাকীর্ণ উন্নত শহরে পরিণত হয়ে যায়। ইবনে বিশ্‌র দরঈয়া শহরের অভাব শূণ্যতা, সৌন্দর্য্য এবং কেন্দ্রীয় মর্যাদার উচ্ছসিত প্রশংস করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর স্বচক্ষে দেখা বিবরণের গুরুত্ব অপরিসীম।[২১৭]

বৃটিশ সরকারের মোবারকবাদ এবং সাহায্যের প্রস্তাব

দরঈয়াকে ভস্মীভূত করার পর ইবরাহীম নজদের এলাকা হতে বিদায় হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমনি সময় বৃটিশ সরকারের ভারতীয় অফিসারদের মনে একটি বিস্ময়কর খেয়াল সৃষ্টি হয়। তারা ইবরাহীমকে মোবারবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জর্জ্জ ফরেষ্টর সেডলীয়রের (George Forester Sadlier) নেতৃত্বে এক বিশেষ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করল।

---

[২১৬] উনওয়ান মাজ্‌দ (১) ২১৩ পৃষ্ঠা।; তারিখে নজদ (আলুসী) ২৪-২৬ পৃষ্ঠা।

[২১৭] উনওয়ান (১) ২১৪ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

এই মোবারকবাদের পিছনে যে প্রেরণা ক্রিয়া করছিল তা অনুধাবনের জন্য নিম্নলিখিত তথ্যটি অবগত থাকা অপরিহার্য্য যে, (ইষ্ট ইন্ডিয়া) কোম্পানীর সরকার পারস্য উপকূলে প্রভাব ও শক্তি বিস্তারের জন্য দীর্ঘদিন হতে সচেষ্ট ছিল। নজদী সরকার উপকূলের দিকে অগ্রসর[২১৮] হলে তাদের সামুদ্রিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেল এবং ইংরেজদের বাণিজ্য জাহাজের ভীষণ ক্ষতি সাধিত হতে লাগল। এ সামুদ্রিক লুটতরাজ (piracy) নির্মূল করার জন্য তদানীন্তন বোম্বাই সরকার ১২২৪ হিজরীতে (১৮০৯ খ্রীঃ) কারসানের রাজধানী "রা'সূল খীমা" আক্রমণ করে এবং তাকে জ্বালিয়ে ভষ্মীভূত করে দেয়। পূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি।

এখন নজদীদের পরাজয় এবং মিসরীয়দের বিজয়ের খবর যখন কোম্পানীর শাসন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হল, তখন এ নব প্রতিষ্ঠিত সরকারের দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় কিনা এ আশঙ্কা তাদের মনে উঁকি মারতে লাগল। দরঈয়া অধিকার করার পর মিসরীয় সৈন্যদের দ্বারা কতিপয় ঘটনাও বাস্তবে ঘটেও গেল যাতে তাদের এ আশঙ্কা বদ্ধমূল হয়ে গেল। মিসরীয় সৈন্য দল পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় তৎপরতা দেখিয়েছিল এবং এতে তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোনরূপ সম্মানও রক্ষা করেনি। ফলে বৃটিশ অফিসারগণ নজদী দুশমনের পরাজয়ে মহা আনন্দিত হলেও মিসরীয়দের দ্বারা এরূপ দুর্ব্যবহারও আশা করেনি।[২১৯] সুতরাং ত্বড়িৎ গতিতে ক্যাপটেন জে, এফ, সেডলিয়রকে ইবরাহীম পাশার খেদমতে প্রেরণ করা হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে বৃটিশ অফিসারদের মধ্যে মিসরীয় শাসনকর্তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। অথচ পারস্য উপসাগর তো দূরের কথা, মিসরীয়রা নজদের উপরও চির অধিকার এবং স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করতেও ইচ্ছুক ছিল না। দরঈয়া বিজয়ের নেশায় হয়ত তারা পার্শ্ববর্তী এলাকায় কিছু সৈন্য পরিচালনা করেছিল কিন্তু সত্য কথা

---

[২১৮] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপকূলীয় এলাকায় নজদ প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ শাসকেরা নজদীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল। বসরার রেজিডেন্ট মেনেন্তী Manesy ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে Relnand কে এ বিশেষ উদ্দেশ্যেই দরিসুর প্রেরণ করেছেন এবং এ প্রচেষ্টায় সে যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেছিল। (হোগার্থ টীকাঃ ১০৪ পৃষ্ঠা।)

[২১৯] ফেলবীঃ ১০৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

এই যে, তারা স্থায়ী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সময়ই ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। এ কারণেই ইব্রাহীম পাশা দরঈয়াকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেই সমগ্র দেশকে চরম দুরবস্থায় ফেলে মিসরে চলে যায়।

যা হোক, এখন মিঃ সেডলিয়ারের মিশন সম্পর্কে জনৈক ওয়াকেফহালের ভাষায় কিঞ্চিৎ শ্রবণ করা আবশীকঃ-

..... মিসরীদের সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পরামর্শ না করেই বোম্বাই হতে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের (১২৩৪ হিঃ) গ্রীষ্মকালে একটি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ উপসাগরের দিকে প্রেরিত হয়। তাতে সরকারের সাতচল্লিশতম (Forty Seventh) রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন জি, এফ সেডলিয়রও বিশেষ দূত (Emissary) রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। এ রণতরী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল দরঈয়া বিজয়ের জন্য ইবরাহীমকে "মোবারকবাদ" দেয়া এবং পাশার (His excellency) সাথে ষড়যন্ত্র করে ওয়াহ্হাবী শক্তির সমূলে উৎখাতের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

এই অফিসারদের উপদেশ পত্রে এও লেখা ছিল যে, অবস্থা যাই হোক না কেন, যদি পাশা বৃটিশ সরকারের সাহায্যে উপকৃত হতে ইচ্ছা করেন, তবে যথাশীঘ্র একটি পূর্ণ এবং শক্তিশালী নৌবাহিনী প্রেরণ করা হবে এবং তুর্কীদেরকে রা'ছুল খীমার উপর অধিকার দান করা হবে।

"কিন্তু ইতিহাসে এরূপ নিষ্ফল গুপ্ত মিশনের অস্তিত্ব বিরল যা সেডলিয়রের মিশনের ভাগ্যে জুটিয়াছিল।

এ ঘটনার বিবরণ সুদীর্ঘ।[২২০] সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, সেডলিয়র আরবের উপকূলে এমন সময় অবতরণ করে যখন ইব্রাহীম ধ্বংস সাধনের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা করছিল। সংবাদদাতারা সেডলিয়রকে জানাল যে, কোন্ স্থানে যে ইবরাহীমের সাক্ষাৎ সম্ভব হতে পারে তাও বলার উপায় নেই। তিনি ২৮শে জুন (১৮১৯ খৃঃ) রওয়ানা হয়ে দরঈয়ার নিকট দিয়ে শাকরা পৌঁছলেন এবং সেখান হতে "রস" নামক স্থানে গেলেন, এখানে ইবরাহীমের সৈন্যের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটল, কিন্তু পাশা মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল বলে তার সাক্ষাৎ ঘটল না। ইব্রাহীম সেডলিয়রের আগমন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু তার সাক্ষাতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না যে, তার অপেক্ষায় বসে থাকবেন।

---

[২২০] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন হোগার্থের penetration of Arabia ১০৪-১১১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

অবশেষে ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে সেডলীয়র পাশার খিদমতে হাযির হল। পাশা তার সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা করল বটে, কিন্তু তার সাথে কোন ওয়াদা করল না। এভাবে বৃটিশ সরকারের এ দূত বিফল হয়ে ফিরে আসল। অবশ্য তিন মাসের এ দীর্ঘ সফরে এই দূত বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করল। সেইই সর্বপ্রথম ইউরোপীয়ান ছিল যে আরব উপদ্বীপের এক সমুদ্র হতে অপর সমুদ্র পর্যন্ত অতিক্রম করেছিল।

দরঈয়া শহরটি মিসরীয়দের হাতে এরূপ ধ্বংস হয়েছিল যে, পুনরায় তা আর সমৃদ্ধিশালী হওয়া সম্ভবপর হয়নি। এ ধ্বংস এরূপ মারাত্মক ছিল যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত নজদীদের পুরুত্থানের কোন আশাই ছিল না। ব্লান্টের ১ ন্যায় দূরদর্শী এবং আরবদের প্রকাশ্য হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাবিদ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় মত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, আরবে সউদি গোত্রের শক্তি ও কর্তৃত্ব গ্রহণ পুরাতন কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে। ((২) ২৬৮ পৃষ্ঠা)

ডাউটি (Daughty)[221] ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নজদবাসীদের সাধারণ মতামত উদ্ধৃত করেছেন যে, ওয়াহ্হাবী হুকুমত পুনরায় আর জীবিত হবে না, নজদের অধিবাসীদের সাধারণ মত এটাই ছিল।[২২২]

ইসলামের চরম শত্রু জোয়ারমিরও[২২৩] উনিশ শতকে এ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেনঃ

"চরম নিস্ফলতার সাথে এ আন্দোলনের (ওয়াহ্হাবী আন্দোলন) পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং রাজনীতি হিসাবে তা একটি চমকপ্রদ প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে।" তিনি অন্যত্র আরও বলেছেন, "আরব সউদি শক্তিকে এখন পুরাতন কাহিনী মনে করাই উচিত।"

---

[২২১] ঐ ৪২৫ পৃষ্ঠা।

[২২২] ১২ পৃষ্ঠা।

[২২৩] ফেলবী ১০২ পৃষ্ঠার বরাতেঃ ফেলবী (১৬০ পৃঃ) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, জোয়ায়মীরের এ মন্তব্যটি তার পুস্তকের ১৯১২ সালে মুদ্রিত সংস্করণে এ ভাবেই রয়ে গেছে। অথচ বর্ত্তমান সুলতান আবদুল আযীজ বিন আবদুর রহমান বিন ফয়সল বিন তুর্কী বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ ১৯০২ সালে পুনরায় বিয়ায অধিকার করে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে, হোগার্থ (৭৮ পৃঃ) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এ আন্দোলনের পুনরুত্থান এবং উন্নয়নের আশা প্রকাশ করেছিলেন যদিও রিয়ায অধিকার করার পর এ ভবিষ্যদ্বাণী কোন প্রশংসনীয় ব্যাপার নয়। অবশ্য জোয়ারমীরের অজ্ঞতা বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

http://www.shottanneshi.com

কিন্তু (জোয়ায়মির প্রভৃতির) উপরোল্লিখিত মতামত পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে এবং আরব উপদ্বীপের রাজত্বের আমানত অবশেষে পুনরায় নজদীদের হস্তেই অর্পিত হয়েছে এবং প্রথমবারের চেয়েও অধিক বিস্তৃত ও শক্তিশালী আকারেই তা তাদের অধিকারভুক্ত হয়েছে। কিন্তু দরঈয়া যে আর পূর্বের ন্যায় সমৃদ্ধশালী হতে পারেনি এতে কোন সন্দেহ নেই।

নজদী রাজত্বের পুনর্বিন্যাস এবং সংগঠন দরঈয়াতে হয়নি বরং উক্ত এলাকার অপর স্থান রিয়াযে হয়েছিল এবং এখনও রিয়াযই নজদী হুকুমতের রাজধানীরূপে বিরাজ করছে।

দরঈয়া সম্পর্কে শোকগাথা

দরঈয়া পতনে মিসরীয় বর্বরদের জঘন্য আচরণে নজদবাসী ও তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা যেরূপ মর্মাহত হয়েছিলেন তা বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ক্রন্দনকারীরা নিজেদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুসারে রক্তের অশ্রু হয়ত বর্ষণ করেছিলেন।

আমরা নীচে শুধু একটি মরসীয়ার (শোকগাথা) দিকে ইঙ্গিত করতে চাই। এ মরসীয়া নজদের বিখ্যাত আলেম শায়খুল ইসলামের শিষ্য হামদ বিন মোআম্মারের (মৃতঃ ১২২৫ হিঃ) পুত্র আবদুল আযীয বিন হাম্দ বিন নাসের (মৃত ১২৪৪ হিঃ) কর্তৃক বিরচিত।[২২৪] যদিও এটি শরীফ রিন্দী কর্তৃক ত্বলিত্বলার পতনে[২২৫] অথবা সাদী কর্তৃক বাগদাদের পতনের[২২৬] যে

---

[২২৪] আবদুল আযীয বিন হাম্দ বিন নাসের নজদের বিশিষ্ট আলেমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা ও তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে তার মূল্যবান গ্রন্থ "মিনহাতুল করীবিল মুজীব ফিররদ্দে আলা ওব্বাদিস্ সালীব" মিসরে অতি জাঁকজমকের সাথে মদ্রিত হয়েছে এবং এখন আমার সম্মুখেই রয়েছে।

[২২৫] আবুল বকা সালেহ বিন শরীফ রিন্দীর বিখ্যাত শোক গাথার প্রথম পংক্তি এইঃ

لكل شئي إذا ما تم نقصان – فلا يغر بطيب العيش إنسان

ত্বালিত্বালার পতন ৪৭৮ হিজরীর সফর মাসে ঘটেছিল। সাধারণতঃ লোকেরা মনে করে থাকেন যে, গরনাত্বার পতন কালে (৭৯২ হিঃ) এ মর্সিয়া লিখা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এটি গরনাত্বা পতনের তিন বৎসর পূর্বে লিখা হয়েছে-নফহুৎত্বীব (৩) ৫৯৪ পৃঃ

[২২৬] বাগদাদের পতন ৬৫৬ হিজরীতে ঘটেছিল এবং তখন এ মর্সীয়া লিখা হয়েছিল। এর প্রথম কবিতা নিম্নরূপ

آسماں را حق بود گر خوں ببارد بر زمین

http://www.shottanneshi.com

শাকগাথা (مرثية) রচিত হয়েছিল তার ন্যায় হৃদয়বিদায়ক ও শক্তিশালী নয়, তবুও তাতে আন্তরিক মর্মবেদনার বিকাশ ঘটেছে এবং ধর্মপরায়ণ জাতির ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

এর প্রথম কবিতা ছিল এইঃ

أليك إله العرش اشكو تضرعا – وادعوك في ضراء ربي لتسمعا

(হে আল্লাহ! অতি বিনয়ের সাথে তোমারই নিকট অভিযোগ করছি এবং হে পরওয়ারদেগার যাতে তুমি শুনতে পাও তজ্জন্য বিপদকালেও তোমাকেই আহ্বান করছি- উনওয়ানুল মাজদ (২) ৩৪ পৃঃ। -অনুবাদক)

উদাহরণস্বরূপ আরও দুই চারটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হলঃ-

وكم قتلوا من عصبة الحق فتية – هداة وضاة ساجدين وراكعا

وكم دمر وامن مربع كان آهلا – فقد تركوا الدار الإنيسة بلقعا

مضوا وانتضت أيامهم حين اوردوا – ثناء وذكرا طيبة قد تضوعا

فجزاهم الله الكريم بفضله – جنانا ورضوانا من الله وفعا

(বহু সংখ্যক সৎ-সেবক নিষ্ঠাবান পরহেযগার যুবককে তারা হত্যা করেছে, বহু জনপদকে বিধ্বস্ত করে উজাড় করে দিয়েছে। এসব যুবকেরা তাদের আয়ুষ্কাল শেষ করে শাহাদাৎ বরণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের সুখ্যাতি চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দয়ালু আল্লাহ তাঁদের বেহেশতের উচ্চাসনে স্থান দান করুন, আমীন।-অনুবাদক)

أيها الإخوان صبرا فأنني – أري الصبر للمقدور خيرا وانفعا

ولايتاسوا من كشف ما ناب انه – إذا شاء ربي كشف ذاك تمزعا

(দেখ বন্ধুরা! ধৈর্য্য ধারণ কর, ধৈর্য্যই হচ্ছে অধিক উপকারী। হাঁ, তবে তারা এ ঘোরতর বিপদের অধীর হয়নি। বিপদমুক্তি হতে তারা নিরাশ হয়নি। আল্লাহর মর্জ্জি হলে অচিরেই তা বিদূরিত হয়ে যাবে। অনুবাদক)

http://www.shottanneshi.com

Contents

দরঈয়া ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (১২৩৪ হিঃ ১৮১৯ খ্রীঃ) শায়খুল ইসলামের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সংস্কারকৃত নজদের রাজনৈতিক উৎকৃষ্টতা সমাপ্ত হয়ে যায়। নবগঠিত নজদ[২২৭] এবং তার উন্নতি প্রভৃতি আমাদের আলোচনা বহির্ভূত। সুতরাং নজদী হুকুমাতের আলোচনা স্থগিত রেখে এখন আমরা শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কিছুটা আলোচনা করতে চাই।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে নজদী এবং মিসরীয় সৈন্যের তুলনামূলক পার্থক্যের আলোচনা এবং মোহাম্মদ আলীর এবং ইবরাহীম পাশার চরিত্র সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মিসরীয় বিজেতা

মিসরীয় এবং নজদীদের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। প্রথমদিকে মিসরীয়রা বহুস্থানে পরজয় বরণ করে। কিন্তু নজদী কর্তৃপক্ষে ইসলামী যুদ্ধনীতিকে কখনও বিসর্জন দেননি। নজদী সৈন্য বাহিনীর কঠোরতা সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, তাদের মধ্যে ফিস্‌ক ও ফুজুরের (ধর্মবিরোধী) কোন ঘটনা উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে, মোহাম্মদ আলী ও ইবরাহীম এবং তাদের সঙ্গী সাথীদের অবস্থা এরূপ মনে হয় যে, ইসলাম তাদেরকে স্পর্শও করতে পারেনি। এতে এও অনুধাবন করা যায় যে, হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাধারণভাবে মুসলমানেরা অবনতির কোন্ স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল।

নজদী ও মিসরীয় সৈন্যর পারস্পরিক পার্থক্য অনুধাবনের জন্য তৎকালীন বিখ্যাত মিসরী ঐতিহাসিক জবরতীর নিম্নলিখিত বর্ণনাই যথেষ্ট হবে। ১২২৭ হিজরীর মুহাররম মাসের ঘটনায় মিসরীয়দের পরাজয়ের

---

[২২৭] নজদের ইতিহাস তিন যুগে বিভক্ত হতে পারে। (ক) দরঈয়ার উন্নতির কাল হতে ১২৩৪/১৮১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত যখন মিশরীর আক্রমণে আর দরঈয়া পতনে নজদীদের শক্তি নির্মূল হয়ে যায়। (খ) তুর্কী বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ (১৮২০-১৮৬৫) এবং ফয়সল বিন তুর্কীর (১৮৪৩-১৮৬৫ইং) পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হতে ১৩১৪ হিঃ/১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত। এ সময়ে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আলে রশিদ (১২৮৫/১৮৬৯ হতে ১৩১৫/১৮৯৭) হাইলের শাসনকর্তা কর্তৃক হাইল ও রিয়ায দখল করা হয়েছিল। (গ) তৃতীয় স্বর্ণযুগ (ফেলবীর ভাষায় সেকেন্ড ওয়াহ্হাবী এম্পায়ার) হিঃ ১৩২০/১৯০২ সাল হতে শুরু হয়। এ সময় আবদুল আযীয বিন আবদুর রহমান বিন ফয়সল বিন তুর্কী বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ রিয়ায আলে রশিদের নিকট হতে পুনরায় ছিনিয়ে নেন।

http://www.shottanneshi.com

Contents

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জনৈক মিসরী অফিসারের ভাষায় লিখেছেন-(لقد قال لي بعض اكابرهم)

আমাদের ভাগ্যে বিজয় ঘটবে কিরূপে? আমাদের সৈন্যবিভাগের অধিকাংশই ধর্মদ্রোহী। কোন আইন তারা মানতে চায় না। মাদক দ্রব্য ভর্তি করা বহু বাক্স তাদের সঙ্গে রয়েছে। আমাদের ছাউনিতে আযান ধ্বনি শোনা যায় না। তাদের অন্তরে দ্বীন এবং দ্বীনী রীতি নীতির খেয়ালও উদয় হয় না। পক্ষান্তরে, সেই সম্প্রদায় (নজদী সৈন্যরা) সময় হতেই নামাযের আযান দেয় এবং এক ইমামের পিছনে বিনয়াবনত হয়ে কাতার বেঁধে দাঁড়ায়। এমনকি যদি যুদ্ধ চলাকালেও নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন তাদের মোআয্যিন আযান দেয় আর তারা সকলেই সালাতে খাওফ (ভয় কালীন নামায) আদায় করে একদল যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়, অপর দল নামাযের উদ্দেশ্যে পশ্চাতে গমণ করে এবং সেই সময় আমাদের সৈন্যরা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় এই বেচারারা এটা কোন সময়ই দেখেনি, এমনকি শোনেওনি।[২২৮]

আমরা নিজের লেখনীকে সেই পাপাচারের উল্লেখ করে কলুষিত করতে চাইনা যা উপরোক্ত মিসরী সেনাধ্যক্ষের বর্ণনানুসারে মিসরী সৈন্যের দ্বারা বদর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইঙ্গিতে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে মনে করি যে, তাদের পাপাচার হতে আলেম ও শরীফ গৃহবাসীদের ইজ্জত আব্রুও রক্ষা পায়নি।[২২৯] উপরে একজন সেনাধ্যক্ষের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। স্বয়ং জবরতীর বর্ণনাও প্রণিধানযোগ্য। হিঃ ১২৩৩ সনের রমযান মাসের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেনঃ-

মিসরী সৈন্যরা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাতে স্থল ও জলপথে তিন দফায় শা'বান আর রমযান মাসে রওয়ানা হয়। তারা সফরের অজুহাতে রোযা রাখেনি, তাদের অধিকাংশই বাজারে (প্রকাশ্য স্থানে) বসে পানাহার করত; হস্তে হুক্কা ধারণ করে নির্লজ্জভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকত অথচ তাদের আকীদা ছিল এই যে, তারা ইসলাম বিরোধী কাফেরদের সাথে জেহাদ ও গাজওয়া করতে চাচ্ছে।[২৩০]

---

[২২৮] জবরতী (৩) ১৪০ পৃষ্ঠা।
[২২৯] জবরতী (৪) ১৪০ পৃষ্ঠা।
[২৩০] ঐ ২৮৬ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

দীন এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে যখন তাদের এই আচরণ ছিল, তখন দরঈয়ার ধবংস সাধনের এবং নজদকে অধিকাভুক্ত করে নেয়ার পর যদি ইবরাহীম পাশার মস্তিস্ক দাম্ভিকতায় ভরে উঠে থাকে তবে তাতে বিস্ময়ের কী থাকতে পারে। জবরতী স্বয়ং নজদ বিজয়ী ইবরাহীম পাশার দাম্ভিকতা ও অহংকারের শেকায়েত করেছেনঃ-

দীর্ঘদিন (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) বহির্দ্দেশে অবস্থান করার ফলে ইব্রাহীম পাশা নিজেকে মহান বলে ভাবিতে লাগল। তার অহংকারের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। যখন স্থানীয় (তথাকথিত) আলেম সমাজ তাকে সালাম ও মোবারকবাদ জ্ঞাপনের জন্য হাযীর হলেন তখন তিনি তাদের কোন সম্মান করলেন না, এমনকি তাদের সালামের জবাবও দিলেন না। অনন্যোপায় হয়ে আলেমগণ বসে পড়লেন এবং কুশলতার জন্য মোবারকবাদ পেশ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ইঙ্গিতেও তাঁদের জবাব দিলেন না বরং অন্য একজন লোকের সাথে হাস্যালাপে রত থাকলেন। অবশেষে আলেমগণ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে উঠে গেলেন।[২৩১] এ আলোচনার উপর কোন প্রকার টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন আছে কি?

মোহাম্মদ আলীর প্রতারণা ও অত্যাচার

মোহাম্মদ আলী পাশার অত্যাচারের পুনরুল্লেখ আমরা এখানে করতে চাই না। বার্কহার্ট তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২৩২] তিনি মোহাম্মদ আলীর রাজত্বকালে হেজায এবং আরব উপদ্বীপে পর্যটন করেছিলেন এবং নজদীদের প্রতি তার বিশেষ সহানূভতিও ছিল না। তাঁর বর্ণনা বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য হওয়াতে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়।

কোন কোন পর্যবেক্ষক ইব্রাহীম পাশার বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার জন্য মোহাম্মদ আলীকেই দায়ী করেছেন।

"যেরূপ নিষ্ঠুর ও প্রতারণামূলক ব্যবহার অপসারিত শাসনকর্তা এবং সাধারণ ওয়াহ্হাবীদের সাথে করা হয়েছে তার জন্য ইব্রাহীমের চেয়ে মোহাম্মদ আলীই অধিক দায়ী।" (হোগার্থ ১০৩ পৃঃ) বার্কহার্ট মোহাম্মদ

---

[২৩১] ঐ (৪) ২০৬ পৃষ্ঠা। জবরতী ছাড়া হোগার্থও ১০১ পৃষ্ঠা ইবরাহীম পাশার চরিত্রের একটি উত্তম চিত্র অঙ্কিত করেছেন।

[২৩২] বার্কহার্ট ২৪২, ৩০৮, ৩০৭, ৩২৩, ৩৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

http://www.shottanneshi.com

আলীর উৎকোচ প্রদানের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনানুসারে বেদুঈনদেরকে ঘুষ দিয়েই মোহাম্মদ আলী বাজীমাৎ করেছেন।

"বেদুঈনদেরকে মিসরীদের দলে ভিড়াবার মূলে উৎকোচ প্রদানই বিশেষ ক্রিয়া করেছে।"

বার্কহার্ট মোহাম্মদ আলীর বিভিন্ন অত্যাচার ও নৃশংস হত্যাকান্ডের যথেষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। তিনি অন্য এক স্থানে লিখেছেনঃ

"মোহাম্মদ আলী তার সৈন্য-শক্তির চেয়ে অর্থ শক্তির দ্বারাই আরবে তার অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল"। (২০২-২০৬ পৃষ্ঠা।)

এর মোকাবিলায় নজদী ওয়াহ্হাবীদের সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী স্পেনের বিখ্যাত পর্যটক বেদীয়া (Badia)- যিনি আলী বে আব্বাসী নামে মশহুর ছিলেন এবং নজদীদের মক্কা বিজয়কালে স্বয়ং মক্কায় উপস্থিত ছিলেন- তার বর্ণনা পাঠ করুনঃ-

(নজদী সৈন্যরা–) যতক্ষণ পর্যন্ত উত্তমরূপে অবগত না হতেন যে, অমুক দ্রব্য দুশমন অথবা মুশরিকদের, ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে হাত দিতেন না। যবরদস্তি কোন দ্রব্য আত্মসাৎ করার চেষ্টা করতেন না। তারা ন্যায্য মূল্য আদায় করেই কোন জিনিষ গ্রহণ করতেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক কাজের জন্য কর্মীকে তার মজুরী প্রদান করতেন। তারা নিজেদের আমীরের সত্যিকার অনুসারী হিসাবে তার যাবতীয় নির্দেশ পালনে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। (হোগার্থ ৭৮ পৃষ্ঠা।)

আলী বে হতেও অধিক মোহাক্কেক পর্যটক বার্কহার্ট যিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ মোহাম্মদ আলীর শাসনকালে) মক্কায় পৌঁছেছিলেন এবং যার গ্রন্থাবলী তাঁর সত্যতা ও জ্ঞান গভীরতার সাক্ষ্য বহন করছে- তিনি লিখেছেনঃ-

ওয়াহ্হাবী অগ্রযাত্রার পিছনে খারাপ রসম রেওয়াজের বিনাশ সাধনের শক্তিশালী ঐকান্তিক ইচ্ছা সক্রিয় ছিল। অতি প্রতারক দুশমনের সাথেও তাঁরা ওয়াদাখেলাফী করেননি। যদি তুর্কী তথা মিসরীয়দের সাথে তাদের তুলনা করা যায় তবে আমাদেরকে তুর্কীদের সমস্ত অপকর্মের উল্লেখ করতে হবে যাতে তারা কলুসিত ছিল।[২৩৩]

বার্কহার্টের সমস্ত গ্রন্থেই সউদ এবং আবদুল্লার প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।[২৩৪]

---

[২৩৩] হোগার্থ ৭৯ পৃষ্ঠা।

[২৩৪] বার্কহার্ট (২) ১২০-১৮০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

তৃতীয় অধ্যায়

শায়খুল ইসলামের গ্রন্থাবলী

প্রাচ্যের দার্শনিক এবং আধুনিক ইসলামী দুনয়ার সর্বপ্রথম রাজনৈতিক চিন্তানায়ক সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী (মৃঃ ১৩১৫ হিঃ ১৮৯৭ খ্রীঃ) সম্পর্কে বর্তমান যুগের বিখ্যাত আরব রাজনীতিবিদ মর্দ্দে মোজাহেদ আমীর শকীব আরসালান (মৃঃ ১৩৬৬ হিঃ ১৯৪৬ খ্রীঃ) একটি চমৎকার উক্তি করেছেন।[২৩৫]

انہیں تصنیف وتالیف کی کثرت سے خاص دلچسپی نہی تھی وہ کتنوں کے مولف نہیں تھے بلکہ حکومتوں اور قوموں کے مصنف تھے

গ্রন্থ ও রচনা-সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না, তিনি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন দেশ ও জাতির রচয়িতা (সংগঠক)।

কথাটি সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানী সম্বন্ধে হলেও শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কেও ঠিক এ কথাটিই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সহকারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অধিকন্তু শায়খুল ইসলাম তাঁর তবলীগ ও দা'ওয়াত সম্পর্কীয় যে সমস্ত পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেছেন, তার সংখ্যাও তেমন কম নয়। অধিকন্তু তথ্য ও তত্ত্বমূলক লেখা হিসাবে দার্শনিক সূক্ষ্ম আলোচনা এবং ইউনানী (গ্রীক) বিদ্যায় প্রভাবিত পববর্তী ফকীহ্দের অমূলক উক্তির লেশ মাত্রও দেখা যাবেনা। তিনি খাঁটি মোহাদ্দেসগণের অনুরূপই লিখতেন। সোজা ও সরল কথায় তিনি আসল উদ্দেশ্যটি পাঠকদের অন্তরে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করতেন। কেতাব ও সুন্নতের প্রমাণপঞ্জীতে সুসজ্জিত সত্য ও তথ্যপূর্ণ লেখার জন্য বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রয়োজনই বা কী? সত্যের মধ্যে স্বাভাবিক একটি বাস্তব আকর্ষণ নিহিত রয়েছে। শায়খুল ইসলামের পুস্তিকাবলীর বড় বিশেষত্ব এই যে, তাতে গ্রীক এবং গ্রীক বিদ্যার কোন প্রভাব পড়েনি। অথচ পাক ভারতের বড় বড় ধর্মীয় সংস্কারকদের গ্রন্থাবলীও গ্রীক দর্শনের গোলক

---

[২৩৫] হাজিরুল আলামীল ইসলামী (২) ৩০১ পৃষ্ঠা। আমীরের মূল শব্দ নিম্নরূপঃ-

وبالجملة فإنه لم يكن يجفل بوفرة التصانيف وإنما كان مولف الأمم ومصنف ممالك

http://www.shottanneshi.com

ধাঁধাঁ এবং পুর্বাঞ্চলীয় মতবাদের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। শায়খের অনুসৃত পদ্ধতি ঠিক কোরআনেরই অনুরূপ এবং শুধু কুরআন ও হাদীস হতেই তিনি প্রমাণ গ্রহণ করতেন। দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শায়খুল ইসলামের পুস্তিকাগুলোতে তিনি কোন স্থানেই তাসাউফের পরিভাষা ব্যবহার করেননি। বেদান ও প্লেটুর নবদর্শনের এ জগাখিঁচুড়ি (যাকে বর্তমান সাধারণ লোকেরা "তাসাউফ" [২৩৬] নামে আখ্যায়িত করে থাকে) ইসলামের ভীষণ ভুল করেছেন যে, তাঁরা মুসলমানগণকে এ (তাসাউফের) আফিং (মাদকদ্রব্য) ব্যবহার করিয়েছেন। অথচ একথা অনস্বীকার্য যে, আফিং সর্বাবস্থায় আফিংই বটে, অতি সতর্কতা সহকারে ব্যবহার করলেও তার কুপ্রভাব সর্বাবস্থায়ই শরীরের প্রধান অঙ্গগুলোর ধ্বংস সাধন করবেই। ফলে পাক ভারতের মুসলমান আজ পর্যন্ত এ মায়াজালকে ছিন্ন করতে পেরে উঠেননি। কিন্তু শায়খুল ইসলামের বিশুদ্ধ প্রয়োগ এবং উপরোক্ত আফিংকে পূর্ণভাবে বর্জন করায় নজদ এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানগণ এ গোলকধাঁধাঁ হতে চিরতরে নাজাত পেয়েছেন।

শায়খের বর্ণনা পদ্ধতিতে কোনরূপ জড়তা নেই। তবে একথা সত্য যে, তার ভাষা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃঃ ৭২৮ হিঃ) ও ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের (৭৫১ হিঃ) এবং শাহ্ ওয়ালিউল্লার (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ) ন্যায় উচ্চাঙ্গের নয়। তথাপি তাঁর রচনায় এমন একটি অমূল্য বস্তু লক্ষ্য করা যায়, যা সমস্ত ইসলামী সাহিত্য সম্ভারেও দৃষ্টিগোচর হয় না এবং হিজরী অষ্টম শতাব্দীর পর যা একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল। পাঠক অনুমতি দিলে আমরা তাকে ডঃ ইকবালের ভাষায় নফছ (বা আমিত্ব) বলে

---

[২৩৬] বন্ধুরা অনুরোধ করেছিলেন যে, ব্যাপকভাবে তাসাওফের যেন বিরুদ্ধাচরণ করা না হয়। বরং যেমন কু-আলেমগণের উক্তি দ্বারা বে-আমল আলেমগণকে চিহ্নিত করা হয়, তেমনি ভন্ড সুফিদের পারিভাষিক প্রতারণা ও কুসংস্কার প্রকাশ করার জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ পরামর্শ গ্রহণ করতে আমাদের কোন আপত্তি থাকত না যদি না আমাদের সম্মুখে তথাকথিত তাসাওউফের অনিষ্টসমূহ বিদ্যমান থাকত। তবে এহসান এবং ইসলামী পদ্ধতিতে আত্মশুদ্ধির যে দাওয়াত দেওয়া হয় তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। বিরোধ শুধু সেই তথাকথিত অনৈসলামিক পরিভাষা সম্পর্কে যার অন্তরালে দিনদুপুরে পুকুরচুরি করার বাজার সরগরম হয়ে রয়েছে। এ ফেৎনা হতে ফিরার একমাত্র পন্থা হচ্ছে সমূলে এ পর্দাকে উঠিয়ে ফেলে দেয়া।

http://www.shottanneshi.com

আখ্যাত করতে পারি। শায়খের লেখার প্রতি লাইনেই প্রতীতির (ياثير) ছাপ পরিপূর্ণ দেখা যায়। (বস্তুতঃ তাঁর লেখা পাঠকের অন্তরের অন্ত স্থলকেই স্পর্শ করে থাকে) সম্ভবতঃ এটি তাঁর সেই দ্বীনী স্পন্দনেরই মুক্ত প্রভাব ছিল, যাতে তিনি জীবনব্যাপী ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এ দ্বীনি প্রেরণাই নজদ এবং নজদের পার্শ্ববর্তী এলাকার রূপ ক্ষণিকের মধ্যেই সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছিল।

ফলকথা এই যে, শায়খুল ইসলামের ক্ষুদ্র বৃহৎ কেতাবেই বিশেষতঃ তাঁর রেসালাগুলোতে এই প্রভাব অধিক মাত্রায় অনুভূত হয়ে থাকে। শায়খের নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহের সন্ধান আমরা লাভ করতে পেরেছিঃ

১। কিতাবুত্ তাওহীদ

এটি শায়খের সর্বাপেক্ষ্য অধিক বিখ্যাত গ্রন্থ। পাক ভারতের তথাকথিত এক শ্রেণীর মুসলমানদের নিকট যেমন মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (শাহাদাৎ ১২৪৬ হিঃ) কৃত তকভিয়াতুল ঈমান পুস্তিকাখানার দুর্নাম রয়েছে, অনুরূপভাবে আরব ও আযমের অধিকাংশ তথাকথিত "খুশ আকীদা" লোকের মধ্যে কিতাবুত্ তওহীদকেও সুনজরে দেখা হতনা। এর পূর্ণ নাম ও প্রকৃত বিবরণ হচ্ছে 'কিতাবুত্ তাওহীদ আল্লাযী হুয়াহক্কুল্লাহে আলাল এবাদে'। এতে তিনি তার সীমা নির্দ্ধারণ, শির্ক ও তার অপকারিতা এবং শির্কের যাবতীয় উপকরণ যথা ইস্তেআযা, গায়রুল্লার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করা, গায়রুল্লাহকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা, যাদুটোনা, জ্যোতিষী চর্চ্চা এবং ফাল গ্রহণ প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেক অধ্যায়ের আনুষঙ্গিক কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট সাক্ষ্যগুলোই শুধু সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। এ পুস্তকখানা জন-সাধারণের নিকট অধিক সমাদৃত হয়ে গেছে। বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়েছে। উর্দ্দুতেও তার কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজীতে অনুবাদের সন্ধান এখনও জানা যায়নি।[২৩৭]

---

[২৩৭] ইন্ডিয়া অফিসের আরবী সূচীপত্রে (২) ৩৮৪ পৃঃ ২০৫০ কিতাবুত্ তাওহীদের ইংরেজী অনুবাদের বরাত দেয়া হয়েছে। (এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণল রাইল ১৮৭৪ খ্রীঃ) অথচ তা শায়খ আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের সেই পুস্তিকার অনুবাদ যা

http://www.shottanneshi.com

নজদের আলেমগণ এর কতিপয় বিশেষ উপকারী ভাষ্যও রচনা করেছেন। মিঃ ব্রুকলেমন দু'টি ভাষ্যের উল্লেখ করেছেন।[২৩৮] (ক) আহমদ বিন হাসান নজদী কৃত আদ্দুররুন নজীদ এটি ১৩১১ হিজরীতে দিল্লিতে মুদ্রিত হয় (খ) 'ফতহুল্লাহিল হামিদিল মাজীদে' ঃ এটা হামিদ বিন মোহাম্মাদ বিন হাসান কর্তৃক রচিত এবং ১৮৯৭ সালে অমৃতসরে মুদ্রিত হয়েছে। প্রথমটি সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারিনি। দ্বিতীয়টি অসম্পূর্ণ এবং অতি সাধারণ। কিন্তু মিঃ ব্রুকলেমন সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য ফতহুল মজীদে উল্লেখ করেননি। অথচ এটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ভাষ্য)। এটি আসলে শায়খ সুলায়মান বিন আবদুল্লাহ বিন শায়খ (মৃঃ ১২৩৩ হিঃ) রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু অসম্পূর্ণ ছিল। অতঃপর শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান বিন শায়খুল ইসলাম (মৃঃ ১২৮৫ হিঃ) তা সমাপ্ত করেন। এতে প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তিনি এতে যথেষ্ট সংযোজনও করেছেন। আমাদের সম্মুখে যে পুস্তক রয়েছে তা শায়খ ইবনে হাসানের সংকলিত। এ ভাষ্যে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। স্থানে স্থানে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (মৃঃ ৭২৮ হিঃ) ও ইবনুল কাইয়েমের (মৃঃ৭৫১ হিঃ) গ্রন্থাবলী হতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে যাতে ভাষ্যখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বহু উপকারী গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এটি দিল্লীস্থ আনসারী মুদ্রণালয়ে ১৩১১ হিজরীতে প্রথম মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় বার মাতবায়ে সলাফিয়া মিসরে বাহরায়নের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শায়খ আবদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ১৩৪৭ হিজরীতে মামুলী কাগজে মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

তিনি ১২১৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় লিখেছিলেন। ব্রকলমনও এ ভুলে পতিত হয়েছিলেন (২) ৩৯ পৃঃ; কিন্তু তিনি পরিশিষ্টে (২) ৫৩২ পৃষ্ঠায় শুদ্ধ করে দিয়েছেন। অবশ্য শুদ্ধ করার পরও সনের অনেক ভ্রম রয়ে গেছে। ১৮৭৪ এর স্থলে ১৮৪০ মুদ্রিত হয়েছে। শায়খ আবদুল্লাহর পুস্তিকার অনুবাদ ---- ও কিন্লী করেছেন এবং বিস্ময়কর ভুল করেছেন। অন্য কোন স্থানে তা বর্ণিত হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশের জনৈক বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আবদুস সামাদ কর্তৃক তার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে এবং মহামান্য রাষ্ট্রদূত আলহাজ আল্লামা ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খাতিব কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়েছে- অনুবাদক।

[২৩৮] তারিখ আদবে (জার্মান) পরিশিষ্ট (২) ৫৩১-২।

http://www.shottanneshi.com

বর্তমানে কায়রোতে আন্সারুস্ সুন্নতিল মোহাম্মদীয়াহ্ প্রেসে শায়খ মোহাম্মদ হামীদ আলফকীহ্র তত্ত্বাবধানে অতি সন্দর ও মনোরম আকারে মুদ্রিত হয়েছে। (১৩৫৭ হিঃ) এর প্রারম্ভে শায়খ মোহাম্মদ হামীদ ফকীহ কর্তৃক লেখকের জীবনী উনওয়ানল মাজদ হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রকাশক স্থানে স্থানে হাদীসের সূত্রও উল্লেখ করে দিয়েছেন। ভাষ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের যে সমস্ত উক্তি বরাত ছাড়াই উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে প্রকাশক টীকায় মূল গ্রন্থের বরাতও উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন যাতে আসলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সহজতর হয়ে গেছে।

শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান এ ভাষ্য (যা শায়খ সোলায়মান বিন আবদুল্লাহর অসম্পূর্ণ ভাষ্যের পূর্ণরূপায়ন) ছাড়াও কিতাবুত্ তাওহীদের সঙ্গে কিছু কিছু সংযোজন করিয়েছিলেন। তাও আলাদাভাবে কুররাতুআইনিল মুআহ্হেদীন নামে মুদ্রিত হয়ে গেছে। (আলমানার মুদ্রণালয়, মিসর ৪৬ হিঃ) লেখকের এ কিতাবটি দেখার সুযোগ হয়নি। মোহাম্মদ হামীদ আলফকীহ ফতহুল মজীদের টীকায় কোন কোন স্থানে তা হতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন।

২। কাশ্ফুশ্ শুবহাত মিনাত্ তাওহীদ

একে আমরা কিতাবুত তাওহীদের পরিশিষ্ট বলতে পারি। এমনিতেই শায়খ সাহেবের সব গ্রন্থেই সাধারণভাবে তাওহীদের আলোচনা রয়েছে এবং এ সবকে কিতাবুত্ তাওহীদের পরিশিষ্ট বলা চলে। কিন্তু কশ্ফুশ্ শুবহাত শুধু তওহীদেরই আলোচনায় পরিপূর্ণ। খাঁটি তওহীদ সম্পর্কে যে সমস্ত সংশয় উপস্থিত করা হয়ে থাকে, তাতে তার বিস্তারিত খন্ডন করা হয়েছে। কেউ অলী-দরবেশের কথা মনে করে, কেউ আবার কারও মধ্যস্থতা গ্রহণের প্রয়াস পায়, কেউ কেউ গায়রুল্লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে গোমরাহ্ হচ্ছে। সুফারিশের ব্যাপারেও কোন কোন লোকের ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ পুস্তিকায় এরূপ বহু সন্দেহের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। প্রমাণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ কোরানের পদ্ধতি অনুসারে। কোথাও কোন পেঁচ নেই এবং পরবর্তীদের ন্যায় কোন ঝগড়ামূলক বর্ণনা পদ্ধতিও কোথাও নেই। বস্তুতঃ এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি বিভিন্ন তথ্যমূলক জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় পরিপূর্ণ। এটি বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। আমাদের সম্মুখে সেই

http://www.shottanneshi.com

কপি রয়েছে যা ইসা বিন রমীহ হয়েছে। আমাদের সম্মুখে সেই কপি রয়েছে যা ইসা বিন রমীহ নজদীর গ্রন্থসমূহের সাথে ৫৬-৭২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

৩। আল অসুলুস সালাসাহ্ ও তার প্রমাণাদি

(তিনটি বিধান) এতে রবের মা'রেফাত, মা'রেফাতে দ্বীনে ইসলামী ও মা'রেফাতে নবী এই তিনটি মৌলিক বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে। এটি একটি ক্ষুদ্রতম পুস্তিকা।

৪। শুরুতে সালাত (شروط صلواة) ও আরকানেহা

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় নামাযের শর্তসমূহ (যথা ইসলাম, জ্ঞান, বালেগ হওয়া, অযু করা, নাপাকী দূর করা, লজ্জাস্থান আবৃত করা, সময় হওয়া, কিবলার দিকে মুখ ফিরান এবং নিয়ত) প্রভৃতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অধিকন্তু নামাযের আরকান ও ওয়াজেবসমূহের বিস্তারিত বর্ণনাও দেয়া হয়েছে।

৫। আরবায়া কাওয়ায়েদ বা নীতিচতুষ্টয়

এতে তওহীদের কোন কোন দিক অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মৌলনীতি চতুষ্টয় এই যেঃ-

(ক) আরবের কাফেরগণও আল্লাহকে স্রষ্টা, রিজ্কদাতা এবং নিয়ামক বলে স্বীকার করত কিন্তু এতে মুসলমান বলে গ্রহীত হয়নি।

(খ) আরবের কাফেরগণও আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যান্য অলী দরবেশগণকে নৈকট্য এবং সুফারিশ করার জন্যই ডাকত আহ্বান করত।

(ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله)

(গ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক ফেরেশতা, সদাচরণশীল ব্যক্তিবর্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর এবং চন্দ্র সূর্য্যের পূজকদের সাথে একই নিয়মে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের মুশরিকদের মধ্যে তিনি কোনরূপ পার্থক্য করেননি।

(ঘ) বর্তমান সময়ের মুশরিক পূর্ববর্তী মুশরিকদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। কারণ পূর্ববর্তীরা বিপদের সময় কমপক্ষে আল্লাহর নামটি স্মরণ করত আর বর্তমান মুশরিকরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ ছাড়া অপর আউলিয়ালিয়াদের শরণাপন্ন হয়ে থাকে।

http://www.shottanneshi.com

আলোচ্য সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় কুরআন মাজীদের আয়াতের সাহায্যে উল্লিখিত নীতি চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ তিনটি পুস্তিকাই ইসা বিন রমীহ্ কর্তৃক মুদ্রিত সঙ্কলনে (১-২৭পৃঃ) কায়রোস্থ আলমানার প্রেসে ১৩৪০ হিজরীতে এক সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে। আল কিতাবুল মুফীদ সঙ্কলনেও– যা মক্কায় ১৩৪৩ হিজরীতে মুদ্রিত হয়েছে– এই পুস্তকগুলো সন্নিবেশিত রয়েছে।

৬। অসূলে ঈমান

এতে ঈমানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হাদীসের আলোকে অতি মনোরম আলোচনা করা হয়েছে। শায়খুল ইসলামের সন্তানদের মধ্য হতেই কেউ এতে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করেছেন। পুস্তিকার প্রথম অংশ পাঠ করলে সহজেই ধরা পড়ে (وقد زاد فيه بعض اولاده زيادة حسنة) প্রথমে এ দিল্লিতে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে মাজমোআতুল হাদীস আননাজদীয়াহ্তে (কায়রো আলমানার প্রেসে ১৩৪২ হিঃ) মুদ্রিত হয়েছিল (২০৯-২৪০ পৃঃ)

৭। কিতাবু ফযলিল ইসলাম

এতে ইসলামের শর্তাবলীর অপরিহার্য্য অঙ্গগুলোর আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিদআৎ ও শির্কের অপকারিতাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। (মোজমোআতুল হাদীসিন নজদীয়াহ্ ২৪২-২৫৫ পৃঃ)

৮। কিতাবুল কাবায়ের

কবীরা গোনাহের বিভিন্ন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়কে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণপঞ্জী দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। বরং লেখক নিজের পক্ষ হতে খুবই অল্প লিখেছেন। কোরআনে করীম এবং সুন্নতে নববীকে বিশেষ ভঙ্গিতে সন্নিবেশিত করাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। (মাজমোয়াতুল হাদীসিন নজদীয়াহ্ ২৫৮-৩১০)

৯। নসীহাতুল মুসলেমীন

এটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা। ইসলামী শিক্ষার প্রত্যেক শাখা প্রশাখা সম্পর্কে বিভিন্ন অধ্যায়ে কুরআন ও হাদীস একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। লেখক নিজে কোন মন্তব্য করেননি। মোজমাআতুল হাদীস ৩১২ -৪৪৪ পৃষ্ঠা)।

http://www.shottanneshi.com

১০। সিত্তাতু মাওয়াযেয়া মিনাস সীরাতে (ستة مواضع من السيرة)

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় মোস্তফা চরিতের ছয়টি বিশিষ্ট স্থানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথাঃ-

(ক) অহি নাজেল হওয়ার প্রারম্ভিক অবস্থা,

(খ) তওহীদের শিক্ষাদান ও কাফেরদের অবস্থা,

(গ) 'তিলকাল গারানীকুল উলার' ঘটনা

(ঘ) আবু তালেবের পরিণতি,

(ঙ) হিজরতের উপকারিতা এবং তার শিক্ষা,

(চ) রসূলুল্লার ইন্তেকালের পর ইসলাম পরিত্যাগের ঘটনা। মাজমোআতুল কিতাবিল মুফীদঃ ১৯-২৩ পৃষ্ঠা।

১১। সূরা ফাতেহার তাফসীরঃ সূরা ফাতেহার সংক্ষিপ্ত তফসীর।

এতেও শায়লেখ তওহীদী একাগ্রতা প্রতিলাইনে বিবৃত হয়েছে। (মো'জমোআতুল মুফীদ ১৮-১৯ পৃষ্ঠা)।

১২। মাসায়েলুল জাহেলীয়াহ্

এতে শায়খুল ইসলাম এরূপ একশত একত্রিশটি মসআলার উল্লেখ করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাহেলী যুগের লোকের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। মাহ্মূদ শক্‌রী আলুসী (মৃঃ ১৩৪২ হিঃ) কর্তৃক এর একটি ভাষ্যও রচিত হয়েছে। (আযযাহ্‌রাউ ৪৪-৫২ পৃষ্ঠা)।

১৩। তফসীরুশ শাহাদৎ

কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তফসীরে তাওহীদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি অতি মনোরম আলোচনা করেছেন। (ঐ ৭৮-৮০ পৃঃ)

১৪। আত্ তাফসীর আলা বা'যে সুওয়ারিল কুরআন

কোরআনের কতিপয় সূরা এবং বিভিন্ন আয়াতের প্রাঞ্জল আলোচনার সমষ্টি। প্রত্যেক আয়াত হতে তিনি বহু মসআলা মাসায়েল বের করে ব্যাখ্যা করেছেন। এর এটাই পুস্তিকার বৈশিষ্ট।

http://www.shottanneshi.com

১৫। কিতাবুস্ সীরাত্

এটি ইবনে হেশামের সীরত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পাটনা লাইব্রেরীতে এর একটি অতি বিশুদ্ধ ও পুরাতন কপি বিদ্যান রয়েছে।[২৩৯]

১৬। আল হাদয়ুন নববী

এটি ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের বিখ্যাত "জাদুল মাআদ" গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। এর উপরে মোকতাছার আল হাদীউন নববী লিখিত আছে। পাটনা লাইব্রেরীতে এর একটি হস্তলিখিত (কলমী) নমুনাও রয়েছে।[২৪০]

এতদ্ব্যতীত শায়খুল ইসলামের আরও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন পুস্তিকা বিদ্যমান রয়েছে। এখানে তার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। কতিপয় পুস্তিকা ও জিজ্ঞাসার উত্তরসমূহ 'রওয়াতুল আফকার'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।[২৪১]

---

[২৩৯] মশ্‌রুহ্-সূচীপত্র ১৫ঃ ১০৩৮/১

[২৪০] ঐ ১৫, ১০৩৮/১ দ্রষ্টব্র।

[২৪১] প্রথম খন্ড, তৃতীয় ও চতুর্থ ফসল।

http://www.shottanneshi.com

চতুর্থ অধ্যায়

দা'ওয়াত

রাজনীতির অপকারিতাঃ আধুনিক মিসরের বিখ্যাত আলেম এবং সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর বিশিষ্ট বন্ধু শায়খ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ১৩২৩ হিঃ ১৯০৫ খ্রীঃ) রাজনীতি এবং তার অন্যায় হতে আল্লাহর আশ্রয় পার্থনা করতেন। তার বিখ্যাত উক্তি ছিল এই যে, (ما دخلت السياسة في شئي إلا أفسدته) "রাজনীতি যেখানেই প্রবেশ করে তাকেই বিনষ্ট করে দেয়। "এ অনেকটা সত্যও বটে। রাজনীতিকরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য জায়েয নাজায়েযের খেয়ালও করেন না এবং এ কারণেই সত্যকে বিকৃত করতে সাময়িকভাবে সফলকামও হয়ে যান।

শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের দা'ওয়াত যাকে (ইংরেজের শিক্ষানুসারে) ওয়াহ্হাবীয়ত নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে– কোন নূতন বস্তু নয়। কেতাব ও সুন্নাতের খাঁটি শিক্ষা ছাড়া তিনি অন্য কিছুই পেশ করতেন না। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শায়খের দা'ওয়াত (তথা দ্বীনী এ আন্দোলন)-কে ওয়াহ্হাবীয়ত নাম দিয়ে এইভাবে পেশ করা হয়েছে যে, তাতে যেন ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনের দা'ওয়াত (আহ্বান) দেয়া হয়েছে।

ঘটনাক্রমে নজদবাসীদেরকে দুর্নাম করার কাজে তিনটি জমাআত একত্রিত হয়েছিল। তুর্কী এবং মিসরীয় রাজত্বের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চলতেই ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলে এসেছে। ভারত সরকারের সাথেও এক দু'টি সংঘর্ষ ঘটে গিয়েছিল। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি রাষ্ট্র এবং তাদের অজিফাখোরেরা সকলেই এ "মহৎ কাজে" বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। তারা ছাড়াও মক্কার আশরাফেরা ও তাদের সহায়তাকারীরাও তাদের নযর নিয়াযের আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিক্ষুব্ধ ছিল।[২৪২] ইংরেজ

---

[২৪২] মক্কা নগরী ও মদীনার কবর ও দরগাহ্ প্রভৃতির আয়ের উপর একটি বৃহৎ দলের জীবিকা ছিল নির্ভরশীল। হিজরী ১২১৮ সালে সেখানে সউদী সরকারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাদের সেই জীবিকা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারা স্বভাবতঃই উক্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ

http://www.shottanneshi.com

ছাড়াও পাশ্চাত্যের সাধারণ পর্যটকেরাও আরব উপদ্বীপে খাঁটি মাযহাবী চেতনাকে সুনজরে দেখতে পারত না। ফলকথা এই যে, বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং বিভিন্ন জমাআত কর্তৃক শায়খের দা'ওয়াতের কুৎসা রটনা ও তার দুর্নাম করার চেষ্টার কোন ত্রুটিই করা হয়নি। ফলে আজ হতে কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত ওয়াহ্হাবীয়ত একটি "ভীতিপ্রদ কাল্পনিক মূর্তির" রূপ ধারণ করেছিল। অতঃপর হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) দেহলবীর সংস্কার ও জেহাদ আন্দোলনকে ওয়াহ্হাবীয়ত নামে আখ্যাত করে একেও ইসলাম বহির্ভুত একটি আলাদা মাযহাবের রূপ দেয়া হয়েছিল।[২৪৩]

আজ হতে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে সেই ভ্রান্ত অপবাদগুলো গ্রহণ করার কিছুটা ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারত যখন নজদবাসীদের রচিত গ্রন্থসমূহ সাধারণভাবে পাওয়া যেত না এবং নজদের আলেমবৃন্দ তাদের সীমাবদ্ধ এলাকার বাহিরে প্রচারকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। অতএব সেই সময়ে কারও পক্ষে নজদীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করার কিছুটা হেতুবাদ থাকলেও বর্তমানে যখন শায়খুল ইসলাম এবং তার শিষ্যবর্গের রচিত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়ে গেছে আর সর্বত্র তা পাওয়াও যাচ্ছে, কাজেই এখন অজ্ঞতার বাহানা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শায়খের মাযহাব

সংক্ষিপ্ত কথায় এটাই বলা যেতে পারে যে, শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব দ্বীনে ইসলামকে তার আসল রূপেই দেখতে চেয়েন। আকীদা ও আমলের প্রত্যেক বিষয়েই তিনি সলফ (পূর্ববর্তী) দের

করতে শুরু করে এবং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থানে পরিকল্পিত নানা অপবাদ গড়তে ও প্রচার করতে থাকে। জব্‌রতী [(৩) ২৫৫] ১২১৮ হিজরী সালের সফর মাসের ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেনঃ-

মক্কার অধিবাসীদের একটি বৃহৎ অংশ ওয়াহ্হাবীদের ভয়ে হাজীদের সঙ্গে পালিয়ে আসে। ওয়াহ্হাবীদের সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলত। কেউ তাদের "খারেজী" ও কাফের বলে অভিহিত করত। মক্কার অধিবাসীদের এবং তাদের অনুসারীদের এরূপ ধারণাই ছিল আর কেউ কেউ এমনিতেই স্বার্থহানির কারণে তাদের বিরোধিতা করত.....।

[২৪৩] এখানে মযহাব শাব্দিক অর্থেই হয়েছে। (هو ما ذهب إليه أحد الأئمة) অর্থাৎ কোন ইমাম যে মত গ্রহণ করেছেন। উর্দু ভাষায় মযহাব ও দ্বীন সমার্থবোধক হয়ে গেছে।

http://www.shottanneshi.com

অনুসরণ করাই একান্তভাবে পছন্দ করতেন। ফিক্হের ব্যবহারিক বিষয়ে তিনি ইমাম আহলে সুন্নত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (মৃঃ ২৪৬ হিঃ) মযহাবের অনুসরণ করতেন। কিন্তু হাম্বলী মযহাবের বিরুদ্ধে কোন সহীহ হাদীস পেলে হাদীসের উপর আমল করা হতে তাঁকে কোন শক্তিই বিরত রাখতে পারত না। তিনি বলেছেন-

وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في الفروع ولا ندعى الإجتهاد وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان.

অর্থাৎঃ ব্যবহারিক বিষয়ে আমরা আহলে সুন্নত জমাআতের ইমাম-ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মাযহাব অনুসরণ করে থাকি। আর আমরা ইজতেহাদের দাবী করি না। কিন্তু যদি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কোন বিশুদ্ধ সুন্নত আমাদের নিকট প্রতিপন্ন হয়ে যায় তবে আমরা তারই অনুসরণ করে থাকি এবং অন্য কোন লোকের মতামতকে অগ্রগণ্য মনে করি না।[২৪৪]

শায়খুল ইসলাম কোন স্থানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের উক্তিকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের তকলীদের হার তিনি কখনও গলায় পরিধান করেননি। ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়্যেম তাঁর জ্ঞান অনুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত কিতাব এবং সুন্নত হতে বিচ্যুত না হন ততক্ষণ পর্যন্ত শায়খুল ইসলাম তাঁদের অনুসরণ করতেন। বরং যে কোন ইমাম অথবা আলেম কিতাবুল্লাহ এবং সহীহ সুন্নতে রাসূলুল্লাহর প্রতি আমল করা চেষ্টা করতেন, তিনি তাদেরকেই একান্ত ভালবাসতেন। তিনি বলেছেন-

الإمام انب القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة وكتبهم عندنا من اعز الكتب إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسئلة

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমে এবং তাঁর উসতাদ (ইমাম ইবনে তাইমিয়া) আহ্লে সুন্নত আল জামায়াতের সত্যপরায়ণ ইমাম ছিলেন। তাঁদের রচিত কিতাবগুলো আমাদের নিকট অতি প্রিয়, কিন্ত প্রত্যেক বিষয়ে আমরা

---

[২৪৪] আল হাদীয়াতুল সানীয়াহ্, ৯৯ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

তাঁদের তকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করিনা (বরং আমরা গায়র মোকাল্লেদ)।[২৪৫]

সত্যকথা এই যে, ব্যবহারিক বিষয়ে শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নিজে হাম্বলী মাযহাব অনসরণ করলেও অপরকে তার অনুসরণ করতে পীড়াপীড়ি করতেন না। বেহুদা রসম রেওয়াজ এবং বিদআতের অনুসরণ করা কোন ইমামের নিকটেই জায়েয নয়। গান এবং বাদ্য-বাদকতা সম্পর্কে হানাফী আলেমগণ কঠোর ব্যবস্থা দিয়েছেন অথচ আমাদের সম্মুখে তথাকথিত "হানাফী" নামধারীরা আজ কত কিছুই না করছেন।

শায়খের ব্যবহারিক মযহাবের অতিরিক্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিও অধিক প্রণিধানযোগ্যঃ-

ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولا ننكر على من قلد أحد الأربعة دون الغير بعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة الخ ... ولا نستحسن الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا يدعيها إلا إننا في عض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وبركنا المذهب كارث الجد والاخوة فإنا نقدم الجد وان خالف مذهب الحنابلة.

ব্যবহারিক বিষয়ে আমরা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সিদ্ধান্তেরই অনুসারী।[২৪৬] কিন্তু মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীদেরও আমরা নিন্দা করি না, তবে ইমাম চতুষ্টয় ব্যতীত অপর কারও তাকলিদ করা বৈধ মনে করিনা। কারণ অন্য কারও মাযহাব বিশুদ্ধভাবে সঙ্কলিত হয়নি যথা রাফেজী প্রভৃতি।

---

[২৪৫] আলহাদীয়াতুস্ সানীয়াহ্; ৫৩ পৃষ্ঠা।

[২৪৬] মারগোলিয়থ সাহেব শায়খুল ইসলাম এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতবিরোধীয় বিষয়ের একটি সুচী দিয়াছেন। বস্তুতঃ এ তাঁর অজ্ঞাতারই পরিচায়ক। উদাহরণস্বরূপ তিনি লিখেছেন শায়খের মতে নামাযের জামাআত ফরয (Obligatory) অথচ ইমাম আহমদ এ মত পোষণ করতেন না। এটা অপেক্ষা অজ্ঞতা আর কী হতে পারে? ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম. ওয়াহ্হাবীয়াত অধ্যায়।

http://www.shottanneshi.com

...আর আমরা নিজেরাও পূর্ণ ইজতেহাদের যোগ্য নই এবং আমাদের কেউ অনুরূপ দাবীও করেনি। তবে কোন কোন বিশেষ বিষয়ে কিতাব ও সুন্নতের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণিত হলে এবং তার কোনরূপ বিরোধিতাও প্রমাণিত না হলে এবং অন্য কোন বলিষ্ঠ দলিলের বিরোধিতাও না হলে, অধিকন্তু ইমাম চতুষ্টয়ের কেউ না কেউ তা গ্রহণও করেছেন এরূপ অবস্থায় আমরা এ অবশ্যই গ্রহণ ও বরণ করতে দ্বিধা করি না, যথা- পিতামহ ও ভ্রাতার উপস্থিতকালে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে হাম্বলীদের মতের বিপরীত পিতামহকে আমরা ভ্রাতার চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করি।[২৪৭]

শায়খের আকীদা

আকীদা সম্পর্কে এটাই বলা যায় যে, শায়খুল ইসলাম এ সম্বন্ধে "সলফ"দের মতের অনুসরণ করতেন। কুরআন মাজীদে এবং সহীহ হাদীসে আল্লাহর যে সমস্ত বিশেষণ উল্লিখিত হয়েছে তা হুবহু মেনে নেয়া এবং কৈফিয়তের প্রশ্ন না তুলেই তার প্রকাশ্য অর্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই হল "সলফ"দের মাযহাব।

আল্লাহর বিশেষণ সম্পর্কে মুসলমান আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের একদল সাদৃশ্য এবং তুলনা প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে বিশেষণেরই অস্বীকার করে দিয়েছিলেন। এটা আল্লাহকে অকেজো করারই নামান্তর মাত্র। পক্ষান্তরে, অপর দল বিশেষণ স্বীকার করেছেন এরূপে যে, এতে (অপরের সাথে) আল্লাহর সাদৃশ্য এবং তুল্য হওয়াই প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। এও যে সীমালংঘন করার নামান্তর তাতেও সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ আল্লাহর সত্ত্বা জড়ত্ব হতে পবিত্র। ইসলামী দর্শনবেত্তাদের একদল অর্থাৎ আশায়েরা কর্তৃক আল্লাহকে অকেজো (মোআত্তাল) এবং সাদৃশ্য করার অপরাধ হতে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর বিশেষণ (সেফাত) সম্বলিত আয়াত এবং হাদীসগুলোর জটিল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তারা "ইস্তাওয়া" (সমুন্নত) অর্থ ইস্তি'লা (অধিকারী হওয়া) করতে লাগলেন। অনরূপভাবে ইয়াদুল্লাহ (আল্লার হাত) অর্থ 'দান' এবং 'সামর্থ্য' করতে লাগলেন। "ফাইন্নাকা বেআয়ুনে না" (فإنك بأعيننا) অর্থে হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ গ্রহণ করা হল। কিন্তু "সলফ" এবং তাদের পদাংক

---

[২৪৭] আলুসী রচিত নজদের ইতিহাসের বরাতে ৪৫-৪৬ পৃ; সিয়ানাতুল ইনসান ৪৭১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

অনুসরণকারীরা এরূপ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। কারণ ব্যাখ্যাকারীদের এ ব্যাখ্যাই যে আল্লার উদ্দেশ্য তা সঠিকভাবে নির্ধারিত করার কোন প্রমাণ নেই। অধিকন্তু কোন আয়াত এং হাদীসের এরূপ হাস্যকর জটিল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, তা পাঠ করলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। ইবনে ফোরক (মৃঃ৪০৬ হিঃ) স্বীয় কিতাব "মুশকিলুল হাদীসে" এরূপ অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। সলফের মস্‌লক এটা হতে স্বতন্ত্র।

সলফে সালেহীন ইমামগণের মাযহাব ইমাম তাইমিয়ার ভাষায় এরূপ বর্ণনা করা যেতে পারেঃ-

আইম্ময়ে সলফ (পূর্ববর্তী ইমাম) গণের মত এই যে পরিবর্তন (تحريف) অকেজো (تعطيل) অবস্থাবিশিষ্ট (تكييف) এবং তুলনায় (تمثيل) লেশমাত্র আঁচড় না লাগিয়েও আমরা আল্লাহকে সেই সমস্ত বিশেষণে বিভূষিত করতে পারি, যদ্দ্বারা তিনি নিজেকে বিভূষিত করেছেন এবং তাঁর রাসলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুরূপ করেছেন। আল্লাহর সেই সমস্ত সেফাতের নফী করা (অস্বীকার) জায়েয নয় যদ্দ্বারা তিনি নিজেকে বিভূষিত করেছেন এবং সেই সেফাতগুলোকে তাঁর সৃষ্টির কোন সেফাতের সাথে কোনরূপ তুলনা করা ও তশবীহ্ দেয়াও জায়েয নয়। বস্তুতঃ তিনি এ সমস্ত হতে অতি পবিত্র। তাঁর অনুরূপ কেউই নেই, সত্ত্বায় নেই, বিশেষণেও নেই, তিনি তুলনাহীন। পূববর্তীদের মাযহাব এ সম্পর্কে উপরোক্ত মাযহাবদ্বয়ের মাঝখানে এবং উভয় ভ্রষ্টতার মধ্যে এটাই সংযত মধ্যম পন্থা অর্থাৎ সেফাতকে যথাযথভাবে স্বীকার করা এবং সমগ্র সৃষ্টির সাথে তুলনা অস্বীকার করা।[২৪৮]

ফলকথা, সলফের (পূর্ববর্তীদের মসলক স্বীকৃতি এবং অস্বীকৃতির (إثبات ونفي كے درميان) মধ্যে মধ্যম পন্থা। তাঁর "ইয়াদ" বা "আইন" প্রভৃতির কোনরূপ তাবীল (ব্যাখ্যা) করেন না বরং তার বাহ্যিক রূপেই তাঁরা ছিলেন বিশ্বাসী। কিন্তু সাদৃশ্যের অস্বীকৃতির সঙ্গে আল্লাহর সেফাতের "ইয়াদ" ও "আইনের" এরূপ অর্থও গ্রহণ করা যাবে না যা মানুষের ব্যাপারে করা হয়ে থাকে। আল্লাহ রূপ ও জড়ত্ব (كيفيت وجسميت)

---

[২৪৮] আল ইন্তেকাদ- জিলাউল আইনাইনের টীকায়, ২০৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

হতে পবিত্র। উক্ত সিরারে মূল অর্থ আল্লাহই জ্ঞাত আছেন। আর বিনা দ্বিধায় সে সম্পর্কে ঈমান আনাই আমাদের দায়িত্ব। মদীনার ইমাম হযরত মালেক বিন আনাসের (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বিখ্যাত উক্তি সলফদের মতের অতি সুন্দর পরিচয় দিয়েছে। তিনি বলতেন।[২৪৯]

الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسوال عنه بدعة

"ইস্তিওয়া" অপরিচিত নয় এবং কাইফিয়ত অবোধগম্য ও তৎপ্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজেব এবং তার তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআৎ। উপরে যে মতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা শুধু হাম্বলী অথবা ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবেরই মত নয় বরং পূর্ববর্তী সমস্ত ইমামের এ একই মত ছিল। তশবীহ ও তজসীমের নফীর সঙ্গে সঙ্গে তাবীল হতে মুক্ত থাকাই (الإمساك عن التاويل مطلقت مع نفي التشبه والتجسيم) সলফের মসলক ছিল। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহ্মদ শাফেয়ী; মোহাম্মদ বিন হাসান, সা'দ বিন মা'আজ মরওয়াজী, আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক, সুফয়ান সওরী, ইমাম বুখারী, তিরমিযী এবং আবু দাউদ সিজিস্তানী প্রভৃতি এ মতই পোষণ করতেন।[২৫০]

পরবর্তীকালে ইমাম আবুল হাসান আশআরীও এ মত গ্রহণ করে তাঁর পূর্বমত পরিত্যাগ করেছিলেন। ইমামুল হারামায়নও এটি সমর্থন করেছেন। সমস্ত সাহাবী এবং তাবেয়ীদেরও এটাই মত ছিল। যুক্তিবাদের বিকাশ সাধনের পরই ব্যাখ্যা বা তাবীলের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল।

পববর্তী আশায়েরা এবং সাধারণ আলেমগণের মত তাবীল বা ব্যাখ্যার পক্ষেই ছিল। মাদরাসাসমূহে প্রচলিত যে সমস্ত আকায়েদের কেতাবের পঠন ও পাঠন চলছে তা পরবর্তীদের মতেরই অনুশীলন মাত্র। তার অন্যান্য ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। পরবর্তীদের গৃহীত ব্যাখ্যাই যে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য তা নিরূপণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অতএর এর যখন নিশ্চয়তা নেই তখন এ মত গ্রহণ করে আমরা সংশয়ের

---

[২৪৯] জিলাউল আইনয়ানেঃ ২১২ পৃষ্ঠা।

[২৫০] জিলাউল আইনয়ানেঃ ২২৯ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

Contents

সম্মুখীন হব কেন? সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পথ হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তীদের ন্যায় আমরাও শরীয়তে (কুরআন ও হাদীসে) উল্লিখিত সিফাতকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা না করেই বিশ্বাস করি। এটাই পূর্ববর্তীদিগের অভিমত এবং তওহীদ ও সুন্নতের বাস্তব অনুসারীরা এখনও এতেই বিশ্বাসী। শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তাঁর অনুসারীরাও এ আকিদাই পোষণ করতেনঃ-

وبالجلمة فعقيدتها في جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة عقيدة أهل السنة والجماعة نؤمن بها ونمر بها كما جائت مع إثبات حقائقها وسادلت عليه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تبديل ولا تاويل الخ

ফলকথা এই যে, আল্লাহর যে সমস্ত সিফাত (বিশেষণ) কুরআন ও হাদীসে প্রতিপন্ন হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের আকীদা সুন্নত আল জমাআতের অনুরূপ। আমরা তাতে বিশ্বাস করি এবং তার তত্ত্ব আবিষ্কারের পণ্ডশ্রম আমরা করি না। তার বাহ্যিক অর্থ ও প্রকৃত রূপের সম্পূর্ণ অকেজো করা অথবা তাতে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন না করেই আমরা তা বিশ্বাস করি।[২৫১]

(আল্লাহর) বিশেষণ সম্বলিত আয়াত সম্পর্কে সলফ বা পূর্ববর্তী ইমামদের অভিমত সুস্পষ্ট। উপরে তারই কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে। শায়খুল ইসলাম সলফের অনুরূপ আকিদাই রাখতেন।

প্রাথমিক যুগের পর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (মৃঃ ৭২৮ হিঃ) চেয়ে অধিক দুর্ভোগ অন্য কেউ ভুগেছেন কিনা সন্দেহ। আশায়েরা এবং ইসলামী দর্শনবেত্তাদের কল্পনাসমূহ মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে এরূপ আচ্ছন্ন করেছিল যে, সাধারণ লোকের নিকট সত্য মতই অজ্ঞ এবং স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের মতবাদরূপেই পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ন্যায় শায়খুল ইসলাম ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবও সলফদের আকীদার উপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আলুসী স্বীয় "জিলাউল আইনায়নে ফীমহাকেমাতিল আহমদায়নে" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত

---

[২৫১] আলহাদীয়াতুস্ সানীয়াহঃ ৯৯ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

আলোচনা করেছেন। তাতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে জাওযী (মৃঃ ৬৪৪ হিঃ) শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (মৃঃ৫৬৫ হিঃ) এবং স্বয়ং ইমাম হাসান আশআরীর (মৃঃ ৩৩৪ হিঃ) গ্রন্থসমূহ হতে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

তৌহীদ ও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ

শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব তাঁর রচনাবলীতে তওহীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বরং এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর গ্রন্থসমূহ শুধু তওহীদের বিবরণেই পরিপূর্ণ। তিনি তওহীদেরই আহ্বান দিয়েছিলেন। তার দা'ওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। তিনি সকলকেই এ কালেমার অর্থই বুঝাইতেন এবং এর প্রকৃত তাৎপর্য প্রত্যেকের মনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন। এ জন্য তাঁর অনুসারীগণ মোআহ্হেদীন নামেও অভিহিত হতেন। তওহীদ কি? শুধু আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য বলে স্বীকার করা। বস্তুতঃ কথাটি অতি সাধারণ কিন্তু শয়তানের চাতুরী অতি প্রশস্ত ও কঠোর। এক আল্লাহর উপসনাকারীদের দ্বারা সে এরূপ কাজও করিয়ে থাকে যাতে তারা শির্কের মহাপাতকে পতিত হতে বাধ্য হয়। খালিস তওহীদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে এই যে, এরূপ সমস্ত কর্মপদ্ধতি, আচরণ এবং উক্তিসমূহ পরিত্যাগ করা একান্ত উচিত যাতে আল্লাহর সাথে অপরের শরীক হওয়ার লেশমাত্র সন্দেহও হয়ে থাকে বা হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব উপরোক্ত ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা করতেও ত্রুটি করেননি। সেই সমস্তের অপকারিতা এবং ক্ষতিজনক অবস্থা সুস্পষ্টভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। অধিকন্তু যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে এবং যে পথে তা মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে থাকে, তিনি তাও বন্ধ করার সর্ব প্রকার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যে জাতি বিশ্ব মানবের জন্য তওহীদের পয়গাম নিয়ে উত্থান করেছিল, পরবর্তী যুগে সেই জাতিই কবর পূজা, তা'জিয়া পরস্তী এবং অনুরূপ বিভিন্ন ধরণের পূজা-পর্বে এরূপ লিপ্ত হয়ে গেল যে, যখন দীর্ঘদিন পর তাদের কানে তৌহীদের নূতন বাণী ধ্বনিত হল, তখন তারা একে সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব বস্তু বলে অভিহিত করল। কেতাব ও সুন্নতের পেশকৃত প্রমাণগুলোর কদর্থ ও অপব্যাখ্যা করল এবং স্বয়ং

http://www.shottanneshi.com

তওহীদের পতাকাধারীদেরকে "ওয়াহ্হাবী, মুশরিক, খারেজী এবং অন্যান্য বিভিন্ন মাযহাবী ভর্ৎসনায় আখ্যায়িত করা হল। শায়খুল ইসলামের সমস্ত অপরাধ শুধ এটাই যে, তিনি সুস্পষ্টভাবে খাঁটি তওহীদের আহবান জানিয়েছিলেন, শিরক এবং তার অপকারিতা হতে আত্মরক্ষা করার কঠোর তাকিদ করেছিলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অপর উপাস্যদের নিন্দা করেছিলেন। যদি বাস্তবে এটি অপরাধ এবং দোষের কারণ হয়ে থাকে তবে প্রত্যেক মুসলমানের নিষ্ঠাসহকারে সর্বান্তঃকরণে এ অপরাধে অপরাধী এবং দোষী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমরা নিম্নে অতি সরল ভাষায় সেই সমস্ত নির্দিষ্ট কতিপয় আচরণের উল্লেখ করছি, যা শায়খুল ইসলাম বরং সমস্ত আহলে সুন্নতের আকীদা ও মতে তওহীদ হতে মানুষকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং শির্কের নিকটবর্তী করে দেয়ঃ-

১। বিপদ আপদের সময় আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আহ্বান করা অথবা আল্লাহর সাথে অপরের নামও উচ্চারণ করা

বর্তমানে সাধারণভাবে অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা শিক্ষিত "খোশ আকীদার" লোকেরা সাধারণতঃ ইয়া রেফায়ী, ইয়া আবদুল কাদের জিলানী, (আমাদের দেশে শাহ্ ফরিদ, বাবা চরকি শাহ্ প্রভৃতি, অথবা হে দাতা পীর বহুড়ী, হে মাখদুম, হে খাযা মাঈনুদ্দীন চিশতী, হে খাযা বাবা ইত্যাদি অথবা সাধারণভাবে ক্লান্তির সময় আল্লাহ রসূল বলে বিপদের সময় স্মরণ করে থাকে, এটা শির্কের গন্ধ হতে বিমুক্ত নয়। এরূপ দো'য়াতে ইবাদতের আলোচ্ছটা প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। উচ্চারণকারীর নিয়ত এবং যাকে আহ্বান করা হচ্ছে তার মর্যাদা সম্পর্কে কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। আহ্বানকারীর নিয়তে এবাদত অথবা শির্ক নাও হতে পারে। কিন্তু একজন সৃষ্টি অপর সৃষ্টিকে বিপদের সময় আহ্বান করবে এবং তার নিকট বিপদমুক্তি কামনা করবে এটি তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ইসলাম ধর্মে এর কোনরূপ গুন্জায়েশ নেই।

এই অবস্থায় গায়রুল্লাহকে যে ব্যক্তি আহ্বান করে সে যদি নিরেট মূর্খ ও অশিক্ষিত হয় তবে শায়খুল ইসলাম এবং তাঁর অনুসারীরা তাকে এরূপ সৎপথ প্রদর্শন করেন যাতে সে ভবিষ্যতে তা পরিত্যাগ করে, তজ্জন্য তাঁরা

http://www.shottanneshi.com

তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞাতসারে এরূপ করে তাদেরকে তাঁরা মুশরিক বলে বিশ্বাস করেন। তাদের সাথে কোনরূপ আপোষ করতে এবং তাদের সাথে কোনরূপ সহানুভূতি করতেও তাঁরা প্রস্তুত নন। কুরআন মাজীদের নিম্ন আয়াত দ্বারা তাঁরা প্রমাণ গ্রহণ করে থাকেনঃ-

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۚ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝

অর্থৎ আল্লাহ ব্যতীত আর যা কিছুকে ডেকে থাক তোমরা, কোনও একটা নগণ্যতম পদার্থেরও অধিকারী নয় তারা, তোমরা ডাকলে তোমাদের ডাকও শুনবেনা তারা, আর কেউ শুনলেও তোমাদের ডাকে আদৌ সাড়া দিবে না তারা, অধিকন্তু কেয়ামতের দিন তোমাদের শির্ককে অস্বীকার করবে তারা, সেই সমস্ত বিষয়ে খবরদার (মা'বূদ ব্যতীত) অন্য কেউই তোমাকে জানাতে পারে না। (সূরা ফাতের ১৩-১৪)

২। গায়রুল্লার নিকট প্রার্থনা করাঃ এও আল্লাহ ব্যতীত অপরকে ডাকার পর্যায়ভুক্ত। আবু ইয়াজিদ বিস্তামী বলেছেন-

استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون المسجون

এক সৃষ্টির অপর সৃষ্টির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা একজন কয়েদীর অপর কয়েদীর নিকট সাহায্য প্রর্থনা করার তুল্য।[২৫২]

তবরাণীর একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন-

(إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى

আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয নয় বরং শুধু আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।[২৫৩]

ফলকথা এই যে, আল্লাহ ব্যতীত জীবিত অথবা মৃত কারও নিকট সাহায্য প্রর্থনা করা হারাম, ইসলামী তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

[২৫২] জিলাউল আইনায়ন, ২১২ পৃষ্ঠা।
[২৫৩] জিলাউল আইনায়ন, ৩১৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

৩। তাওস্সুলঃ এটি তিন প্রকার হতে পারেঃ (ক) রসূলুল্লাহর অনুসরণের অসীলা (মাধ্যম) গ্রহণ করা। এটি অপরিহার্য্য। এ ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হতে পারে না।

(খ) রসূলুল্লাহর দোয়া ও সুফারিশের অসীলা- এটি হযরতের জীবদ্দশায়ই সম্ভব ছিল এবং কেয়ামত দিবসে তার প্রয়োজন হবে যখন সমগ্র সৃষ্টিই রসূলুল্লার সুফারিশ কামনা করিবে।

(গ) তৃতীয় অসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ পদ্ধতি এই যে, যাতে আল্লাহর সম্মুখে নবী এবং সৎ ব্যক্তিদেরকে মাধ্যম হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে। সাহাবাগণ রসূলের দ্বারা তাঁর জীবিতকালে এরূপ করতেন কিন্তু হযরতের ইন্তেকালের পর তাঁরা এরূপ করেননি। পানির জন্য প্রার্থনাকলেও না, কবরের নিকট অথবা দূরেও এরূপ করেননি। সাহাবাগণ কোন সময় এরূপ শরীয়ত বিগর্হিত অসীলা গ্রহণ করেননি। করার কোন প্রমাণও নেই। দোয়ায়ে মাসুরাতেও এরূপ অসীলার কোন উল্লেখ নেই।

অসীলা বা মধ্যস্থতা গ্রহণের উল্লিখিত তিনটি রূপই আছে। তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ রসূলুল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর অনুসরণের অসীলা গ্রহণ করা সর্বকালেই শরীয়তসম্মত ও অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় ধারাটি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর দোয়া এবং সুফারিশের (তাঁর ব্যক্তিত্বের নয়) অসীলা গ্রহণ করা রসূলুল্লাহর জীবদ্দশাতেই মঙ্গলজনক ও জায়েয ছিল। কিন্তু তাঁর ইন্তে কালের পর এও অসম্ভব হয়ে গেছে। কবরের উপর সালাম করা এবং কবরবাসীদের সম্বোধন করে "আসসালামু আলাইকুম" বলা শরীয়তে প্রতিপন্ন রয়েছে। কিন্তু মৃত অথবা অদৃশ্যের নিকট দোয়া ও প্রার্থনার আবেদন করা বিদ'আৎ। এ কারণেই হযরত ওমর বিন খাত্তাব সাহাবাগণের এক মহতী সমাবেশে বলেছেন-

اللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا تَوَسَّلْنَا إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا

হে আল্লাহ! অনাবৃষ্টির সময় আমরা তোমার নিকট নবী করীমের অসীলা গ্রহণ করতাম আর তুমি আমাদেরকে পানি দান করতে এবং আমরা (এখন) তোমার নিকট আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিতৃব্যের অসীলা গ্রহণ করছি। অতএব তাঁর অসীলায় আমাদেরকে পানি দান কর।[২৫৪] [প্রকাশ থাকে যে, সাহাবাদের কেউ এতে অসম্মতি প্রকাশ করেননি]।

---

[২৫৪] মিশকাতুল মাসাবীহঃ ইসতিসকা অধ্যায়।

http://www.shottanneshi.com

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র ইন্তেকালের পর হযরত আব্বাসের অসীলা গ্রহণ করা অমূলক হতে পারে না। কেননা এ অসীলা গ্রহণ করা দোয়া কামনার জন্যই ছিল এবং ইন্তেকালের পর দোয়া কামনা সম্ভবপর নয়। সুতরাং হযরত ওমর ফারুক রসূলুল্লাহর পিতৃব্যের অসীলা গ্রহণ করেছিলেন, (অর্থাৎ দোয়া কামনার জন্য)।

অবশিষ্ট তৃতীয় অসীলা যাতে নবীগণ অথবা সদাচরণশীলদের অসীলা গ্রহণ করা হয়ে থাকে অথবা আল্লাহকে অলী এবং সৎলোকদের কছম (শপথ) দেয়া হয়। যেমন কেউ বলে (اسئلك بجاه عبدك أو بحرمته) অমুকের সম্মান এবং প্রতাপের মাধ্যমে আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। এতে আলেমগণের মতবিরোধ ঘটেছে। হাম্বলীদের নিকট সহীহ রেওয়ায়াত অনুসারে এটা মকরূহে তাহ্রিমী (হারামের নিকটবর্তী)। ইমাম আবু হানীফা এবং অন্যান্য হাম্বলী ফকীহগণও এ মত পোষণ করেন। নবী ও আলেমগণ অথবা পবিত্র স্থানের হকের অসীলা গ্রহণ করে দোয়া কামনা করা হানাফীদের নিকটও মাকরূহে তাহরিমী।

لا حق للمخلوق على الخالق ('লা হাক্কা লিলমাখলুকে আলাল খালিকে - কোন সৃষ্টির স্রষ্টার উপর "হক" বা দাবী নেই) দ্বারা তাঁরা প্রমাণ গ্রহণ করে থাকেন এবং এটাই সহীহ মত। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতও এটাই বর্ণিত হয়েছে। শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তাঁর অনুসারীরাও এ সত্যের অনুসরণ করতেন। তাঁরা কোন নবী, অলী প্রভৃতির ব্যক্তিত্বের অসীলা গহণ করা জায়েয মনে করতেন না। এটা তাদের কোন অভিনব মত ছিল না।

হানাফী ও হাম্বলীদের সকলেরই এই- একই মত ও পথ ছিল। পূর্ববর্তী মোহাক্কেক আলেমগণের মধ্যে শায়খ ইয্যুদ্দীন আবদুস্ সালাম (মৃঃ ৬৬০ হিঃ) একমাত্র রসূলুল্লার পবিত্র সত্তার অসীলা গ্রহণ করা জায়েয বলতেন।[২৫৫] তাঁর মতেঃ-

اللّٰهُمَّ إني اتوسل إليك بنبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم

اللّٰهُمَّ إني اسئلك بجاه صفيك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

---

[২৫৫] এও শুধু যদি হাদীস বিশুদ্ধ হয় এ শর্তে তিনি জায়েয বলতেন। -আদদুরুন নযীদ, ৬ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

আল্লাহুম্মা ইন্নি আতাওয়াসসালু ইলাইকা বেনবীইকা ওয়া হাবিবেকা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বেজাহে সাফিইয়েকা ওয়া নবীয়েকা মোহাম্মাদিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলা জায়েয। রসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহাত্ম্য এবং উন্নত মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে শায়খ ইয্যদ্দিনের ন্যায় অভিজ্ঞ আলেমেরও টলমল হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। তবে রসূল ব্যতিত অপর অলী এবং সৎব্যক্তিদের অসীলা গ্রহণের জায়েয হওয়া কারও নিকট হতে বর্ণিত হয়নি। পরবর্তীদের মধ্যে কেউ কেউ এর জায়েয হওয়া প্রমাণিত করা চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু এটা একটা অপচেষ্টাই হয়েছে, এর কোন প্রমাণ নেই।[২৫৬] এতে শুধু একটি অমূলক এবং সন্দেহজনক রসম প্রচলিত করার চেষ্টাই করা হয়েছে। এতে অনর্থক বিদআতের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে মাত্র।

এখানে শুধু শায়খুল ইসলামের মসলক ব্যাখ্যা করাই উদ্দেশ্য। বিবরণের ফেক্হী পর্যালোচনার গুন্জায়েশ এখানে নেই। প্রমাণ-পঞ্জীর বিবরণের মধ্যে এসম্পর্কীয় বিভিন্ন কিতাবের উল্লেখ কর হবে "আত্তা ওয়াস্সুল ওয়াল অসীলাহ্" ছাড়াও ইমাম ইবনে তাইহিয়ার ফাতাওয়া ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহও এ সব আলোচনায় পরিপূর্ণ রয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনার সারমর্মের জন্য জিলাউল আইনাইনে (৩১৫-৩৬৯ পৃষ্ঠা) দ্বারা উপকৃত হওয়া যেতে পারে।

৪। ইস্তেআযাহ্ঃ আল্লাহ, তাঁর পবিত্র নাম এবং বিশেষণ ছাড়া অন্য কোন মখলুকের (সৃষ্টির) আশ্রয় হতে বিরত থাকাই হচ্ছে তওহীদের অপরিহার্য চাহিদা। এ কারণেই আহ্লে সুন্নতের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কুরআন মজীদের কালামে এলাহী (এবং অসৃষ্ট হওয়ার প্রতি নিম্নবর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন-

(أعوذ بكلمات الله التامات) আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতে। অর্থাৎ যদি আল্লাহর কালাম সৃষ্ট হত তবে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কালেমাতিল্লাহ বা অসৃষ্ট বস্তুর সাহায্যে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন না। অর্থাৎ সেই সময়

---

[২৫৬] হিন্দুস্থানে মওলানা ইসমাঈল শহীদ (শঃ১২৪৬ হিঃ) এবং অধিকাংশ দেওবন্দী আলেম অলী এবং সৎ-ব্যক্তিদের দ্বারা অসীলা গ্রহণকে জায়েয বলেছেন। কিন্তু লেখকের মন তা স্বীকার করতে অস্বীকার করে।

http://www.shottanneshi.com

সৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণের অবৈধতা সর্বজনস্বীকৃত মত ছিল, অন্যথায় বিরোধীরা অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতেন। স্বয়ং কুরআন মজীদে আল্লাতায়ালা গায়রুল্লার আশ্রয় গ্রহণের জন্য গণকদের নিন্দা করেছেন–

وَّأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

অর্থাৎঃ- বস্তুতঃ মানুষের একটি দল ছিল যারা জীনের আশ্রয় গ্রহণ করত, ফলে তাদের (জ্বীনদের) অবাধ্যতা আরও বেড়ে গেল।

এই জন্যই শায়খুল ইসলাম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বুরদার[২৫৭] নিম্নবর্ণিত কবিতায় আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কবিতাটি এইঃ-

[يا أكرم الخلق مالي من الوذبه – سواك عند حلول الحادث الجسم]

[হে সৃষ্টির সেরা (রসূল!) গুরুতর বিপদকালে তুমি ছাড়া আশ্রয় গ্রহণের আমার অন্য কেউ নেই। অনুবাদক]। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, (ما لي من الوذ به) আমার তুমি ব্যতীত আশ্রয় গ্রহণের অন্য কেউ নেই) শুধু আল্লাহ সম্পর্কেই বলা যেতে পারে। আল্লামা শওকানীও এ কবিতায় আপত্তি করেছেন। অথচ তিনি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ শিথিল ছিলেন।[২৫৮]

৫। আল্লাহ ছাড়া অপরের কসম খাওয়া

গায়রুল্লার কসম খাওয়াও তওহীদের বিপরীত। এতে আলেম সমাজের সকলেই একমত। কারও এতে বিরোধ নেই।

কিন্তু সাধারণ লোক বরং এক শ্রেণীর তথাকথিত আলেমরাও বর্তমানে এ মহা ব্যাধিতে আক্রান্ত। সমগ্র মুসলিম এলাকায় নবীগণের এবং আউলিয়াগণের শপথ গ্রহণ ব্যাপকভাবে চলছে। এরূপ ব্যাপক হয়ে পড়েছে যে, যদি আপনি কাকেও এ হতে নিষেধ করেন তবে আপনার উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে উল্টা আপনার উপর বেদীন হওয়ার অথবা কমপক্ষে ওয়াহ্হাবী হওয়ার 'অপবাদ' অবশ্যই আরোপ করেই ছাড়বে। অথচ তিরমিযী শরীফের হাদীসে (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) গায়রুল্লার নামে শপথ করাকে শির্ক বলা হয়েছে।

---

[২৫৭] বোহাইরা কর্তৃক বিরচিত বিখ্যাত না'তীয়া কসীদাহ যা কোন কোন সুফী সাধক একে তাঁর অযীফার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

[২৫৮] আদ্দুররুন নযীদ, ২৯ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

অর্থাৎ মান হালাফা বেগায়রিল্লাহে ফাক্কাদ আশরাকা, অর্থাৎ "যে আল্লাহ ছাড়া অপরের কসম খেল, বস্তুতঃ সে শির্ক করল) এর চেয়ে কঠোর নিষেধ আর কী হতে পারে!

এই মূলনীতির ফলেই ইমাম আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন–

لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به واكره أن يقول بمعالد العز من عرشك أو بحق خلقك

বস্তুত ইমাম আবূ হানীফার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মতেও আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও শপথ গ্রহণ অথবা দোহাই দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তবে ইমাম আবু ইউসূফ "বেমোআকেদীল ইয্যে মিন আরশেকা" বলা জায়েয মনে করেন। কারণ আরশের সম্মানের আসনের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এবং এর দ্বারা আল্লাহ্ই উদ্দেশ্য হতে পারেন। পক্ষান্তরে, ইমাম আবু হানীফা একে মকরূহ মনে করেন। এ ছাড়া 'বেহাক্কে ফলানা' বলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা সকলের মতেই মকরূহে তাহরিমী বা হারাম- যেমন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গায়রুল্লাহ নিকট দোয়া করা, গায়রুল্লার সাহায্য কামনা করা, নবীগণের অসীলা গ্রহণ ইস্তেয়াযাহ্, হলফ বিগায়রিল্লাহ্ প্রভৃতি সকল শব্দই একই পর্যায়ভুক্ত। এতে শির্কের বীজানু নিহিত রয়েছে। এটা খাঁটি তওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ জন্যই এ সমস্ত অহমপরস্তী বা কল্পনা-বিলাসিতা খাঁটি ধর্মে কখনও জায়েয হতে পারে না। মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের অপরাধ শুধু এটাই ছিল যে, তিনি উপরোল্লিখিত শরিয়ত বিহর্গিত কাজ হতে মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে দমন করেছিলেন এবং কমপক্ষে পৃথিবীর একটি অংশে সাধারণ লোকদেরকেও এর পাবন্দ করতে তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন।

৬। কবর যিয়ারত

যিয়ারত শরীয়ত-সিদ্ধ (মশ্রূ') হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু শর্ত এই যে, তাতে যেন শরীয়তের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত না হয়। মুসলমানদের পক্ষে নবীগণ, সৎব্যক্তিগণ, সাধারণ মুসলমানগণ এমনকি অমুসলমানের কবরও যিয়ারত করা জায়েয আছে শুধু সেই সমস্ত লোকের জন্য যারা তা দ্বারা উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক। বিশেষতঃ

http://www.shottanneshi.com

মুসলমানদের কবর জিয়ারত করা সুন্নত। এ সম্পর্কে শরীয়তে উদ্বুদ্ধ হয়েছে- যারা তাদের জন্য দোয়া করতে চান।

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তাঁর অনুসারীরা কবর যিয়ারত করা অস্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁরা সেই সমস্ত বিদআতের কঠোর বিরোধী যা সাধারণতঃ কবরের নিকট অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যারা কবরের নিকট দোয়া প্রার্থনা করে, মনস্কামনা পূর্ণ করার আবেদর জানায়, দোয়া এবং সুপারিশ কামনা করে, তাদেরকে শায়খুল ইসলাম এবং তাঁর অনুসারীরা বাধা দেন।

বর্তমান কালে বাস্তবে কবর যিয়ারত তো হয়ই না বরং প্রত্যেক কবর বিদ'আত প্রসারিত করার আড্ডায় পরিণত হয়ে গেছে। কবরের অধিবাসীর নিকট দোয়া প্রার্থনা করা, তাঁর মাধ্যমে দোয়া করা অথবা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কবরের নিকট দাঁড়িয়ে নিজের জন্য দোয়া করা প্রভৃতি আদৌ জায়েয নয়। মোআহ্হিদীন এ সমস্ত শরীয়ত বিগর্হিত কার্যাবলী হতে বারণ করেন।

কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করা হাদীসে বারংবার নিষিদ্ধ হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের অনুসারীরা কবরের উপর নির্মিত কুব্বাসমূহ ভাঙ্গতে কোন দ্বিধাবোধ করেননি। শরীয়তের হুকুমের বিরুদ্ধে কবরগুলোকে প্রতিমার রূপ দেয়া হয়েছে। এটি একটি শরীয়ত-বিরুদ্ধ কাজ। সম্ভব হলে শক্তি প্রয়োগ করে তা বিদূরিত করার চেষ্টার ত্রুটি করা আদৌ উচিত নয়।

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের অনুসারী শাসনকর্তারাই সর্বপ্রথম কুব্বা ভাঙ্গার কাজে ব্রতী হননি বরং ইমাম শাফেয়ীর (১৫০-২০৪ হিঃ) যুগ (অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে) হতেই তা চলে আসছে। ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শাসনকর্তারা উঁচু কবরকে ভাঙ্গতেন অথচ আলেমগণ তাতে কোন আপত্তি করতেন না। ইমাম নববী মুসলিমের ভাষ্যেও ইমাম শাফেয়ীর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।[২৫৯] অনুরূপভাবে ইবনে হজর হায়সমীর (মৃঃ ৯৭৪ হিঃ)

---

[২৫৯] আলহাদীয়াতুসসানীয়াহ্; আল্লামা রশিদ রেজা (মৃঃ১৩৫৩ হিঃ) কৃত টীকা; ৪৯ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

'আযযওয়াজির গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে হজর ফকীহ আলেমদের এ উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন-

وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذا هي أضب من مسجد الضرار الخ

তারা বলেছেন- উঁচু কবর এবং তার উপর নির্মিত কুব্বাগুলোকে যথাশীঘ্র ভেঙ্গে দেয়া ওয়াজেব। কারণ এটা মসজিদ জেরার অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক।[২৬০]

উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে এ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব কোন নূতন দ্বীনের দা'ওয়াত (আহ্বান) দেননি এবং নতুন মাযহাবও আবিষ্কার করেননি। তিনি স্বয়ং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (মৃঃ ২৪১ হিঃ) মযহাবের অনুসারী ছিলেন।

তিনি শুধু কুরআন এবং হাদীসের আসল দা'ওয়াত পেশ করতেন। তিনি হানাফীদের খাঁটি হানাফী এবং শাফেয়ীদের প্রকৃত শাফেয়ী হবার আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমানে ইমাম শাফেয়ীর (মৃঃ ২০৪ হিজরী) কবরে যে আচরণ করা হচ্ছে তিনি কি কখনও তা বরদাশ্ত করতে পরিতেন? অন্যান্য ইমামদেরও এই একই অবস্থা। তাঁদের কেউই কোন বিদআতই জায়েয রাখতেন না, রাখতে পারেনও না।

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের অনুসারীরা মুসলমানদেরকে সেই সমস্ত বিদআত হতে বিরত থাকারই আহ্বান জানাতেন। যাকে বারংবার বুঝাবার পরও বিরত থাকেনি তাদের বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এ কঠোরতার জন্যই তাঁদেরকে কতই না ফেকহী গালি গালাজ করা হয়েছে; তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অসংখ্য অপবাদ রটানো হয়েছে। বক্ষ্যমান আলোচনায় শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী গালিগালাজ এবং অগণিত মিথ্যা অপবাদের উল্লেখ করা সম্ভবপর না হলেও আগামী অধ্যায়ে মিথ্যা অপবাদগুলোর কিঞ্চিত নমুনা পাঠকগণের সম্মুখে পেশ করার প্রয়াস পাব।

---

[২৬০] আযযওয়াজির (১) ১৬৩ পৃষ্ঠা। -মিশরে মুদ্রিত।

http://www.shottanneshi.com

পঞ্চম অধ্যায়

মিথ্যা বিবরণ ও অমূলক ভ্রান্ত অপবাদ

ওয়াহ্হাবীয়তঃ- শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের দা'ওয়াত সম্পর্কে যে সমস্ত ভ্রান্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভীষণ হচ্ছে এই যে, উক্ত দা'ওয়াতকে "ওয়াহ্হাবীয়ত" নামে আখ্যাত করা হয়। এরূপে স্বার্থপরায়ণেরা মুসলিম সমাজকে এ বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছে যে, তা ইসলাম হতে আলাদা একটি দ্বীন মাত্র। ইংরেজ, তুর্কী এবং মিশরীয়রা সমবেতভাবে তাঁকে এমন একটি জুজুবুড়িরূপে পেশ করল যে, বিগত দু' শতাব্দীতে ইসলাম জগতে যে কোন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তাতে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগার কোনরূপ আশংকা করেছে, তখনই তাকে নজদী ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে সন্নুসী আন্দোলন ব্যবহারিক বিষয়ে নজদীদের আন্দোলন হতে সম্পূর্ণ আলাদা বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তথাপি তাঁকে শায়খের দা'ওয়াতেরই অংশ বা পরিণাম বলে আখ্যাত করা হয় এ জন্য যে, সন্নুসী আন্দোলন ও তার সংগ্রাম প্রচেষ্টা ইটালির জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিপদ-সংকুল হয়ে রয়েছিল। পাক ভারতের "তজদীদ জিহাদ" আন্দোলনকে নজদী আন্দোলনের সাথে এরূপ ওতপ্রোতভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছিল যে, অপর তো দূরের কথা, নিজেদের লোকেরাও উভয় আন্দোলনকে এক বলে ধারণা করতে লেগে যায়।

উভয় আন্দোলনের মূল উৎসের (কিতাব ও সুন্নতের) এক হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্মপদ্ধতি এবং আন্দোলনের নীতির পার্থক্য সুস্পষ্ট। মূল উৎসের সাদৃশ্য সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য্য যে, হযরত আহমদ শহীদ (মৃঃ ১২৪৬ হিঃ ১৮৩১ খ্রীঃ) এবং মাওলানা ইসমাঈল শহীদের সংস্কার আন্দোলনের উপরে বাস্তবে নজদী দা'ওয়াতের কোন প্রভাব পড়েনি।[২৬১]

---

[২৬১] মৎপ্রণীত "হিন্দুস্থানে প্রথম ইসলামী আন্দোলন" এবং 'মওলানা সিন্ধীর চিন্তাধারার প্রতি এক দৃষ্টি'-তে এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যাবে।

http://www.shottanneshi.com

যা হোক ওয়াহ্বীয়তকে ইসলাম হতে সম্পূর্ণ আলাদা একটি মতবাদরূপে চালাবার যে হীন প্রচেষ্টা চালান হয়েছে, এ দিক দিয়ে এ ওয়াহ্হাবী নাম দেয়া অতি আপত্তিজনক। কিন্তু এই অপব্যাখ্যা ও অপবাদের দিক হতে চোখ ফিরিয়ে নিলে বাস্তবে সেই নামে কোন দোষই দৃষ্টিগোচর হবে না। এ সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও অহ্বায়ক মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের সাথে সম্পর্কিত করা হলে মূলতঃ তার অনুসারীগণকে "মোহাম্মদী" নামে আখ্যায়িত করাই উচিত ছিল। অবশ্য একথা অতি স্পষ্ট যে, এ রূপে আখ্যায়িত করলে বিদ্বেষপরায়ণদের উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব ছিল না। সুতরাং তারা এ জমাআতকে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা শায়খুল ইসলামের পিতা শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাবের নামে আখ্যায়িত করেছে- অথচ পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব তাঁর পুত্রের এ আন্দোলনের সহযোগিতা করা তো দূরের কথা, একে সুনজরে দেখতেও পারেননি। এবং এ নাম এরূপেই খ্যাতি লাভ করে গেছে। অধিকন্তু এ খ্যাতি অর্জনের ফলে বহু ঐতিহাসিক ও জীবনী রচয়িতাগণ কর্তৃক এ আন্দোলনের সর্বময় কৃতিত্ব শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাবের উপর অর্পণ করতেও দ্বিধা করেননি।

উদাহরণ স্বরূপ মিঃ হারফোর্ড জুইস ব্রাইজিস A Brief History of the Wahhabys গ্রন্থের P. P.134 পাঠ করা উচিত।[২৬২]

এই ভদ্রলোক মিঃ বাইজিস (Brydges) নিজের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এও লিখেছেন যে, এ আন্দোলনের প্রবর্তক আবদুল ওয়াহ্হাবের পুত্র শায়খ মোহাম্মদ অন্ধ ছিলেন। -১৩৪ পৃষ্ঠা; একে বলা হয় ভ্রান্ত ধারণার উপর অপর ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি স্থাপন। অথচ বাস্তব কথা এই যে, শায়খ মোহাম্মদের জ্যেষ্ঠপুত্র হোসাইন বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (মৃঃ ১২২৪ হিঃ) অন্ধ ছিলেন। পাক ভারতের মুজাহিদগণের পরম হিতৈষী W.W. হান্টারও এ ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন।

---

[২৬২] ব্রাইজিস বার্কহার্ট সব কিছু গ্রহণ করেছেন, তিনিও আবদুল ওয়াহ্হাবকেই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বলেছেন (২১-৯৬) পৃষ্ঠা। তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বনু আমীম গোত্রের একটি শাখাকেও ওয়াহ্হাবী বলে আবিষ্কার করে ফেলেছেন, ৯৭ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

যা হোক, এ দু'জন লেখকই এ ব্যাপারে একা নন। ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিবানদের পূরা একটি দলই এ ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন।

আববের পল্লীতে ভ্রমণকারী পাশ্চাত্যের পর্যটকদের অগ্রণী নৈবুরও[২৬৩] তাঁর সফরনামায় এ জমআতের প্রবর্ত্তকের নাম আবদুল ওয়াহ্হাবই লিখেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, বর্তমানে তাঁর ছেলে মোহাম্মদ স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, নৈবুর সাহেব ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ শায়খ মোহাম্মদের মৃত্যুর (১৭৯২ খ্রীঃ) দীর্ঘ ২৮ বৎসর পূর্বে) আরবে ছিলেন, কিন্তু বাস্তব ঘটনা অবগত হওয়ার জন্য তিনি একটুও চেষ্টা করেননি বলে মনে হয়।

এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ভ্রম ঘটেছে খৃষ্টান প্রচারকদের অগ্রনায়ক পাদরী যোয়ায়মীর সাহেবের। সাধারণ খ্যাতি অনুসারে তিনিও ওয়াহ্হাবী এবং ওয়াহ্হাবীয়তকে আলাদা দীন অথবা মাযহাব ভেবেছেন। অতঃপর তিনি ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের (মৃঃ ৭৫১ হিঃ) চিন্তাধারাকেও ওয়াহ্হাবীদের সাথে মিলিত ভেবে হঠাৎ প্রশ্ন জুড়ে দিয়েছেন যে, "দেখ ইনিও ওয়াহ্হাবী অথচ নিজেকে হাম্বলী বলে থাকেন।"[২৬৪]

কিন্তু এ বেচারা এতটুকুও অবগত নয় যে, ওয়াহ্হাবীয়তের পরিভাষা ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর আবিস্কৃত বা প্রচলিত হয়েছে।

সর্বপ্রথম এ নাম কে বা কারা আবিষ্কার করেছে, যদিও আমাদের নিকট এর কোন সঠিক প্রমাণ নেই, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, শায়খুল ইসলামের জীবিতকালেই তাঁর বিরোধীরা এ নাম আবিষ্কার করেছিল। মিঃ মার্গোলিয়তও[২৬৫] এ মত ব্যক্ত করেছেন যদিও তিনি এসম্পর্কে সনদ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নন। কিন্তু অন্যান্য কারণও এর সপক্ষে রয়েছে।[২৬৬] শায়খুল ইসলামের সম্ভবতঃ সমসাময়িক মুল্লা ইমরান

---

[২৬৩] ১৩১-৩ পৃষ্ঠা।

[২৬৪] আলমুকতাতফ (২৭) ২৯৫ পৃষ্ঠা।

[২৬৫] ওয়াহ্হাবীয়ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[২৬৬] দাউদ বাগদাদী (মৃঃ হিঃ ১২৯৯-১৮৮২ খ্রীঃ) স্বীয় 'সুলহুল ইখওয়ানে'ও এ মত ব্যক্ত করেছেন, Notes on Mohammadanism ২১৯ পৃষ্ঠার বরাতে।

http://www.shottanneshi.com

Contents

বিন রেযওয়ান[২৬৭] তার স্বরচিত একটি কবিতায় এ নামের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-

(إن كان تابع أحمد متوهبا – فإنا المقر بأنني وهابي)

(ইন কানা তাবেউ আহমাদা মুতাওয়াহ্হাবান ফাআনাল মুকেররু বেআন্নানী ওয়াহ্হাবী)।

আল্লাহর রসূল আহমদের (দঃ) অনুসরণই যদি ওয়াহ্হাবী নামের কারণ হয়ে থাকে তবে আমি স্বীকার করছি যে, আমি ওয়াহ্হাবী।

জনৈক মিসরীয় সমসাময়িকেরও[২৬৮] মত এই যে, এ নাম বিরোধীরা প্রাথমিক যুদ্ধের সময়েই ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল।

শায়খুল ইসলামের পাশ্চাত্য সমসাময়িক নৈবুর[২৬৯] ওয়াহ্হাবিয়াতের পরিভাষা ব্যবহার করেননি। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, সে সময় (১৭৬৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত ওয়াহ্হাবিয়ত শব্দের প্রচলন ছিল না। কিন্তু তিনি শায়খের দাওয়াতকে নূতন ধর্মমত (New Religion) বলে আখ্যাত করেন। অবশ্য তিনি পরিশেষে আবদুল ওয়াহ্হাবের নূতন মাযহাবকে মোহাম্মদীয়তের পরিভাষায়ও উল্লেখ করেছেন।[২৭০] শায়খুল ইসলামের ইন্তেকালের কিছু দিন পর অপর দুই জন পর্যটক আলী বেগ আব্বাসী বাদিয়া এবং বার্কহার্ট যথাক্রমে ১৮০৭ এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব ভূমি পর্যটন করেন। তারাও নজদী আন্দোলন এবং শায়খের দা'ওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলি বেগ আব্বাসী বাদিয়ায় পর্যটন ছিল মিসরীয়দের হেজায অধিকারের পূর্বে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তার সফরনামা আমাদের হস্তগত হয়নি, নতুবা তিনি ওয়াহ্হাবী শব্দ ব্যবহার করেছেন কিনা তা অবগত হওয়া যেত। মিঃ হোগার্থ[২৭১] তার যে সমস্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে কোনরূপ সঠিক অনুমান করা যায় না। পক্ষান্তরে বার্কহার্ট মোহাম্মদ আলী মিসরীর হেজায অধিকার করার পর আগমন

---

[২৬৭] বহু অনুসন্ধানের পরও সঠিক সময় নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে শায়খের সমসাময়িক ছিলেন না বলে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

[২৬৮] মোহাম্মদ হামীদ আল ফকীহঃ ৫-৬ পৃষ্ঠা।

[২৬৯] সর্বপ্রথম ইউরোপীয় পর্যটক যিনি আরবে পদার্পণ করেন। (দেখুন প্রমাণ-পঞ্জী অধ্যায়)

[২৭০] দ্বিতীয় খন্ড ১৩৩-৫ পৃষ্ঠ।

[২৭১] ৭৮-৮১ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

করেছিলেন এবং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহ্হাবীদের সম্পর্কে তার স্মারকলিপি প্রস্তুত করেন। অতঃপর তা দুই খন্ডে Notes on Bedouins and the wahhabys ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই ভদ্র লোকটি ওয়াহ্হাবী শব্দ বারংবার উচ্চারণ করেছেন, এমনকি তার দ্বিতীয় খন্ডে কোন পৃষ্ঠাই সম্ভবতঃ তা হতে বাদ পড়েনি। অনুরূপভাবে আবদুর রহমান যবরতীও (মৃঃ ১২৩৮ হিঃ) সেই সময় তার ইতিহাস রচনা করেন। তিনিও বহুস্থানে এ শব্দ (ওয়াহ্হাবী) ব্যবহার করেছেন। ১২১৮ হিজরীর ঘটনাসমূহে তিনি লিখেছেন-

وحضر صحبة الحاج كثير من أهل مكة هروبا من الوهابي ولغط الناس في خير الوهابي واختلفوا فيه

(আজায়েবুল আসার (৩) ৫৫ পৃষ্ঠা) এতে অনুমিত হয় যে, হেজাযে মিসরীয়দের আক্রমণের সময় এ পরিভাষার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। পরবর্তী লোকদের প্রায় সকলেই এ পুণ্যবান জমাআতকে সেই নামেই উল্লেখ করেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, যে কোন নামে শুধু নামকরণেই কোন দোষ নেই, থাকতেও পারে না। কিন্তু এ নাম ওয়াহ্হাবী (উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে) এ ভাবে মশহুর করা হয়েছে যে, এ যেন ইসলাম হতে আলাদা একটি নূতন মাযহাবরূপে সৃষ্টি হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে আপত্তির কারণ এবং এ জন্যই আমরা ভ্রান্ত অপবাদের সূচীতে এ নামের অপবাদকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

সর্বপ্রথম অপবাদ রটনাকারী

শায়খুল ইসলামের জীবদ্দশায়ই সোলায়মান[২৭২] বিন মোহাম্মদ বিন সোহায়ম (মৃঃ ১১৮১ হিঃ) তার সম্পর্কে নানারূপ মিথ্যা অপবাদ রটনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি তার গশতি চিঠিতে শায়খের প্রতি নিম্নলিখিত অপবাদ আরোপ করেন-

(ক) জুবীলা নামক স্থানে অবস্থিত জয়দ বিন খাত্তাবের কবর ভেঙ্গে ফেলা।

---

[২৭২] পূর্ণ নাম সোলায়মান বিন মোহাম্মদ বিন আহমদ বিন আলী বিন সোহায়ম। তার পিতা মোহাম্মদ বিন আহমদও এ আন্দোলনের বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত। রওজা (১) ১৩৮, আসসাহাবঃ ৩১৩ পৃঃ।

http://www.shottanneshi.com

(খ) উক্ত কবরের নিকট একটি মসজিদ ধ্বংস করা।

(গ) দলায়েলুল খয়রাত এবং রওযুর রিয়াহিন নামক পুস্তকদ্বয়কে ভস্মীভূত করা এবং

(ঘ) ইবনে ফায়েজ এবং ইবনুল আরাবীকে কাফের বলা ইত্যাদি। কিন্তু যয়দ এবং তার সঙ্গীদের কবরের কোন সন্ধানই নেই। দলায়েলুল খয়রাত এবং রওযুর রিয়াহিন ভস্মীভূত করার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ মাত্র। একথা ঠিক যে, শায়খ উক্ত কিতাবগুলো পড়তে নিষেধ করতেন। ইবনে আরবী ও ইবনে ফারায়েযের ন্যায় সুফিদেরকে কাফের বলার কথা অবশ্য বর্ণিত হয়েছে।[২৭৩]

অন্যান্য সমসাময়িক ও তাদের গালিগালাজ

শায়খুল ইসলামের অপর কতিপয় সমসাময়িকও ইবনে সোহায়মের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাদের পুস্তকগুলো শুধু গালিগালাজ এবং মিথ্যা অপবাদে পরিপূর্ণ। এদের মধ্যে আহমদ বিন আলী বসরী কোবায়ী[২৭৪] (১১৭০-১৭৫৬), আবদুল্লাহ বিন ঈসা মোঈস (মৃঃ১১৭৫) এবং ইবনে ফিরোজ (মৃঃ ১২১৬/১৮০১) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার পরবর্তী শ্রেণীতে রয়েছেন আফিফুদ্দিন আবদুল্লাহ বিন দাউদ জুবায়রী হাম্বলী (মৃঃ ১২২৫ হিঃ -১৮১০), আহমদ আবদুল্লাহ আল হাদ্দাদ বা আলবী তোরায়মী শাফেয়ী[২৭৫] প্রমুখের নাম উল্লেখিত হয়েছে। ইবনে গান্নামও তাদের অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন[২৭৬] এবং ইবনে ফিরোজের একটি কবিতারও জওয়াব দিয়েছেন।

অবশ্য এ সব লোকের অশ্লীল গালিসমূহের উল্লেখ করার শক্তি আমাদের নেই। তবুও শুধু তাদের ভদ্রতা ও শালীনতার নমুনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করার জন্য পাঠকদের অনুমতি চাচ্ছি এবং সুধী সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

---

[২৭৩] রওয়াতুল আফ্কার (১) ১৫৮ , ১৬৭ ও ১৯৮ পৃষ্ঠা।

[২৭৪] এদের সঠিক মৃত্যুর সন জানা যায়নি। উল্লিখিত সনগুলো তাদের গ্রন্থ প্রণয়নের অথবা তাদের বিদ্যমানতার সময় বুঝাচ্ছে।

[২৭৫] সঠিক মৃত্যু সন অজ্ঞাত। ত্রয়োদশ হিজরী সালে ছিলেন বলে প্রমাণিত হয়।

[২৭৬] রওযাতুল আফ্কার (১) ২০৯ পৃঃ (২) ২১৪ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

আবদুল্লাহ বিন দাউদ যোবায়য়ী (মৃঃ ১২২৫-১৮১০) প্রণীত "কেতাবুস সওয়ায়েক ওয়াররুউদ"[২৭৭] এর সূচনায় দু'টি প্রশংসাপত্র দেয়া হয়েছে। পত্রটি মোহাম্মদ বিন ফিরোজ হাম্বলী (মৃঃ১২১৮-১৮০১ প্রণীত। (১৮ই সফর ১২১০ হিঃ) এর শুরুতেই নিম্নলিখিত এবারত (Text) দৃষ্টিগোচর হয়। এ দৃষ্টে সম্ভবতঃ লজ্জাও ম্লান হয়ে যাবে- কুফরের উদ্ধৃতি কুফর নয়। একবার মন ভরিয়া শ্রবণ করুন।

بل لعل الشيخ (يعني عبد الوهاب) غفل من مواقعة أمه (يعني محمد بن عبد الوهاب) فسبقه الشيطان إليها فكان أبا هذا المارد الخ

(এর অনুবাদে কোন মতেই প্রবৃত্তি হল না) লক্ষ্ণৌর সরাইখানার মাতালেরা এর চেয়ে অধিক মাতলামী করতে পারে কি? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এই লেখাটি ১২১০ হিজরীর ইবনে গান্নাম [(২) ২১৪ পৃঃ] ১২১১ হিজরীর ঘটনাসমূহে উক্ত ইবনে ফিরোজের একটি কবিতার উল্লেখ এ রূপে করেছেন-

وقد وصل إلينا من هاتيك الديار منظومة لإبن فيروز....متضمنة لاقبح العار

এই এলাকা হতে ইবনে ফিরোজের একটি কবিতা আমার হস্তগত হয়েছে যা অত্যন্ত অশ্লীল ও লজ্জাকর উক্তিতে পরিপূর্ণ। এতে প্রমাণিত হয় যে, অশ্লীলতা লেখকের মজ্জাগত ব্যাপার।

অপবাদের দৃষ্টান্ত

(ক) নবুওতের দাবীঃ-

শায়খের শত্রুরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে কোন দোষারোপের সুযোগ পায়নি তখন বলতে শুরু করে যে, আসলে তিনি নবওতের দাবী করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গোপনীয়তা অবলম্বন করেছেন। -মিসবাহুল আনাম (হস্ত লিখিত) ৫-৬ পৃষ্ঠা।

আহমদ জয়নী দাহলান নিম্নলিখিত ভাষায় একই অভিযোগের পুনরুল্লেখ করেছেন-

---

[২৭৭] মকতুবা- মাশরেকী কুতুবখানাঃ পাটনা ১২২৮।

http://www.shottanneshi.com

والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه كان يدعى النبوة إلا أنه ما قدر على اظهار التصريح بذلك-

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি নবওতের দাবী করতেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে এ দাবী উচ্চারণ করতে তিনি সাহসী হননি।[২৭৮]

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মিঃ নৈবুরও শুধু শোনা করার উপর নির্ভর করেই লিখে দিয়েছেন যে, "আবদুল ওয়াহ্হাব রসূলগণকে শুধু বড়লোক মনে করতেন, কিন্তু ইলহাম অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে অহী অবতীর্ণ হওয়া স্বীকার করতেন না"।[২৭৯]

এ সম্পর্কে আরও একটি লজ্জাকর নমুনা দেখতে পাই মিঃ রাউনশর (Ravenshaw) সেই স্মারকলিপিতে[২৮০] যা তিনি পাটনার কালেক্টর হিসেবে মরহুম মওলানা আবদুল্লাহ সাদেকপুরীর[২৮১] মোকদ্দমায় লিখে দিয়েছিলেনঃ-

"এই সংস্কারকের (সম্ভবতঃ আবদুল ওয়াহ্হাবের) ধারণা ছিল এই যে, কোন মানুষই সরাসরিভাবে আল্লাহর নিকট হতে ইলহাম প্রাপ্ত হননি, এবং এরূপ কোন ঐশী গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই, যাকে ইলহামী (Divine) বলা যেতে পরে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আবদুল ওয়াহ্হাব এর মতে কোন ধর্মই ইলহামী হয়নি। আর যদি তিনি "মোহাম্মদী" মাযহাবকে ইলহামী বলেন, তবে তা এ জন্য নয় যে, তা আল্লাহর নিকট হতে সরাসরি অবতীর্ণ হয়েছিল বরং শুধু তার পূর্ণত্বের কারণেই (তিনি এরূপ বলেছেন)"।

---

[২৭৮] আদদুর রুস সানীয়াহ; ৪৬ পৃষ্ঠা।

[২৭৯] নৈবুরের সফরনামা (২) ১৩৪ পৃষ্ঠা।

[২৮০] কলিকাতা গেজেট ২০ শে ডিসেম্বর ১৮৬৫ জমীমা ঃ ৪৩৭-৪৫ পৃষ্ঠা।

[২৮১] ৪। মাওলানা আহমদউল্লাহ সাদেকপুরী পাটনার বিখ্যাত মনীষী ছিলেন, সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৬৫ সালে (১২১৮ হিঃ এ অপরাধে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। হাইকোর্ট তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেন। দীর্ঘ ১৭ বৎসর আন্দামানে অবস্থান করে নভেম্বর ১৮৮১ সালে (যিলহিজ্জাহ ১২৯৮ হিঃ) তিনি ইন্তে কাল করেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য হিন্দুস্তানের প্রথম ইসলামী আন্দোলন পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

http://www.shottanneshi.com

তিনি আরও বলেছেন, সংস্কার প্রাপ্ত মুসলমানকে (Mohammaden) সেই সমস্ত বেদুইনেরা অধিক ভালবেসেছিল, যারা কোন সময়ই মোহাম্মদ (দঃ) কে একজন নির্বচিত মহাপুরুষ বলে স্বীকার করেনি এবং তার কুরআনকেও ইলহামী কিতাব বলে স্বীকৃতি দিত না।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পাটনার এ কালেক্টর সাহেবের স্মারকলিপি এরূপ অজ্ঞতার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ রয়েছে। পাক-ভারতের মোজাহেদীনের বিখ্যাত মেহেরবান স্যার উইলিয়াম ওয়েলসন হান্টারও (W.W. hunter) তাঁর (The Indian Musalmans) গ্রন্থের এক স্থানে[২৮২] বলেছেন- "বেদুঈনেরা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কখনও মনোনীত ব্যক্তি বলে স্বীকার করেননি এবং কুরআনকে ঐশীবাণীরূপে গ্রহণ করেননি।"

সম্ভবতঃ তিনি মিঃ রাভেন শোর স্মারকলিপির উপর নির্ভর করেছেন অথবা তিনিও রাভেন শো উভয়েই নৈবুরের সফরনামায় উপর ভিত্তি করেছেন, কারণ পাশ্চাত্যবাসী সর্বপ্রথম তারই মাধ্যমে সেই জমাআতের খবর পেয়েছিলেন।

(খ) হাদীসের অস্বীকার

কালের অতি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি রসূলের সুন্নতকেই তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বলরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর প্রতিই আবার সুন্নত অস্বীকার করার অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। 'মিসবাহুল আনাম' এর লেখক আহমদ আবদুল্লাহ আল হাদ্দাদ বালবী এই অপবাদ রটাবার "গৌরব" অর্জন করেছেন-৫০৬ পৃঃ। আরও অধিক বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে; আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত লেখক[২৮৩] (কুরআনের ইংরেজী

---

[২৮২] The Indian Musalmans P.55-56,

[২৮৩] এ ব্যাপারে এই লেখক মহোদয়ই একক নন, আমাদের দেশের অশিক্ষিত এবং তথাকথিত শিক্ষিত সাহিত্যকরাও এ জমাআত সম্পর্কে নানারূপ ভিত্তিহীন অপবাদ করে থাকেন। এদের অগ্রভাগে ছিলেন জনৈক মৌলভি ফজলে রসূল বদায়ুনী (মৃঃ ১২৯৮/১৮৭২) তসহীহুল মাসায়েল দর তরদীদে ফির্কায়ে নজদীয়া আরাজিল (تصحيح المسائل در ترديد فرقة نجديه ارازل) শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। বস্তুতঃ পুস্তিকাখানা আবর্জনার একটি সমাবেশ মাত্র। ইদানিং জনৈক সমাসাময়িক স্বীয় পুস্তিকায়ও (আসারে জালালুদ্দীন) এ জামাআত সম্পর্কে বহু ভিত্তিহীন কথা লিখে গেছেন, ৩৩৬-৭ পৃঃ এ দু'টি পৃষ্ঠাই মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণায় পরিপূর্ণ। অধিকন্তু তার মতে সুন্নৌসী আর নজদী ওয়াহ্হাবীর আক্বীদাতে বিশেষ কোন তফাৎ নেই (৩৩৯ পৃঃ।

http://www.shottanneshi.com

অনুবাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী) এই বিংশ শতাব্দিতে তারই চর্বিত চর্বন করে সেই ভিত্তিহীন অপবাদের পুনরোল্লেখ করেছেন-"... এবং (কেরামত আলী) হাদীসের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখতেন ওয়াহ্হাবীরা যা অস্বীকার করেছিল।"

'তারা রক্ষণশীল এবং সুফী আকীদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন'।[২৮৪] এটাই হচ্ছে আমাদের কুরআনের একজন অনুবাদকের একটি ইসলামী জমাআত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা! এখন আমরা বাস্তব ঘটনা উপলব্ধি এবং তুলনা করার উদ্দেশ্যে একজন গোঁড়া পাদরী মিঃ থোমাস প্যাটরিক হিউজের (Thomas Patric Hughes) একটি মন্তব্য পেশ করছি। তিনি ওয়াহ্বী এবং খৃষ্টান প্রোটেষ্টান্ট জমাআতের তুলনামূলক আলোচনা করে লিখেছেনঃ

ওয়াহ্হাবীয়তকে অনেক সময় ইসলামের প্রটেষ্টান্ট জমাআতরূপে উল্লেখ করা হয়। যদিও উভয় দলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, খৃষ্টান প্রটেষ্টান্টরা পবিত্র ইসলামী কিতাবগুলোর উন্নতমান স্বীকার করা সত্ত্বেও রেওয়াতী শিক্ষাগুলোকে অস্বীকার করা অপরিহার্য বলে মনে করে থাকে। পক্ষান্তরে, ওয়াহ্হাবীরা ঠিক এর বিপরীত, কোরআনের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।" (Dictionary Of Islam P. No-166)।

(গ) তকফীর ও মুসলিম হত্যা

শায়খুল ইসলাম এবং তাঁর অনুসারীগণের প্রতি এ অপবাদও আরোপ করা হয়েছে যে, তাঁরা সমস্ত আহলে কেবলা (মুসলমান) কে কাফের বলেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয রাখেন।

বিভিন্ন সময়ে এ অভিযোগটি বিভিন্ন আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বয়ং শায়খুল ইসলামের সময়েই এ অভিযোগ করা হয়েছিল এবং তিনি নিজেই এর কঠোর প্রতিবাদ করেছিলেন। দেখুনঃ-

وإذا كنا لانكفر منن عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد الندوي وأمثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم

[২৮৪] ইংরেজী আমলে হিন্দুস্থানে তমদ্দুনের ইতিহাস, ১৯২ পৃঃ।

http://www.shottanneshi.com

فكيف نكفر من لم يشرك بالله أو لم يهاجر إلينا ولم يكفر ... ... سبحانك هذا بهتان عظيم-

(ওয়া ইজা কুন্না লা নুকাফফিরু মান আবদাছ ছানামাল্লাজী আলা কুব্বাতে আবদিল কাদের ... ... ফাকাইফা নুকাফফিরু মান লাম য়্যুশরিক বিল্লাহে আও লাম য়ূহাজির ইলায়না ওয়ালাম ইয়াকফুর ... ... ছুবহানাকা হাজা বুহতানুন আযীম)

অর্থাৎ যখন আমরা সেই সমস্ত লোকদেরকে কাফির বলিনা যারা নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ এবং কোন সতর্ককারী না থাকা হেতু সেই সব মূর্তির পূজা করে থাকে যা (শায়খ) আবদুল কাদের এবং (শায়খ আহমদ বদবী প্রভৃতির কবরে নির্মিত রয়েছে, তখন আমরা সেই সমস্ত লোককে কিরূপে কাফের বলতে পারি যারা আদৌ শির্ক করেননি অথবা হিজরত করে আমাদের নিকট আসেননি এবং কোনরূপ কুফরীও তারা করেননি- ছুবহানাল্লাহ! এটি (আমাদের প্রতি) ভয়ংকর অপবাদ মাত্র।

শায়খের এ প্রকাশ্য প্রতিবাদের পরও এটা বারংবার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত করছিঃ-

ইবনে আবেদিন শামী (মৃঃ ১২৫৮ হঃ ১৮৪২ ইং) তাঁর বিখ্যাত টীকা রদ্দুল মুহতারে বলেছেনঃ

كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب؟ الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا إنهم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا قتل أهل السنة وقتل علمائهم-

যেমন আমাদের সময়ে আবদুল ওয়াহ্হাবের (?) এবং তার অনুসারীদের অবস্থা হয়েছে যারা নজ্দ হতে উত্থান করে হরমদ্বয় (মক্কা ও মদীনা) অধিকার করে নিয়েছে এবং তারা হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিল। কিন্তু তাদের আকীদা ছিল এই যে, শুধু তারাই মুসলমান এবং তাদের আকীদার মোখালেফ যারা তারা সকলেই মুশ্‌রিক। অধিকন্তু তারা আহলে

http://www.shottanneshi.com

সুন্নত এবং আলেমগণকে কতল করা মোবাহ জানতেন।'[২৮৫] এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর কী হতে পারে! আল্লামা শামীর ন্যায় আলেমের এ অজ্ঞতা বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! আহমদ জয়নী দাহ্লান (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ) যেন ইসলামী জমাআতের প্রাণের বৈরী ছিলেন। তিনি বারং বার এ অপবাদের উল্লেখ করেছেন। (দুররুচ্ছানীয়াহ্ ৪৫ পৃঃ)–

পাক-ভারতের বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম নওয়াব ছিদ্দিক হাসান খানও (মৃঃ ১৩০৭হিঃ -১৮৯০ খ্রীঃ) এ জমাআত সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পরিতেছিলেন না। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে (তরজুমানে ওয়াহ্হাবীয়াহ্, হেদায়াতুছছায়েল, মওয়ায়েদুল আওয়াইদ, আত্ তাজুলমুকাল্লাল প্রভৃতিতে) এ জমাআত সম্পর্কে নানা ধরণের জটিল আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'আতহাফুন নুবালা' গ্রন্থে তাঁর আলোচনা অনেকটা স্বচ্ছ এবং সত্যের নিকটবর্তী। তবুও বিনা শর্তে কাফের বলার অভিযোগটি এখানেও বিদ্যমান রয়েছে।[২৮৬]

অন্যের কথা বাদ দিলেও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, স্বয়ং এ্যামনের বিখ্যাত তত্ত্ববিদ কাজী মোহাম্মদ বিন আলী শওকানীও এ সম্বন্ধে নজদবাসীদের সহীহ মাযহাব সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি। তিনি নিজেও এ সম্পর্কে শেকায়েত করেছেনঃ

ولكنهم يرون أن من لم يكن داخلا تحت دولة صاحب نجد وممتثلا

لاوامره خارج عن الإسلام ... ... وتبلغ عنهم أشياء الله أعلم بصحتها

"কিন্তু তাদের (নজদীদের) ধারণায় যারা নজদের আমীরের অনুগত নয় তারা ইসলাম হতে বহির্ভূত। এতদ্ব্যতীত তাঁদের সম্পর্কে আরও অনেক কথাই শুনা যায়। এর সত্যতা যে কতটুকু তা আল্লাহই অবগত আছেন।[২৮৭] পুনশ্চ "নামায" অথবা জমাআত পরিত্যাগকারীদের 'কাফের' বলা জায়েয রাখেন।[২৮৮] নজদীদের উপর সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফের বলার অভিযোগ যদি কোন বিরোধিরা আরোপ করে থাকে তবে তার কিছুটা হেতুবাদ থাকতে পারে; সাধারণ লোকদের এ সম্পর্কে ধাঁধাঁয়

---

[২৮৫] রদ্দুল মোহ্তার (৩) ৩০৯ পৃষ্ঠা।
[২৮৬] ৪১৩ পৃষ্ঠা।
[২৮৭] আলবদ্ তরুতালে' (২) ৫ পৃষ্ঠা।
[২৮৮] ঐ

http://www.shottanneshi.com

পড়ার সুযোগও রয়েছে। আমরা নজদী আলেমদের ভাষায়ই তাদের মাযহাব বয়ান করে দিচ্ছি, যাতে কোন নূতনত্ব নেই বরং তা হাম্বলী এবং জাহেরীদের বিখ্যাত মতবাদ।

শায়খুল ইসলামের শিষ্য আহমদ বিন নাসের বিন ওসমান মা'মরী নজদী (মৃঃ ১২২৫ হিঃ) ১২১১ হিজরীতে মক্কার আলেমদের সম্মুখে যে তিনটি মাসআলা পেশ করেছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় মাসআলার সারাংশ তারই ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছিঃ-

أما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مقيم على شركه يدعو الموتى ويسألهم قضاء الحاجات وتفريح الكربات فهذا كافر يشرك حلال الدم والمال وان قال لا إله إلا الله محمحد رسول الله وصلى وصام وزعم انه مسلم

"যারা" লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলার পরও শির্কে লিপ্ত থাকে, মৃতদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করে, তাদের নিকট বিপদমুক্তির এবং মনস্কাসনা পূর্ণ করার জন্য আবেদন করে তারা কাফের এবং মুশরিকের পর্যায়ভুক্ত, তাদের মাল হরণ ও তাদেরকে হত্যা করা হালাল, যদিও তারা (মৌখিকভাবে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে, নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে থাকে।

তাতে আরো বলা হয়েছে যে, ইবনে মোআম্মর নজদী অবহেলা বশতঃ যারা নামায পরিত্যাগ করে থাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয রাখতেন এবং যোহরী ও ইমাম আবু হানীফা ব্যতিত অপর সকল ইমামগণের এ সম্পর্কে ইজমাও তিনি বর্ণনা করেছেন।[২৮৯]

হাম্বলীদের মত এটাই এবং নজদবাসীরাও এ মতেরই অনুসারী ছিলেন। নামায পরিত্যাগকারীদের "কাফের" হওয়া তাদের নিকট সুপ্রতিপন্ন।[২৯০]

ومن لم يصل فهو لاشك كافر كما قاله المعصوم اكمل سيدي

যে নামায পড়েনা, তার কাফের হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই, যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন।

---

[২৮৯] বিস্তারিত বিবরণের জন্য আলহাদীয়াতুস্ সানীয়াহ্ ৬১-৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[২৯০] বিস্তারিত বিবরণের জন্য আলহাদীয়াতুস্ সানীয়াহ্ ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

http://www.shottanneshi.com

এর পর আসে কবর পূজারীদের (عباد قبور) মসআলা। শায়খুল ইসলামের পূর্ববর্তী স্বমতাবলম্বী সমসাময়িক (মোহাহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল আমীর এ্যামানী) (মৃঃ ১১৮২ হিঃ) মুর্তিপূজক এবং কবরপূজকদের মধ্যে কোন পার্থক্যই করতেন না।[২৯১] শওকানী তার মত "পরিবর্তনের কথা লিখেছেন এবং কবর পূজারীদের সম্বন্ধে এরূপ কঠোরতা অবলম্বনের জন্য তীব্র বিরোধিতা করেছেন।[২৯২] পক্ষান্তরে সোলায়মান বিন ছাহ্মান এ্ মত পরিবর্তনের রেওয়ায়তের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন[২৯৩] এবং এটাই সঠিক।

শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এসম্পর্কে আমীর্ এ্যামানীর অনুরূপ মতই পোষণ করতেন বলে মনে হয়। তবে তাঁদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য এই যে, শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ইতমামে হুজ্জতের শর্ত আরোপ করেন (অর্থাৎ কবরপূজারীদের নিকট তাবলীগ করা এবং ইসলামের ও তওহীদের আসলরূপ পরিষ্কার করে দেয়া অপরিহার্য বলে তিনি বলতেন।) অতঃপর কবর পূজা পরিত্যাগ না করলে তিনি তাদেরকে কাফের বা মুশরিক মনে করা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয বলতেন। আর এ কারণেই শায়খুল ইসলাম সমস্ত মুসলমানকে কাফের বলতেন না।

ومن جملة هذه الاكاذيب ما ذكره ... ان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسفك الدماء وينهب الأموال ويتجارى على قتل النفوس وتكفير الأمة المحمدية في جميع الأقطار وهذا كله كذب ..

'তররেয়াতুশ শায়খয়নিল ইমামায়ন' গ্রন্থে ৫৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- "শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের প্রতি যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রক্তপাত করেন এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেন, জনসাধারণকে হত্যা করার ফতওয়া দিতে এবং পৃথিবীর সমগ্র

---

[২৯১] তাৎহীরুল এ'তেকাদ, ১২ পৃষ্ঠা।
[২৯২] আদ্ দুররুন্নাজীদঃ ৩৫-৪০ পৃষ্ঠা।
[২৯৩] তাবরেয়াতুশ শায়খায়নিল ইমামায়ন ৮২-৮৩ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

মুসলমানকে কাফের বলতে প্রগলভতা প্রদর্শন করতেন। অথচ এই অপবাদগুলো সবই মিথ্যা দোষারোপ মাত্র। (নজদবাসীরা সাধারণতঃ এই অপরাধের কঠোর প্রতিবাদ করে, কিন্তু তবলীগ দ্বারা তাদের উপর হুজ্জত কায়েম করার পর (যদি তারা বিরত না হয় তবেই) তাদেরকে কাফের বলতে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয রাখতে দেখা যায়।

فلم يكفر رحمة الله إلا عباد الأوثان من دعاة الأولياء والصالحين وغيرهم ممن أشرك بالله وجعل له اندادا بعد إقامة الحجة ووضوح المجحة وبعد ان بدؤه بالقتال فحينئذ قاتلهم وسفك دمائهم ونهب أموالهم ومعه الكتاب والسنة اجماع سلف الأمة-

"যারা অলি দরবেশ ও সৎব্যক্তিবর্গের নিকট মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করে থাকেন, শায়খুল ইসলাম শুধু এই প্রকৃতির লোকদের কাফের বলতেন। এরা প্রমাণ পাওয়ার ও সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও শির্কে লিপ্ত থাকে, অধিকন্তু তারাই আবার যুদ্ধের প্রতি অগ্রসর হয়, তখনই শায়খ তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাদের রক্তপাত করেন এবং তাদের সম্পদ লুট করেন। এ ব্যাপারে কিতাব, সুন্নত ও ইজমার প্রমাণাদি তাঁদের পক্ষে রয়েছে।[২৯৪]

এখানে হুজ্জত কায়েম হওয়া ছাড়াও আরও একটি কারণ দেখা যাচ্ছে এবং তা হচ্ছে এই যে, বিরোধিরা যুদ্ধের সূত্রপাত করেছে।

শায়খ অন্যত্র বলেছেন-

فجنس هؤلاء الكشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصاحين نحكم بأنهم المشكون ونرى كفرهم إذا قامت الحجة الرسالية-

যারা অলীগণ এবং সদাচরণশীলদের পূজা করে থাকে, এ প্রকৃতির মুশরিক সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, তবলীগী হুজ্জত কায়েম হওয়ার পর আমরা তাদের মুশরিক হওয়ার হুকুম লাগিয়ে থাকি এবং তাদেরকে এ অবস্থায় আমরা কাফের মনে করে থাকি।

---

[২৯৪] তাবরিয়াতুশ মায়খায়নিল ইয়ামায়ন, ৮৬ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের সাহায্যে এ প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শায়খ এবং তাঁর অনুসারীরা কাফের বলা এবং যুদ্ধ করার জন্য তবলীগ এবং তাদের নিকট শরীয়তের প্রমাণ উপস্থাপিত করে তার আপত্তির পথ রুদ্ধ করা অপরিহার্য বলতেন। এ জন্যই সাধারণভাবে সকলকে কাফের বলার অভিযোগটির তিনি প্রতিবাদ করেছেন। অবশ্য কবরপূজা এবং প্রকাশ্য মুশরিকানা কার্যকলাপকে তারা শুধু বাহ্যিক আমলী কুফরই মনে করতেন না, যেমন সাধারণতঃ আমলী কুফর এবং এ'তেকাদী কুফরে পার্থক্য করা হয়ে থাকে।

শায়খ তওহীদে রবুবীয়তকেই যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং ইসলামের জন্য তিনি তওহীদে উলুহিয়তকেও অপরিহার্য এবং মৌলিক শর্ত বলে উল্লেখ করতেন। অর্থাৎ আল্লাহকে শুধু বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ামক বলে জানলেই নাজাতপ্রাপ্তি সম্ভবপর নয়। এতো জাহেলী যুগের লোকেরাও বিশ্বাস করত; কিন্তু একক ইলাহ বলে আল্লাহকে স্বীকার করত না, বরং শির্ক করত। এ জন্যই যে সমস্ত বৃক্ষ ও প্রস্তর মূর্তিকে তারা পূজিত সেই সমস্তকে 'ইলাহ' নামেই আখ্যায়িত করত।

এই যুগের অজ্ঞ ও মুশরিক লোকেরা গায়রুল্লাহকে 'ইলাহ' নামে আখ্যায়িত করে না বটে, কিন্তু তার যাবতীয় উপাদান নযর, নেয়ায, তওয়াফ ও কুরবানী প্রভৃতি গায়রুল্লার জন্যও করে থাকে। তারা একে অসীলা অথবা সুফারিশী প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করে থাকে কিন্তু তারা অবগত নয় যে, শুধু নাম পরিবর্তন করলেই বস্তুর মূলে কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে না।[২৯৫]

---

[২৯৫] তাবরিয়াতুশ শায়খায়নিল ইমামায়নের টীকায় একস্থানে (১২৪ পৃঃ) আল্লামা রশীদ রেযা মরহুম (মৃঃ ১২৫২ হিজরী) একটি কৌতুকোদ্দীপক কথা লিখেছেন। তিনি বলেন, মূর্খতার যুগের লোকেরা ভাষার মাধুর্য সম্পর্কে ওয়াকেফ থাকায় নিজেদের প্রত্যেক মাবূদকেই (বৃক্ষই হোক অথবা প্রস্তর) ইলাহ বলে অভিহিত করত, কারণ এর সঠিক তাৎপর্য তাই। পক্ষান্তরে আমাদের যুগের মুশরিকরা অভিধান ও ভাষ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ধারণা করে নিয়েছে যে, গায়রুল্লার প্রতি ইলাহ্ শব্দের প্রয়োগ ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। অথচ এবাদত সম্পর্কীয় সব কাজ (মৃত ব্যক্তিবর্গের নিকট মনস্কামনা প্রার্থনা করা, মানত করা, কুরবানী প্রদান ও কবর প্রদক্ষিণ প্রভৃতি) তাদের নিকট তৌহীদের প্রতিকূল নয়। এভাবে জাহেলী যুগের মুশরিকেরা দ্বীন ও ভাষা উভয়ের প্রতিই অত্যাচার করেছে।

http://www.shottanneshi.com

এটাই হচ্ছে শায়খের মাযহাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাদের গ্রন্থাবলীতে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সোলায়মান বিন সাহমান কর্তৃক বিরচিত 'তাবরিয়াতুশ শায়খায়নিল ইমামায়ন' পুস্তকখানা প্রায় এ আলোচনায় পূর্ণ রয়েছে। ফল কথা এই যে, নজদবাসীরা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে সাধারণভাবে কাফের বলতেন না বরং যারা শির্কে লিপ্ত ছিল এবং তবলীগের দ্বারা সত্য উদ্‌ঘাটনের পরও যারা নিজেদের ভ্রষ্টতা পরিহার করতে প্রস্তুত হয়নি, শুধু এই প্রকৃতির লোকদেরকেই তারা কাফের বলতেন এবং তাদের সাথে জেহাদ করা জায়েয রাখতেন।

শায়খ কর্তৃক তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে- যাতে যাকাত অমান্যকারীদের সাথে হযরত আবূ বকরের যুদ্ধ করা হতে তিনি বারংবার প্রমাণ গ্রহণ করেছেন।[২৯৬]

যারা শায়খুল ইসলামের প্রতি অযথা ভিত্তিহীন অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করেছেন, তাদের এ আচরণে শুধু দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এ বিংশ শতাব্দীতেও এ দেশের কোন কোন বিখ্যাত আলেম শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে আশ্চর্যজনক অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতেন।

মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশমিরীর (মৃঃ১৯৩৩ খ্রীঃ) ন্যায় আলেমের শায়খ সম্পর্কে এ মন্তব্য–

أما محمد بن عبد الوهاب النجدي فانه كان رجلا بليدا قليل العلم فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر

"মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব একজন নির্বোধ (বোকা) এবং স্বল্পবুদ্ধি লোক ছিলেন। এ জন্য কুফরীর হুকুম লাগাতে তিনি দ্বিধা করতেন না' [২৯৭] অত্যন্ত বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, 'কিতাবুত্ তওহীদের' লেখকের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মওলানা আনওয়ার শাহ্ 'বলদ' বোকা) এবং 'স্বল্পজ্ঞানী

(وكذلك قلت ان مشركي المسلمين قد جنوا على الدين واللغة العربية ومشركي الجاهلية حافظوا على لغتهم فسموا كل شيئ بإسمه)

[২৯৬] আরবাআ কাওয়াইদ, রওযাতুল আফকার (১) ১৩৭, ১৮৫, (২) ৩৬ পৃষ্ঠা।

[২৯৭] ফয়জুল বারী ১৭১ (১) পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

বলে উল্লেখ করতে সাহসী হলেন কিরূপে? যে সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষের প্রচেষ্টার ফলে একটি পুরো এলাকাই সংস্কারপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং আজ দুই শত বৎসর পরও তাতে অটল রয়েছে, তাকে বলদ (বোকা) বলার দুঃসাহস হতে পারে কী করে?

(ঘ) সাধারণ ভিত্তিহীন বিবরণ

শায়খ এবং তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের অপবাদ ও ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রারম্ভ হতেই আরোপিত হচ্ছিল। শায়খুল ইসলামের সুযোগ্য পুত্র আবদুল্লাহ মক্কাবাসীদের জন্য (১২১৮/১৮২২) হিজরীতে যে পুস্তক রচনা করেছিলেন, তাতে তিনি তার কঠোর প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেনঃ-

وأما ما يكذب علينا سترا للحق ... ... بانا نفسر القرآن براينا وناخذ من الحديث ما وافق فهمنا ... ... وانا نضع من رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم يقولنا النبي رمة في قبره وعصا أحدنا انفع منه وليس له شفاعة وان زيارته غير مندوبة ... ... وانا مجسمة وانا نكفر الناس على الإطلاق ... ... فجميع هذه الخرافات واشياهها ... ... كان جوابنا في كل مسئلة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم

'এবং এই যে সত্যকে গোপন করে আমাদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলা হয়ে থাকে যে, আমরা নিজের খেয়াল খুশিমত কুরআনের তফসীর করি, হাদীসের যে অংশ আমাদের স্বার্থের অনুকূল হয়, সেইটুকুই আমরা গ্রহণ করি, রসূলুল্লাহর সম্মানের লাঘব করার জন্য নাকি আমরা বলে থাকে যে, তিনি কবরে পচা হাড় ব্যতীত আর কিছুই নন এবং আমাদের একজনের লঠিই তাঁর চেয়ে অধিক উপকারী। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ নাকি শাফাআৎ করার অধিকারী হবেন না, তাঁর পবিত্র কবর যিয়ারত করা মুসতাহাব নয় ... ...। অধিকন্তু আল্লাহর জড় পদার্থ হওয়ার মত নাকি আমরা পোষণ করি এবং সমগ্র মুসলমানকে আমরা কাফের বলি, ইত্যাদি এ প্রকার বহু ভিত্তিহীন ও অমূলক অপবাদ আমাদের প্রতি আরোপ করা হয়। কিন্তু এর প্রত্যেক অপবাদের জন্য আমাদের পক্ষে শুধু একটিমাত্র জওয়াব হচ্ছে– 'সুব্হানাকা হাযা বুহতানুন আযীম' এটা ভয়ঙ্কর মিথ্যা অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

http://www.shottanneshi.com

(ঙ) কুব্বায়ে নববীর বিধ্বস্তি বা রসূলুল্লার কবর ভাঙ্গার অপবাদ

বিরোধিরা শায়খুল ইসলামের অনুসারী সউদী হুকুমতের প্রতি এ্ অপবাদও রটিয়েছিল যে, সউদ বিন আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ বিন সউদ (১২১৮/১৮০৩-১২২৯/১৮১৪) রসূলুল্লার কবরে নির্মিত কুব্বাটিও ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ অযথা এ ভিত্তিহীন কাহিনীকে বারংবার উল্লেখ করে বিশেষ স্বাদ গ্রহণ করেছেন। ষ্টার্ড (১/২৭৯) মিঃ হিউজিস (ডিকশনারী অফ ইসলাম ৬৬০ পৃষ্ঠা) মিঃ জোয়ায়নিক (১৯৫ পৃঃ) ব্ল্যান্ট (ফিউচার অফ ইসলাম ৪৫ পৃঃ) এবং মার্গোলিয়থ (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এ্যান্ড এথিক্স (৪২০) ৬৬১ পৃষ্ঠা।) প্রমুখ ঐতিহাসিকের একটি দল ভিত্তিহীন অপবাদকে স্থানে অবস্থানে উল্লেখ করার অপচেষ্টা করেছেন। অথচ এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদ মাত্র। কুব্বা নির্মান সম্পর্কে তাদের ধারণ যাই থাকুক না কেন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরে নির্মিত কুব্বার দিকে কুদৃষ্টি দেয়ার দুঃসাহসও তাঁরা কখনও করেননি। অন্যান্য কুব্বার ভাঙ্গন এবং তার মূল্যবান সম্পদ বিতরণের কথা তারা সানন্দে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুব্বা ভাঙ্গা অথবা তাঁর সাথে কোনরূপ দুর্ব্যবহারের বর্ণনা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং জঘন্যতম অপবাদ মাত্র।

নজদীদের উন্নতির যুগে যে ঐতিহাসিক বসরাতে এবং বাগদাদে অবস্থান করেছিলেন সেই ঐতিহাসিক মিঃ ব্রাইজিস এই অপবাদের সমর্থনতো করতে পারেননি, কিন্তু তিনি নজদীদের নিয়তের উপর আক্রমণ করতে ত্রুটি করেননি। তিনি লিখেছেনঃ 'তিনি (সউদ বিন আবদুল আযীয) কুব্বা শরীফ ভাঙ্গার ইচ্ছা[২৯৮] করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ কুব্বার মজবুতী এবং ভাঙ্গার অস্ত্রের অভাবে তা সম্পন্ন করতে পারেননি এবং এরূপে কুব্বাটি অক্ষত থেকে যায়।'

---

[২৯৮] ৩৪ পৃষ্ঠাঃ ব্রাইজিসের অগ্রনায়ক গুরুঠাকুর বার্হার্ট শুধু এটুকু লিখেছেন যে, 'তিনি মাকবারার বড় গুম্বজটি ভাঙ্গার (Destroy) চেষ্টা করেন (২-১৯৯)। ব্রাইজিস সাধারণতঃ বার্কহার্টের অবিকল নকল করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এখানে সম্ভবতঃ ব্রাইজিসের উপর টিকাটিপ্পনি যোগ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বার্কহার্টের তথ্যও অবশ্যই ভ্রান্ত। পরে তিনি নিজেই লিখেছেন। 'মাকবারার কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি।' ২খন্ড ১০৯, ১০০ ও ২০০।

http://www.shottanneshi.com

'মিঃ ব্রাইজিসের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর বর্ণনার গুরুত্ব আগামী অধ্যায়ে জানা যাবে, এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, তিনি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বসরাতে এসেছিলেন, অর্থাৎ শায়খুল ইসলামের জীবদ্দশায়ই আরব এলাকার সাথে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন ধারায় তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

জনৈক ওয়াকেফেহাল ইংরেজের সাক্ষ্য

শায়খুল ইসলাম এবং তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে ভুল বর্ণনা এবং অপবাদ রটনার কাহিনী সুদীর্ঘ। এখানে সেই সমস্তের উল্লেখ করা অসম্ভব এবং অবাস্তবও বটে। এখানে আমরা মিঃ ব্রাইজিসের একটি সাক্ষ্য উল্লেখ করেই ইতি টানতে চাই যাতে তিনি নিজেই কতিপয় অপবাদের প্রতিবাদ করেছেন।

তিনি বিলেছেন, উর্দ্ধতন মহল (বাবে আলী) মশহুর করলেন যে, তিনি (সউদ বিন আবদুল আযীয) মদীনার যিয়ারত হতে লোকদেরকে বারণ করেছেন। কিন্তু এটা সত্য নয়। সউদ বিন আবদুল আযীয রসূলুল্লার কবরে সামনে শুধু শির্কী কার্য্যকলাপ করতে নিষেধ করেছিলেন। যেমন তিনি অন্যান্য অলিদের কবরের অনুরূপ কার্যের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলেন।' কোন কোন জাহেল সউদ বিন আবদুল আযীযকে কাফের মনে করে। তুর্কীরা শুধু গুজবের উপর আস্থাশীল হয়েছে এবং মক্কার শরীফগণ তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, নজদীরা কুরআন এবং হাদীসের উপরই আমল করে থাকে। বার্কহার্ট সত্যই লিখেছেন যে, নজদীদের প্রতি দোষারোপ শুধু ভুল বুঝারই ফল ছিল। আসলে তা ইসলামের মধ্যে খাঁটি "তৎহীর" (Puritanism) 'সংস্কার' সৃষ্টিরই একটি সক্রিয় আন্দোলন ছিল।'

জনৈক নির্বোধ ফ্রান্সবাসী ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিল যে, তারা কোন নূতন ধর্ম সৃষ্টি করছে। সে সউদের 'বিশিষ্ট লোকের' বাচনিক হজ্জ রহিত করার কথাও উল্লেখ করেছে। এটা সবৈব মিথ্যা। ওয়াহ্হাবীরা কোরআনের ন্যায় হাদীসকেও মৌলিক বস্তু (Fundamental) রূপেই মেনে থাকে। কিন্তু তারা অলী এবং নবীগণকে মানুষ বলেই বিশ্বাস করে। মক্কা বিজয়ের পর বাদশাহ্ সউদ যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করেছিলেন, তা এখন কিতাব ও সুন্নতের সম্পূর্ণ মোতাবেক বলে স্বীকৃত হয়েছে। ধূমপান মালিকীদের নিকট যেমন নিষিদ্ধ, তেমনই তা নজদীরাও নিষিদ্ধ করেছে।'

http://www.shottanneshi.com

কফি নিষিদ্ধ করার খবরও অবশ্যই সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুর্কীরা শুধু প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্যেই তা মশহুর করেছিল। যে নির্বোধ ফ্রান্সবাসী ১ হজ্জ নিষিদ্ধ করার কথা উল্লেখ করেছে, তার পক্ষে জ্ঞাত হওয়া উচিত ছিল যে, হজ্জ সমাধাকালে শুধু অনৈসলামিক রসম পালনকে বাদশা সউদ নিষিদ্ধ করেছিলেন। মক্কা প্রবেশের পর তিনি সর্বপ্রথম যে কাজ করেছিলেন তা মক্কার তাওয়াফ এবং উমরাই ছিল।[২৯৯]

একটি বিস্ময়কর অপবাদ

ওয়াহ্হাবীদের নিকট কুরআন মজীদের সেই অংশও বিদ্যমান রয়েছে যা হযরত উছমান কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল।

এই কাহিনীটি ছলিল বিন রাযেক প্রণীত Imams and Syeds of Oman গ্রন্থে জনৈক বেদুঈনের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, অনুবাদক নিজেই তার দুর্বলতা স্বীকার করেছেন। (টীকা ২৫১-২৫৩)। এ কারণেই হয়ত অন্য কেউই এ ঘটনার উল্লেখ করেননি। বিরোধী এবং মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যেই আমরা এ ঘটনার উল্লেখ করেছি। যারা মিথ্যার বেসাতি করতে এতদূর অগ্রসর হতে পারে, তাদের নিকট হতে অধিক আর কীই বা আশা করা যেতে পারে!!

---

[২৯৯] ব্রইজিসঃ ১০৬-২৪ পৃষ্ঠাঃ বার্কহার্ট (২) ২০০-২১৫ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জী ও সাহিত্য (Literatures)

ইতিহাস বিষয়কঃ

(১) রওয়াতুল আফকার ওয়াল আফহাম লে মুরতাদে হালিল ইমাম ও গাজওয়াতে যবিল ইসলাম-কৃত হুসাইন বিন গান্নাম এহছায়ী (মৃঃ ১২২৫ হিঃ)।

শায়খের (মোহাম্মদ বিন আবদুল অওয়াহ্হাবের) সীরত সম্পর্কে এ গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত। লেখক শায়খের শিষ্য এবং ঘটনাসমূহের প্রত্যক্ষদর্শী। বইটি দুই খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে ব্যক্তিগত অবস্থাদি, দাওয়াত এবং প্রচারমূলক পুস্তিকার উল্লেখ রয়েছে। কোন কোন বৃহৎ পুস্তিকা পূর্ণরূপে তাতে উদ্ধৃত করে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে যুদ্ধ ও অন্যান্য ঘটনা সমূহের ইতিহাস ১১৬০ হিজরী হতে আরম্ভ করে। ১২১২ হিজরী পর্যন্ত সালের ক্রমানুসারে লিখিত হয়েছে।

বোম্বাই মোস্তফাবীয়া প্রেসে ১৩৩৭ হিজরীতে মুদ্রিত। কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থখানা দুষ্প্রাপ্য। ব্রুক্‌লেমনের নিকটও এই মুদ্রিত গ্রন্থের কথা অজ্ঞাত ছিল। এর একটি সুন্দর পান্ডুলিপি নদওয়াতুল উলামার লাইব্রেরীতে বিদ্যমান আছে। জনাব শরফুদ্দিন এন্ড সন্সের (মোহাম্মদ আলী রোড, বোম্বাই) সৌজন্যে তার মুদ্রিত এক খন্ড সাময়িকভাবে আমাদের হস্তগত হয়। তজ্জন্য আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

(২) উনওয়ানুল মজদ ফি তারিখে নজ্‌দ- কৃত ওসমান[৩০০] বিন বিশ্‌র নজদী (মৃঃ ১২৮৮ হিঃ)। লেখক শায়খের সন্তানাদি এবং সউদ বিন আবদুল আযীযের (১৮০৩-১৮১৪= ১২১৮-১২২৯ হিঃ) সময়ে ছিলেন। শায়খের জীবনী এবং ১১৫৮ হিজরির ঘটনাপঞ্জী দ্বারা গ্রন্থটি আরম্ভ করা হয়েছে। ১ম খণ্ড ১২৩৬ হিজরীর ঘটনাপুঞ্জী এবং ২য় খন্ড ১২৬৭ হিজরির ঘটনা সম্বলিত। লেখক ১২৭০ হিজরির শা'বান মাসে পুস্তকের পান্ডুলিপি সমাপ্ত করেন। বিস্তারিত বিবরণ এবং ঘটনাপঞ্জীর সুষ্ঠু বর্ণনা হিসাবে ইবনে গান্নামের গ্রন্থ হতে এটি অগ্রগণ্য। সর্বপ্রথম অসম্পূর্ণভাবে বাগদাদে মুদ্রিত হয় ১৩২৮ হিজরী সালে। আমাদের নিক সালাফিয়া মক্কা মুকাররামাতে মুদ্রিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি বিদ্যমান।

---

[৩০০] ব্রুকলমন [টীকা (২) ১-৫ পৃঃ] ইব্‌নে বিশ্‌র (মৃঃ ১২৮৮ হিঃ) এবং ওসমান বিন কয়েদ নজদী হাম্বলী (মৃঃ ১০৯৭ হিঃ- আস্‌সাহবুল ওয়াবেলা ৮৮ পৃঃ) নাজাতেল খলফ বে এ'তেকাদেস্ সলফ এর মধ্যে গড়বড় করে দিয়েছেন।

http://www.shottanneshi.com

ঘটনা সংকলনে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লিখিত দু'টি গ্রন্থের উপরই নির্ভর করেছি। বস্তুতঃ শায়খের আন্দোলন এবং সউদ বংশের ইতিহাস সম্পর্কে এ দু'টি গ্রন্থই মূল উৎসরূপে বিবেচিত হয়।

(৩) এ ছাড়া তৃতীয় গ্রন্থ 'মসিরুল আয্দ ফি মা'রেফাতে আনসাবে মুলুকে নজদ' এর উল্লেখ দেখা যায় এবং সম্ভবতঃ নজদের শাসনকর্তাদের ইতিহাস সম্পর্কে এটাই মৌলিক গ্রন্থ। মারুতমান[৩০১] ও খায়রুদ্দীন জরকলী[৩০২] এর বরাত দিয়েছেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এ গ্রন্থটি আমার হস্তগত হয়নি।

(৪) আজায়েবুল আছার ফিত্তারাজিমে অল্ আখবার- কৃত আবদুর রহমান বিন হাসান জবরতী মিসরী (১১৬৭ হিঃ-১৭৫৪ খ্রীঃ/ ১২৩৭ হিঃ-১৮২৩ খ্রীঃ) এটি সনের ক্রমানুসারে সঙ্কলিত ১১০০ হিজরীর ঘটনা হতে ১২৩৬ হিজরীর ঘটনা সম্বলিত। মোহাম্মদ পাশার আক্রমণ এবং মিসর ও পর্শ্ববর্তী এলাকার ঘটনা সম্পর্কে আমরা জবরতীর বিবরণকেই অগ্রাধিকার দান করেছি। ৪ খন্ডে মিসরে ১২৯৭ হিজরিতে মুদ্রিত।

(৫) খুলাসাতুল কালাম ফি উমারাইল বালাদিল হারাম-কৃত আহমদ বিন জয়নী দহলান মক্কী শাফেয়ী (১২৩২-১৩০৪ হিঃ)। এতে আশরাফে মক্কার পূর্ণ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মক্কার শেষ পর্যায়ের শাসকদের এরূপ বিস্তারিত বিবরণ আমি আর কোথাও পাইনি। সুতরাং দাহলানের অবিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও আশরাফে মক্কা সম্পর্কীয় তার বিবরণকে গুরুত্ব দিতেই হয়েছে। এটি ১৩০০ হিজরিতে প্রণীত। আল্লামা রশিদ রেজা মরহুম আলহাদিয়াতুস সানীয়ার টীকায় (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) লিখেছেনঃ

"আন্দোলনের প্রারম্ভকালে ইনি মক্কা নগরীতে মুফতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং শাসকদের ইঙ্গিতেই সেই জমাতের বিরুদ্ধে তিনি কুৎসা ছড়াতে এবং ভুল তথ্য পরিবেশন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ভ্রান্ত বিবরণগুলো নিজের বিশ্বাস অনুসারেই বিবৃত করেন অথবা কারও ইঙ্গিতে- তা আলোচ্য নয়। তবে এ কথা বলা নিশ্চয়ই ভুল যে, আন্দোলনের প্রারম্ভকালেই তিনি মুফতি ছিলেন। ১২৩৩ হিজরিতে (১৮১৮ খ্রীঃ) দরঈয়ার পতন ঘটে এবং আন্দোলনের গতি সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে যায়। মুফতী আহমদ জয়নী দাহলানের যৌবনকালে কোন নজদীই সম্ভবতঃ মক্কায় আগমন করেননি।

(৬) ফতাওয়া ও এফাদাতে আবদুল ওয়াহ্হাব .... (ফার্সীতে হস্ত লিখিত) এটি একটি ক্ষুদ্র পান্ডুলিপি। এতে আমীর আবদুল আযীয বিন সউদের

---

[৩০১] মাকালা ইবনে সউদ (ইন্সাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম)

[৩০২] আল ই'লাম (১) ৫৫৮ ও ৩৬৮ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

(১১৭৯-১২১৮ হিঃ, ১৭৬৫-১৮০৩ ইং) পক্ষ হতে ফতহ আলী শাহ্ কাচারের নামে (১২১২-১২৫০ হিঃ/১৭৯৮-১৮৩৪ ইং) লিখিত একটি চিঠি এবং সাধারণ পয়গাম ছিল। পরিশেষে ফতহ আলী শাহের উত্তর ও হুমকির উল্লেখ রয়েছেঃ (১২১৯ হিঃ ১৮০৪ খ্রীঃ হস্তলিখিত মাশরিকী লাইব্রেরী ও ইংরেজী গ্রন্থ সূচী (১৩৩৭ হিঃ)।

(৭) আল বদরুত্ তালে'ঃ (البدر الطالع) কৃত মোহাম্মদ বিন আলী বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ শওকানী (১১৭৩-১২৫০ হিঃ-১৭৬০-১৮৩২ ইং) এ গ্রন্থে যদিও সউদ গোত্রের শুধু সংক্ষিপ্ত[৩০৩] জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে তবুও তার মূল্য যথেষ্ট [(১) ১৬৩ পৃঃ] কারণ মোহাম্মদ শওকানী দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং শায়খের সময় হতে তিনি সউদ বংশের উত্থান পতনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

(৮) নজদের ইতিহাস- কৃত মাহমুদ শকরী আলুছী (১২৭৩-১৩৪২ হিঃ/ ১৮৫৭-১৯২৩ ইং) এটি নজদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এতে শায়খের আন্দোলন এবং সউদ গোত্রের ইতিহাসও সন্নিবেশিত হয়েছে। বিবরণগুলো সাধারণভাবে বিশ্বস্ত। ইবনে গান্নাম ও ইবনে বিশ্‌র হতে গৃহীত শায়খ এবং তার শিষ্যদের পুস্তকাদি তার সম্মুখে ছিল। ১৩৪৩ হিজরিতে কায়রোতে মুদ্রিত।

(৯) আররেহ্লাতুল হেজাযিয়াহ্- মোহাম্মদ লবীব বতনুনী কর্তৃক প্রণীত। এতে আশরাফে মক্কার শাসকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। তিনি সম্ভবতঃ দাহ্লানের খুলাসাতুল কালামের উপর বিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন। তাতে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তাঁর সংস্কারের উল্লেখও রয়েছে। কিন্তু রেওয়ায়তের বিশদ্ধতার অপরিহার্যতা রক্ষা করা হয়নি (৭৩-৯৪ পৃঃ)। ১৩২৯ হিজরিতে মিসরে মুদ্রিত। (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

(১০) হাযিরুল 'আলামিন ইসলামী[৩০৪] (৪১ ১৬১-১৭২ পৃঃ)। নতুন নজদের ইতিহাস শিরোনামায় আমীর শকীব আরছালান স্বীয় গ্রন্থে শায়খ এবং সউদ গোত্র সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত করেছেন। অন্যের গ্রন্থের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ায় এটি নির্ভুল হতে পারেনি। তবুও এটি মূল্যবান, এটি পাঠে মোটামুটি একটা জ্ঞান লাভ করা যায়।

(১১) আয্‌যুহরা (রজব ১৩৪৫ হিঃ-৩;৭) শায়খের জীবনী সম্পর্কে মুহিব্বুদ্দীন খতীবের একটি সংক্ষিপ্ত এবং পরিপূর্ণ প্রবন্ধ। খতীব বেশীর ভাগ ইবনে বিশ্‌র এবং ইবনে গান্নাম হতে গ্রহণ করেছেন, ফলে বর্ণনাসমূহ বিশ্বস্ত।

---

[৩০৩] আল ই'লাম (১) ৫৫৮ ও ৩৬৮ পৃষ্ঠা।

[৩০৪] দ্বিতীয় সংস্করণ কায়রো ১৯৩২ ইং।

http://www.shottanneshi.com

দুই এক স্থানে 'মুশিরুল আযদ' এর উদ্ধৃতিও আছে। পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে এ প্রবন্ধের দ্বারা আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি, যদিও তার মূল পুস্তকও আমার সম্মুখে ছিল।

(১২) আস্‌রুদ্‌দা' ওয়াতিল ওয়াহ্হাবিয়াহ ফি জাযিরাতিল আরবঃ মোহাম্মদ হামীদ ফকীহ প্রণীত সংক্ষিপ্ত পুস্তক। এতে শায়খের আন্দোলন সম্পর্কে সহানুভূতিশীল আলোচনা করা হয়েছে। সউদী হুকুমত এবং নজদী আলেমদের সাথে লেখকের গভীর সম্পর্ক ছিল। সুতরাং তাঁর লেখা বিশ্বস্ত এবং অফিসিয়েলও (Official) বলা যেতে পারে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তিনি কোন স্থানেই বরাত দেননি। সমকালীন আরবগণ আরও পুস্তক রচনা করেছেন কিন্তু তাদের কেউই অনুসন্ধানের এবং ঐতিহাসিকের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেননি। (মিশরে ১৩৫৪ হিজরিতে মুদ্রিত)। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে প্রত্যেকের সমালোচনা করা সম্ভবপর হয়নি।[৩০৫]

(১৩) জযিযাতুল আরব ফিল করুনিল ইশ্‌রীন[৩০৬] ঃ কৃত হাফিয ওহবাহ্। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। লেখক সউদী সরকারের রাষ্ট্রদূত এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি। কিতাবটি অত্যন্ত গবেষণাপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। দা'ওয়াত (৩৩১-৩৪৭), আলে সউদ (২৪৩-২৭৭) এবং ইখওয়ান (৩১১-৩৩০) সম্পর্কে তিনটি স্বতন্ত্র অধ্যায় এতে রয়েছে। ভুল অতি সামান্য এবং অধিকাংশ সনের মিলও রয়েছে। মোহাম্মদ বিন সউদের ইন্তকালের তারিখ ১৭৬৫ ইংরেজীর পরিবর্তে ১৭৬৬ দিয়েছেন। (২৪৪)

অনুরূপভাবে শায়খের ওফাত ১৭৯১ সালে লেখা হয়েছে অথচ ১৭৯২ সালে হওয়াই বিশুদ্ধ। এ ছাড়া আরও যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও সামগ্রিকভাবে পুস্তকটি উপকারী।

(১৪) খালেদ বিন মোহাম্মদ আল ফরযের প্রবন্ধ, যা মাজেল্লাতুল হাজ্জে মক্কাতিল মুকাররামায় মুদ্রিত হয়েছে (৫) ৩, ৪, ৫,৬ পৃষ্ঠা।

(১৫) আত্‌হাফুননুবালা (ফার্সী পৃঃ ৪১৩-৪১৬) কৃত নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান (মৃতঃ ১৩০৭ হিঃ) এ কেতাবেও শায়খ সাহেবের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। নেজামী প্রেসে ১২৮৮ হিজরিতে মুদ্রিত) এ ছাড়া 'আত্‌তাজুল মুকাল্লাল,'

---

[৩০৫] সমসাময়িকদের মধ্যে আমিন রায়হানী নামক বিখ্যাত মিসরীয় খৃষ্টান সাহিত্যিকের পুস্তকের বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে। তার ইংরেজী ও আরবী সংস্করণও হাতে হাতে শেষ হয়ে যায়। তার 'মূলুকুল আরব' আমি দেখেছি। আমার মতে তাকে একজন ঐতিহাসিকের চাইতে অধিক মূল্য দেয়া যায় না। তাতে আধুনিক সাহিত্য আছে, কিন্তু বিষয়বস্তু কিছুই নেই। তথ্যমূলক আলোচনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

[৩০৬] তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণে এরূপ লিখা আছে। কিন্তু এই শাব্দিক ভুল মনে হয়, ফিল করুনিল ইশরীন হওয়াই বিশুদ্ধ। (অনুবাদক)।

http://www.shottanneshi.com

'মাওয়াইদুল আওয়াইদ' প্রভৃতিতেও শায়খ এবং তাঁর সংস্কার আন্দোলনের উল্লেখ রয়েছে।

(১৬) তরজুমানে ওয়াহ্হাবীয়াহ (উর্দু)। এ পুস্তিকায় নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান জমাআত সম্পর্কে বিস্ময়কর পরস্পর বিরোধী ও সামঞ্জস্যহীন উক্তি করেছেন। সম্ভবত তিনি সমসাময়িক অবস্থায় ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। অমৃতসরে মুদ্রিত ১৯৩০ ইং।

(১৭) সালাতীনে নজ্দকা মাযহাব (মা'আরিফ-নভেম্বর ১৯২৪)। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উসতায মোহতারাম মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী শায়খের আন্দোলন এবং সউদ বংশের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এর ভূমিকা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী।[৩০৭] এর উল্লেখ আলোচ্য পুস্তিকার ভূমিকায় করা হয়েছে।

(১৮) তারিখে নজ্দ– কৃত হাফিয আসলাম জয়রাজপুরী। শায়খের সীরাত, দা'ওয়াত এবং সউদ বংশের ইতিহাস সম্বলিত পুস্তিকা। অধিকাংশ বিষয়ে ইবনে গান্নাম এবং ইবনে বিশরের গ্রন্থাবলির উপর নির্ভরশীল। নির্ভুল না হলেও সরল ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের হিসাবে উপকারী সন্দেহ নেই।

(১৯) সুলতান ইবনে সউদঃ সুলতান ইবনে সউদের সর্দার মোহাম্মদ সাহেব হাছানী বি, এ, -কর্তৃক প্রণীত। এতে শায়খের দা'ওয়াত সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় (৩৯-৪৫) রয়েছে। আলে-সউদ ও আলে রশিদের ইতিহাসও দেয়া হয়েছে। (পৃঃ ৪৫-৭০) গ্রন্থটি ইংরেজী পুস্তিকার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল বলে মনে হয়। আরবী এবং ইসলামীয়াতের সাথে যেন লেখকের কোন সম্পর্কই নেই। তার জ্ঞান গরিমার অবস্থা এই যে, তিনি-

مقرن کو مکرن اور مشاري کو مشعري ثنيان کو طوهنيان লিখেছেন مکران সুনইয়ানকে তৌহিনীয়ান লিখেছেন (৮ পৃষ্ঠা)। অনুরূপভাবে (عينيه کو عيونية الحساکوا عصا ص ٤٢) লেখা হয়েছে। ইতিহাসগত মূল্যের অবস্থা এই যে, তিনি মোহাম্মদ বিন সউদের মৃত্যু সন ১৭৬৪ ইংরেজী (১৭৬৫ ইং ১১৭৯ হিঃ) এবং আবদুল আযীয বিন সউদের শাহাদতের তারিখ ১৮০২ (১৮০৩ ইং ১২১৮ হিঃ)) বলেছেন (৪৩-৪৪ পৃঃ)। সর্বাধিক মজার ব্যাপার এই যে, লেখকের বর্ণনানুসারে ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল কর্তৃক মোওয়াত্তা ইমাম

---

[৩০৭] মওলবী ইসমাঈল গজনবী 'আল হাদীয়াতুস সানীয়াহ'র উর্দু তরজমা করেছেন। তরজমা যাই হোকনা কে তিনি অবিচার করেছেন এই যে, জনাব সৈয়দ সাহেবের ভূমিকাকে তার উপক্রমণিকায় এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যাতে তারই লেখা বলে মনে হয়। আল্লাহ তার ত্রুটি ক্ষমা করুন।

http://www.shottanneshi.com

Contents

আহ্মদ হাম্বল প্রণীত হয়েছিল (৪৫পৃঃ)। আপনারাই বলুন, এর মূল্য কতটুক? যে ব্যক্তির জ্ঞানের বহর এরূপ তার পক্ষে সুলতান ইবনে সউদের জীবনী লেখার কী প্রয়োজন ছিল? আমরা ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে এর উল্লেখ করেছি শুধু উপদেশ লাভের উদ্দেশ্যে। "ওয়াহ্হাবী"দের সম্পর্কে ইনি যে সব অপবাদ রচনা করেছেন (পৃঃ ২৬২-২৬৩) তা উল্লেখ করার আর কোন প্রয়োজনই করে না।

(২০) নাইবুরের (সফরনামা)। সফরনামা (Travels through Arabia and other countries in the East[308]

পাশ্চাত্যের পর্যটক মন্ডলীর মধ্যে ইনিই প্রথম পর্যটক যিনি তার সফর নামায় নজদ এবং শায়খুল ইসলামের আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও (২-১৩১-১৩৬ পৃঃ) মূল্যবান এ জন্য যে, এটি অতি প্রাচীন ইউরোপীয়ান গ্রন্থ।

নাইবুর এবং তার সঙ্গীগণ-১৭৬১ সনে ডেনমার্ক হতে রওয়ানা হন[৩০৯] এবং ১৭৬২ সালে তারা এ্যামানে পৌঁছেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তার সঙ্গীগণ সকলেই পরলোক গমন করেন। শুধু নইবুর একাই জীবন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করেন ১৭৬৫ সালে। তার সফরনামা আরবের বিশেষতঃ এ্যামানের, ভৌগোলিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যবহুল গ্রন্থ। অধিকাংশ ঐতিহাসিক তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বিশুদ্ধতার প্রশংসা করেছেন।[৩১০]

নইবুর নিজে নজদে যেতে পারেননি। সুতরাং শোনা কথার উপর নির্ভর করার জন্য তার বিবরণ বিশুদ্ধ হতে পারেনি। তবে তিনি শায়খের জীবদ্দশায় এবং আন্দোলনের প্রারম্ভিক অবস্থায় আরবে পৌঁছেছিলেন। সুতরাং তার বিবরণের মূল্য কমও নয়। রিয়াজ বিজয় ছিল ১৩৮৭ হিজরী মোতাবেক ১৭৭৩

---

৩০৮ আমীর শকীব আরসালান তার পুরা নাম (Caresten Nie buhr) লিখেছেন। (পরিশিষ্ট তারিখ ইবনে খালদুন (১) ৭৭ পৃঃ)

৩০৯ নইবুরের সঙ্গীদের মধ্যে জনৈক জার্মান আলেম রাতকীনও ছিলেন। আমীর শকীব আরসালান তাঁর পৌত্রের সাথে সাক্ষাতের উল্লেখ করেছেন।

৩১০ হোগার্থঃ ৬৪-৬৭ পৃঃ। আরব দেশে যেসব ইউরোপিয়ান পর্যটক এসেছিলেন তাদের সম্বন্ধে ডঃ শেখ এনায়েতউল্লাহ সাহেবের একটি সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান প্রবন্ধ আরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন লাহোরে মুদ্রিত হয়েছিল। (মে ও আগষ্ট ১৯৩৭ ইং 'দিয়াওে আরবকে মাগরিবী ছাইয়াহ্') এ প্রবন্ধ পাঠেই সর্ব্বপ্রথম এদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতঃপর হোগার্থের প্রবন্ধে অধিক লাভবান হই। ফেলবীও নইবুরের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন, ৭-২২ পৃঃ।

http://www.shottanneshi.com

Contents

ইং সালে। নইবুরের সফরনামার ইংরেজী তরজমা আমাদের সম্মুখে রয়েছে। অনুবাদকের নাম (Robdert Heron) ১৭৯২ সালে এডিনবরায় মুদ্রিত।

(২১) বাদিয়া (Badia) যিনি আলী বেগ আব্বাসী নাম ধারণ করে ১৮০৭ সালে জিদ্দায় অবতরণ করেন এবং মক্কা পরিদর্শন করেন। কিন্তু নজদী শাসকগণ তাকে মদীনা গমন করতে দেননি। ইনিই প্রথম পাশ্চাত্য পর্যটক যিনি ওয়াহ্হাবী নজদ এবং তার রাজধানী দরঈয়া সম্পর্কে অনেকে তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। তাঁর সফরনামার ইতিহাসভাগের গুরুত্ব অত্যধিক এ জন্য যে, হেজাযে মিসরীয়দের অনুপ্রবেশের পূর্বে তিনি ওয়াহ্হাবী সরকার সম্পর্কে যা লিখেছেন তা একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও সমসাময়িকের সাক্ষ্য স্বরূপ। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, এটি আমাদের হস্তগত হয়নি। আমরা হোগার্থের মাধ্যমে তার সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছি Penatration of Arabia 74-82 P.

(২২) বার্কহার্টের গ্রন্থ Notes on the Bedouins and the Wahhabya (দ্বিতীয় খন্ড) ৯৫-৩৪৯ পাশ্চাত্যের এই পর্যটক ১৮১৪ ইং সালে হেজাযে পৌঁছে। এ সময়ে মোহাম্মদ আলী পাশা নজদীদেরকে হেজায হতে বিতাড়িত করতে সফলতা লাভ করেছিল এবং ১৮১৬ সালে সে মিসরে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিল। সেখানেই অল্পদিন পরে সে মারা যায়।

বার্কহার্ট দরঈয়া ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্থানের বিস্তারিত ভৌগোলিক বিবরণ দান করেছে। সফনামায় প্রথম খন্ডে সে (Travels in Arabia) মক্কা মোআজজমা এবং হজ্ব প্রভৃতির যে বিস্তারিত বিবরণ দান করেছে তা স্বস্থানে অতি বিশ্বস্ত। মক্কা মোআজজমার নেযামে হুকুমত সম্পর্কেও তার আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ।[৩১১] রিচার্ড বরটন যিনি[৩১২] ১৮৫০ সালের পর মক্কা এবং মদীনা সফর করেছেন- বার্কহার্টের প্রশংসার তিনি পঞ্চমুখ। কিন্তু অত্যন্ত তথ্যানুসন্ধানী হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও তিনি বার্কহার্টের চেয়ে অধিক কোন তথ্য সংযোজন করতে পারেননি।[৩১৩]

তার সফরনামার প্রথম দুই খন্ড ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয় এবং শেষ দুই খন্ড (Notes) ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এ চারটি খন্ডই আরবও তার

---

[৩১১] Travels etc ঃ৪০৫-৪৪৪

[৩১২] ক্যাপটেন স্যার বিচার্ড বরটন (R.F. Burton) বার্কহার্টের প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে হেজায ভ্রমণ করেন। কিন্তু নজদবাসী সম্পর্কে তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেননি। তাঁর সফরনামার একটি বিশেষ সংস্করণ দুই খন্ডে ১৮৯৩ সালে লন্ডনে অতি জাঁকজমকের সাথে মুদ্রিত হয়েছে। (লন্ডন ১৮৯৩ খ্রীঃ)

[৩১৩] হোগার্থ -৮৯, ৯০ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

ভৌগোলিক বিবরণে পরিপূর্ণ। আমাদের আলোচনা তার দ্বিতীয় খণ্ড (Notes on etc.) এর (২) সম্পর্কেই ছিল। মোহাম্মদ আলী মিসরী কর্তৃক হেজায আক্রমণ এবং মিসর ও হেজাযের যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে তার বিবরণ অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যস্বরূপ।

(২৩) ব্রাইজিসের (Harford Joins Brydges) গ্রন্থ A brief history of the Wahhabys. সে একজন ব্রিটিশ অফিসার হিসাবে ১৭৮৪ সালে বসরায় গমন করে এবং ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। উভয় স্থানে পলিটিক্যাল এজেন্টরূপে ছিল। সউদ বিন আবদুল আযীযের সাথে তার সম্পর্ক ভালই ছিল। সে শায়খুল ইসলামের যুগেই আরবে এসেছিল এবং সউদ বিন আবদুল আযীযের বিজয়কালে সেখানেই ছিল। এ হিসাবে তার গ্রন্থের গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য হওয়া উচিত। কিন্তু পরিতাপ এই যে, তাতে সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাব বিদ্যমান। বিভিন্ন স্থানে সে বার্কহার্টের অবিকল অনুকরণ করেছে যিনি তার পরে হিজাযে আগমন করে পূর্বেই মারা গেছেন।

গ্রন্থটি ১৮৩৪ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। অথচ বার্কহার্টের গ্রন্থাবলী ১৮২৯ ও ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। সে নিজেও বার্কহার্ট হতে উপকৃত হওয়ার কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছে। তবে কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিও করেছে।[৩১৪] কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো বার্কহার্ট হতে অক্ষরে অক্ষরে নকল করে দিয়াছে।

(২৪) পালগ্রেভের (W. Gifford Pagrave) সফরনামা Narrative of a year's Journey through central and Easern Arabia)

ইনি একজন ক্যাথলিক খৃষ্টান, শহুরে জীবনে অভ্যস্ত এবং স্বাভাবিক আরামপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি ১৮৬২ -৬৩ সালে আরব সফর করেন। তিনি শহরবাসী আরবদের (হেসা, কতীফ প্রভৃতির অধীবাসীর) অতি প্রশংসা করেছেন। কিন্তু পল্লীবাসীদের সম্পর্কে সহানুভূতি প্রদর্শনের একটি শব্দও তার কাছে নেই। লেখক নজদবাসী শায়খ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তার অনুসারীদের অত্যন্ত কুৎসা রটনা করেছেন। যোয়ায়মীর (টীকা ১৯৮) এবং হিউজিসের (৫০ পৃঃ) মতে ওয়াহ্হাবীদের কুৎসা রটনায় তার ক্যাথলিক প্রভাব

---

[৩১৪] বার্কহার্টের বর্ণনা ১৮১৬ সালের মধ্যভাগে সমাপ্ত হয়। ব্রাইজিস এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেছেন। সে দরঈয়া অবরোধের (১৮১৮ইং) পূর্ণ বিবরণ ফরাসী ঐতিহাসিক এর M. Mengin (History de l, Egypt sons le Government de Mohammad Aly) মোহাম্মদ আলীর শাসনামলে মিসরের ইতিহাস হতে অক্ষরে উদ্ধৃত করে দিয়েছে। (১৩৫-১৬১পৃঃ)

http://www.shottanneshi.com

প্রকট রয়েছে। জোয়ায়মিরের মতে বেশীর বেশী ১৮৬০-৬৩ সালের ঘটনা সম্পর্কে তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায়। কিন্তু আমাদের মতে কোন বিষয়েই শুধু তার বর্ণনা অনুসারে মীমাংসা করা যেতে পারে না। শায়খ সম্পর্কে সে যা লিখেছে তা আবর্জনার সমষ্টি মাত্র। সউদ গোত্রের ইতিহাসও নাম ও তারিখের স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। হিউজিস সুন্দর কথাই বলেছেন যে, তার বিবরণাদি হৃদয়গ্রাহী কিন্তু সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য (Notes ete ২১১ পৃষ্ঠা)।

জোয়ায়মির বলেন, একজন ক্যাথলিকের নিকট এরূপ আশা করা যেতে পারে না যে, সে সংস্কার ও সলফিয়তের দাওয়াতের উল্লেখ ভালভাবে করবে। (টীকা ৯৮ পৃষ্ঠা) স্বয়ং শায়খুল ইসলাম সম্পর্কে সে যেসব বেহুদা কথা বলেছে তাও অত্যন্ত দুর্বল এবং দৃষ্টিপাতেরও যোগ্য নয়। ফলতঃ সে তার সমসাময়িকদেরও বিশুদ্ধভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি। শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তার পুত্র আবদুল লতিফ বিন আবদুর রহমান বিন হাসানকে আবদুর রহমান আবদুল্লাহর পুত্র বলে উল্লেখ করেছে (৩৭৯ পৃঃ) অধিকন্তু সে এও বলেছে যে, আবদুল্লাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবকে (?) দরঈয়াতেই ইবরাহীম পাশার নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল। মজার ব্যাপার এই যে, সে রিয়াজে শায়খ আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎও করেছিল। তার সফর- নামা দুই খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে (১৮৬৫ইং)

(২৫) লিউস প্লীর A political mission to Najd এই ব্যক্তি বোনামক শহরে বৃটিশ রেসিডেন্ট ছিল। ১৮৬৫ সালে ফয়সল বিন তুর্কীর (মৃঃ ১৮৬৫ ইং, ১২৮২ হিঃ) সাথে পারস্য উপকূলবর্তী এলাকা সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিয়াদে আগমন করে। তার গ্রন্থটি আমাদের হস্তগত হয়নি। তাতে হয়ত কিছু উপকরণ থাকতে পারে। হিউজিস তার প্রমাণপঞ্জীতে তার উল্লেখ করেছেন। হোগার্থ লিউসপ্লীর মিশন সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। কিন্তু তার ঐতিহাসিক তথ্যাদির উল্লেখ মোটেই করেননি।

(২৬) বেজরের (G. Percy Bedger) Imams and Syeds of Oman গ্রন্থটি আসলে একটি আরবী হস্তলিখিত গ্রন্থের (কৃত; সলিল বিন রুযায়ক) অনুবাদ। এতে ওমানের শাসনকর্তাদের পূর্ণ ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। (ইসলামের প্রারম্ভ হতে ১৮৫৬ ইং পর্যন্ত) ইংরেজী তরজমাতে বেজর বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনী এবং একটি বিস্তারিত উপক্রমণিকাও সংযোজন করেছে। এতে গ্রন্থের পূর্ণ বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করা হয়েছে এবং ওমানের ইতিহাসও ১৮৭০ সাল পর্যন্ত পুরাপুরি লিখিত হয়েছে।

http://www.shottanneshi.com

যেহেতু আলে সউদের আন্দোলন এবং রাজনৈতিক উন্নতি উভয়ই পারস্য উপকূল এবং আরব উপদ্বীপের সমগ্র উপকূলে ছড়িয়েছিল, সেই হেতু তার ইতিহাসের আলোচনাও মধ্যে মধ্যে স্থান পেয়েছে। বেজরের টীকাসমূহ সাধারণতঃ তত্ত্বমূলক ও উৎকৃষ্ট। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নজদ সম্পর্কীয় তার আলোচনা পালগ্রীভের উপর অধিক নির্ভরশীল। আলে সউদ সম্পর্কীয় আলোচনার বেশীরভাগ তথ্যাদি রাজনৈতিক বিরোধ এবং আক্রমণাদির বিবরণ সম্পর্কীয়। ফলে আলোচ্য পুস্তিকায় তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়নি। (১৮৭১ সালে লন্ডনে মুদ্রিত)।

(২৭) ডাউটী (daugty) পালগ্রীভের তের বৎসর পর ১৮৭৫ সালে নজদে আগমন করে। বেদুঈনদের সামাজিক জীবনধারার বিশ্লেষণ, ভৌগোলিক ও ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দিক দিয়ে তার সফরনামার যে মূল্যই হোক না কেন, নজদবাসীর ইতিহাস সম্পর্কে সে কোন বিশেষ আলোচনা করেনি। শুধু ভবিষ্যদ্বাণীই করেছে-

ওয়াহ্হাবী হুকুমত মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এখন তার পুনরুজ্জীবনের আশা সুদুর পরাহত। ... সাধারণতঃ নজদে এ গুজব ছড়িয়ে রয়েছে। (২) ৪২৫ পৃঃ।

বাস্তব ঘটনাবলী এই ভ্রান্ত ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। ... তার সফরনামা Travels in Arabia deserta দুই খন্ডে সমাপ্ত (১৮৮৬ এবং ১৯২১ খ্রীঃ)

(২৮) লেডী এনী বস্নান্টের (Anne Blunt) সফরনামা A Pilgrimage to najd) বিখ্যাত রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও কবি উইলফ্রিড স্কাউন ব্লান্ট (Wilfrid Scown Blunt এবং তার স্ত্রী লেডী ব্লান্ট) বিখ্যাত কবি বাইরনের (পৌত্রী) সম্ভবতঃ উৎকৃষ্ট অশ্বের অন্বেষণে আরব এবং নজদে সফর করেছিলেন (১৮৭৯ ইং)। লেডী ব্লান্টের সফরনামার সাথে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। ভূমিকা ও পরিশিষ্টে (যা স্বয়ং ওইলফ্রিড লিখেছেন) নজদের ভৌগোলিক বিবরণ এবং 'ওয়াহ্হাবীয়তের' উন্নতি ও অবনতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। (১ম খন্ড ২৫১-২৭১ পৃঃ) যদিও তাতে ভ্রান্তির যথেষ্ট সমাবেশ রয়েছে। তবুও সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাবে উপকারী। আলোচ্য পুস্তিকায় যেখানেই ব্লান্টের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই এই পরিশিষ্টই উদ্দেশ্য। মূল সফরনামা দুই খন্ডে লন্ডনে মুদ্রিত হয়েছে ১৮৮১ সালে।

http://www.shottanneshi.com

উয়িলফ্রিড ব্লান্টের ফিউচার অব ইসলাম-এ (৪২, ৪৬, ১০৬ পৃঃ) শায়খের দা'ওয়াতের উল্লেখ রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণেও বিভিন্ন ভ্রান্তি ও ভুল তথ্যের নমুনা দেখা যায়- ভ্রান্তিমূলক বিবরণের সময় যার প্রতি ঈঙ্গিত করা সম্ভব হয়নি।

(২৯) হিউজিসের (Thomas P. Hughes) ডিকশনারী অব ইসলাম (Dictionary of Islam)[315]

এই প্রটেষ্টান্ট মিশনারীর এই প্রবন্ধ অনেক মুসলমান আলেমের লেখার চেয়েও উৎকৃষ্ট। আন্দোলনের উদ্দেশ্য উদ্ধারে তিনি ভুল করেননি। অধিকন্তু তিনি শায়খের শিক্ষা সমূহের অতি উত্তম সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। তবে এতে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি বিদ্যমান যা ব্রাইজিস ও ব্লান্টের অনুকরণের ফলেই হয়েছে। আলোচ্য পুস্তিকায় যেখানে হিউজিসের উদ্ধৃতি রয়েছে, সেখানে এই প্রবন্ধকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। (১৮৮৫ সালে লন্ডনে মুদ্রিত)।

(৩০) এই হিইজিসেরই অপর প্রবন্ধ (The Wahhbi) তার সংক্ষিপ্ত পুস্তি কার (Notes on Mohammadanism) ২১৯-২২৬ পৃষ্ঠায় সাধারণ আকীদা ছাড়াও সউদ বংশের সুলতানগণের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেয়া হয়েছে- ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত। এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ডিকশনারী অব ইসলামের (Wahhabi) প্রবন্ধের চেয়েও কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে। বিশেষতঃ পাক ভারতী মোজাহেদীন সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। এখানে তার আলোচনার স্থানাভাবে। নোটের উল্লেখসহ এ প্রবন্ধের উল্লেখ কোন কোন স্থানে করা হয়েছে। (১৮৭৭ মালে লন্ডনে মুদ্রিত)।

(৩১) জোয়ায়মিরের (Zwemer) Arabia the cradle of Islam.

জোয়ায়মীর বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও শায়খের আন্দোলনকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছেন। অধিকন্তু তিনি এ আন্দোলনের পূর্বকালীন আরবের অবস্থাদির সঠিক পর্যালোচনাও করেছেন- (১৯২-৯৩ পৃঃ) তাঁর গ্রন্থের এ অধ্যায়ে তিনি শুধু তিনটি ঐতিহাসিক ভুল করেছেন। (১) জন্ম সাল ১৬৯১ ইং (২) বাগদাদের সফর (৩) গুম্বদে রসূলের বিধ্বস্তিকরণ, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রকাশে তাঁর বিদ্বেষ সুপ্রকটিত। তিনি বলেছেন,

এটি ইসলামের সংস্কারের আন্দোলন ছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হয়ে সমাপ্ত হয়েছে (Disaster) এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটি বিরাট তামাশা প্রতিপন্ন হয়েছে (১৯১-৯২ পৃঃ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১২ সাল)।

(৩২) হোগার্থ- David George Hogarth এর The Penetration of Arabia)

---

[৩১৫] মাকালা ওয়াহ্হাবী ৬৫৯-৬৬২ পৃষ্ঠা।

http://www.shottanneshi.com

Contents

হোগার্থ এতে সেই সমস্ত ইউরোপীয়ান পর্যটকদের প্রচেষ্টাসমূহের বিস্তারিত ও তথ্যপূর্ণ পর্যালোচনা করেছেন যাঁরা গত তিন শতাব্দীতে আরব দেশসমূহের পর্যটন করেছেন এবং সেখানের ভূগোল, ইতিহাস, স্মৃতিসমূহ ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কীয় যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে সেই পর্যটকগণের তৎপরতা সম্পর্কেও পর্যালোচনা করা হয়েছে যারা শায়খ এবং তাঁর স্থলাভিষিক্তগণের শাসনকালে নজদ ও হেজায ভ্রমণ করেছেন। আমরা হোগার্থের বিভিন্ন বিবরণ মূল সফরনামার সাথে মিলিয়ে দেখেছি, কোথাও গরমিল দেখতে পাইনি- সুতরাং আসল সফরনামার অবিদ্যমানতায় তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ও পর্যালোচনা দ্বারাও উপকৃত হওয়া যেতে পারে। (১৯০৪ সালে লন্ডনে মুদ্রিত)

আলোচ্য পুস্তিকায় যেখানেই হোগার্থের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এ গ্রন্থই উদ্দেশ্য।

হোগার্থের অপর একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থেও (A History of Arabia) আশরাফে মক্কা (৮২-৯৩ পৃঃ), ওয়াহ্হাবী এবং মিশরীয় সম্পর্কে দু'টি অধ্যায় রয়েছে (৯৯-১১৩ পৃঃ) কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এখানে তিনি মোহাম্মদ বিন সউদ, আবদুল আযীয বিন মোহাম্মদ বিন সউদ এবং সউদ বিন আবদুল আযীযের মধ্যে সঠিক পার্থক্য করতে পারেননি (১০৩ পৃঃ)

(৩৩) ফেলবীর (H.ST.J B. Philby) গ্রন্থ 'Arabia' ১৯৩০ সালে লন্ডনে মুদ্রিত (The Modern World series)|

ফেলবী এ গ্রন্থে শায়খের আন্দোলন হতে শুরু করে সুলতান আবদুল আযীয বিন আবদুর রহমান বিন ফয়সল বিন তুর্কী বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন সউদ পর্যন্ত নজদের পূর্ণ ইতিহাস লিখেছেন। শায়খের সীরত এবং দা'ওয়াত সম্বলিত অংশ সম্পূর্ণরূপে ইবনে গান্নাম ও ইবনে বিশ্‌র হতে গৃহীত।[৩১৬] গ্রন্থটি সর্বদিক দিয়ে উপকারী এবং মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ। আমরা এর দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। মূল গ্রন্থটি আমাদের সম্মুখে ছিল।

গ্রন্থখানার অপর একটি দিকও রয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য এই যে, আরব দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষক আবশ্যক এবং এজন্য নজদী শাসকগণই অধিক উপযোগী। তিনি শরীফ হোসাইনের সহায়তা ও ইবনে সউদের সম্পর্কে উদাসীন থাকার জন্য বৃটিশ, ভারত, বসরা ও বাগদাদ সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

---

[৩১৬] ফেলবী নিজেও ভুমিকায় ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, এটাই প্রথম পুস্তক যা আসল ভিত্তিতে ইংরেজীতে সঙ্কলিত হয়েছে। তিনি ঠিকই লিখেছেন। শায়খ সম্পর্কে কোন পাশ্চাত্য ভাষায় এরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞাতব্য সম্ভবতঃ অন্য কোথাও একত্রে পাওয়া যাবে না।

http://www.shottanneshi.com

Contents

ফল কথা এই যে, আরব উপদ্বীপে বৃটিশ ডেপলোমেসী সম্পর্কে এ গ্রন্থে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার সাথে তার কোন সামঞ্জস্য নেই।

(৩৪) মারুতমানের (Mordmann) প্রবন্ধ (ইবনে সউদ এবং ইবনুর রশীদ (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম)।

তাঁর এ গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হলেও সর্বাঙ্গীন সুন্দর এবং বিশুদ্ধ সন ও তারিখের নির্দ্দিষ্টকরণ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁর পূর্বে কেউ তারিখের নির্দিষ্ট করণ এবং হিজরী ও ইংরেজী সনের সমীকরণের আবশ্যকীয় প্রচেষ্টা চালাননি। আমরা কোন কোন স্থানে তার সাথে বিরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু ইবনে সউদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বিশেষ উপকৃত হয়েছি।

(৩৫) মারগোলিয়থের (D.S. Margoliouth) দু'টি প্রবন্ধ (ক) ওয়াহ্হাবীয়া (Wahhabiyah) ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (খ) ওয়াহ্হাবী (Wahhabies) ইনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলীজন্স এন্ড এথিক্স উভয় প্রবন্ধই ভ্রমপূর্ণ। ভুলতো প্রত্যেকেরই হয়। কিন্তু তার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এত অধিক ভ্রম আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হবে না। আলোচ্য পুস্তকে যেখানে মার্গোলিওথের বরাত দেয়া হয়েছে সেখানে প্রথম প্রবন্ধের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৩৬) রাভেন শোর (T.E Ravenshow) স্মরণিকা মেমোরেন্ডম (Memorandum) যদিও এ স্মরণিকার সম্পর্ক মওলানা আহমদুল্লাহ সাদেকপুরীর (মৃঃ ১২৯৮ হিঃ) মকদ্দমা এবং পাক-বাংলা-ভারতীয় মোজাহেদীনের সংস্কার ও জেহাদের সাথে রয়েছে, তবুও এতে শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে বহু ভুল বিবরণ দেয়া হয়েছে। এর একটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন আলোচ্য পুস্তিকার ৫ম অধ্যায়।

স্মরণিকাটি ১৮৬৫ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বরের গেজেটের পরিশিষ্টরূপে পুরা মুদ্রিত হয়েছে।

(৩৭) উইলিয়ম ওয়েলসন হান্টারের (W.W. Hunter) The Indian Musalmans হিন্দুস্থানের মুসলমান (১৮৭১ সালে মুদ্রিত।)[৩১৭]

---

[৩১৭] বর্তমানের গ্রন্থটি দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়ে গেছে। আলোচ্য পুস্তিকা দ্বিতীয়বার সম্পদনাকালে এ নব সংস্করণই আমাদের সম্মুখে ছিল। (কলিকাতা ১৯৪৫)

http://www.shottanneshi.com

Contents

আসলে গ্রন্থটি ভারতীয় মোজাহেদীনের তৎপরতা সম্পর্কে প্রণীত। কিন্তু যেহেতু লেখক এ ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনকে শায়খের আন্দোলনের পরিণতি বলে ধরে নিয়েছেন, সুতরাং শায়খের দাওয়াত সম্পর্কেও তিনি বহু আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে হান্টার সাহেব নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন অধিক। পূর্বে এর কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ স্থলে তিনি রাভেনশোর উপরই নির্ভর করেছেন। যদিও তিনি বরাত দিতে অভ্যস্ত নন।[৩১৮]

(৩৮) Andre servier এর Islam and Psychology of the Musalmans) মূল ফরাসী ভাষার অনুবাদঃ লন্ডনঃ ১৯২৪ ইং)। ইনি মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর দলকে অত্যধিক গালিগালাজ করেছেন। স্বয়ং ইসলামই তার নিকট মানবতার সর্বপ্রকার উন্নতির শত্রু (২৬৪ পৃঃ)। এটি পালগ্রীভের চর্বিত চর্বণ বলেই মনে হয়।

(৩৯) Wilson Cash) কেশের (The Wxpanaion of Islam ১৯১৮ সালে লন্ডনে মুদ্রিত।

এই লেখকের ধারণা যে, মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব "আরবী ইসলাম" চেয়েন (১৯১ পৃঃ) এরূপ ভ্রান্ত ধারণা ও উক্তিতে তার গ্রন্থ পরিপূর্ণ। অবশ্য উপরোক্ত দু'টি গ্রন্থেরই আনুসঙ্গিকভাবে শায়খের আন্দোলনের উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪০) রিচার্ড কোকের (Richard Coke) The Arab's place in the sun (১৬১-১৭০ পৃঃ) আন্দোলন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত উত্তম সমালোচনা। কিঞ্চিৎ ভুল-ভ্রান্তি এবং নামের উলটপালট রয়েছে। সউদ বিন আবদুল আযীযের তৎপরতাকে তিনি আবদুল আযিযের সাথে সম্পর্কিত করে দিয়েছেন (১৬৩ পৃঃ)। আবদুল্লাহ বিন সউদ এবং সউদ বিন আবদুল আজিজের মধ্যে তিনি যথাযথ পার্থক্য করতে পারেননি। (১৬৩ পৃঃ)

৩৪ নম্বর হতে ৪০ পর্যন্ত যেসব পুস্তক পুস্তিকার উল্লেখ করা হয়েছে তা মূল বরাতরূপে নয় বরং শুধু সাধারণ সাহিত্য বা Literature হিসেবেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূচী অতি দীর্ঘ। সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে একেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অতি দীর্ঘ। সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে একেই যথেষ্ট মনে করা

---

[৩১৮] এ সম্পর্কে আমরা যত গ্রন্থ একং প্রবন্ধের উল্লেখ করেছি সেই সমস্তেই নজদ ও হিন্দুস্থানের আন্দোলনকে এক বলা হয়েছে। কেহ কেহ মৌলিক ঐক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ লেখকসৈয়দ আহমদ শহীদের জেহাদ ও সংস্কার আন্দোলনকে শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের আন্দোলনের শাখারূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য মৎপ্রণীত 'হিন্দুস্থান কী পহ্লী ইসলামী তাহ্রীক' দ্রষ্টব্য।

http://www.shottanneshi.com

হয়েছে। কোন কোন গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ মূল গ্রন্থেই করা হয়েছে যথা ইস্টার্ডডের (Lothrop Stoddard) নতুন ইসলামী দুনিয়া (The New World of Islam) প্রভৃতি।

২। ধর্মীয় (ক)

তৌহিদ এবং ইনকারে বিদআৎ (বিদআতের প্রতিবাদ) সম্পর্কে এত পুস্তকাদি রচিত হয়েছে যার সংখ্যা নিরূপণ করা একান্তই মুশকিল। বিশেষতঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (মৃঃ ৭২৮ হিঃ) এবং তার যোগ্যতম শিষ্য ইমাম ইবনে কাইয়্যেম (মৃত ৭৫১ হিঃ) প্রণীত গ্রন্থরাজী এ আলোচনায় পরিপূর্ণ। আমরা এখানে শুধু সেই সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করছি- আলোচ্য পুস্তক রচনাকালে যেগুলো পাঠ করার সুযোগ আমার ঘটেছে এবং শায়খ (মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব) এর আন্দোলন সম্পর্কে তদ্দারা কিঞ্চিৎ সাহায্য লাভ হয়েছেঃ

১। আল বাইছু আলা ইনকারিল বেদায়ে ওয়াল হাওয়াদীছে কৃত মোহাম্মদ আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আবু শামাতা মাগরিবী (মৃত ৬৬৫ হিঃ ১৩১০ হিজরীতে মিসরে মুদ্রিত।)

২। তজরীদুত্তাওহীদিল মুফীদঃ কৃত শায়খ তকীউদ্দীন আহমদ বিন আলী মুকরেজী (মৃত ৮৫৪ হিঃ) মিসরে ১৩৪৩ হিঃ মুদ্রিত।

৩। তৎহীরুল এ'তেকাদ আন আদরানিল ইলহাদঃ কৃত মোহাম্মদ বিন ইসমাঈল আলআমীরুল এমানী সানআনী (মৃতঃ ১১৮২ হিঃ, মিসরে ১৩৪০ হিঃ তে মুদ্রিত।)

৪। কিতাবুত্ তাওহীদঃ কৃত শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (মৃতঃ ১২০৬ হিঃ)। উসতাজ ডঃ তকীউদ্দীন হেলালী মরাকেশীর পরিশিষ্টসহ হিজরীতে মুদ্রিত। এ ছাড়া শায়খের অন্যান্য রচনাবলী।

৫। আদ্দুররুন নযীদ ফী ইখলাসে কালেমাতি তাওহীদ– কৃত মোহাম্মদা বিন শাওকানী (মৃতঃ ১২৫০ হিঃ) এর উর্দু তর্জমাও কৃত মাওলানা মোহাম্মদ আলী কাসূরী এম, এ ১৯২৪ সালে মুদ্রিত হয়ে গেছে।

৬। আত্তোহাফু ফী মযাহবিসসালাফ- কৃত শওকানী (মিসর ১৩১০ হিঃ)

৭। মাজামুআতুল হাদীয়াতুস সনিয়াহ ওয়াত তোহফাতিল ওয়াহ্হাবীয়াতিন নজদীয়াহঃ সঙ্কলন- সোলায়মান বিন সাহমান নজীদ। তিনি নজদের বিখ্যাত আলেমদের মধ্যে গণ্য। শেখ আবদুর রহমান বিন হাসান আলুশ শায়খের (মৃতঃ ১২৮৫ হিঃ) এবং শেখ আবদুল লতীফ বিন হাসান উভয়ের নিকট হতে উপকৃত হয়েছেন। ৮৬ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (১৩৩৯ হিঃ)। এ সঙ্কলনে নিম্নবর্ণিত পুস্তিকা রয়েছেঃ

http://www.shottanneshi.com

ক। আররিসালাতুদদীনীয়াহ্ ফী মা'নাল এলাহিয়াহ (৩-২৮) কৃত আমীর আবদুল আযীয় বিন মোহাম্মদ বিন সউদ (মৃঃ ১২১৮ হিঃ)

খ। শায়খের সীরাত ও শিক্ষা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ (২৮-৪০) কৃত শেখ আবদুল লতিফ বিন আবদুর রহমান আলে শায়েখ (মৃতঃ ১২৯৩ হিঃ)

গ। আররিসালাতুস সালেসাহ্ (৪১-৪৫) কৃত- শেখ আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (মৃঃ ১১৪২ হিঃ) ১২১৮ হিজরীতে যখন সউদ বিন আবদুল আযীয প্রথমবার বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তখন মক্কাবাসীর শিক্ষার জন্য পুস্তিকাটি রচিত হয়েছিল।

ঘ। আল ফাওয়াকেহুল উজাব ফির রদ্দে আলা মাললাম য়্যুহাক্কিমিস সুন্নাতা ওয়াল কিতাব (৫৫-৯০) কৃত- শেখ আহমদ বিন নাসের বিন ওসমান নজদী (মৃঃ ১২২৫ হিঃ),

আমীর আবদুল আযীযের পক্ষ হতে যখন শেখ আহমদ বিন নাসের হেজাযে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং হরমের (মক্কার) আলেমদের সাথে তাঁর মোনাযারা (তর্কানুষ্ঠান) হয়েছিল, তখন তিনি এ পুস্তিকা রচনা করেছিলেন।

ঙ। আররিসালাতুল খামেসাহ্ (৯১-৯৯ পৃঃ) কৃত- শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল লতীফ বিন আবদুর রহমান আলে শায়েখ (মৃতঃ১৩৬৭ হিঃ) এটি ১৩৩৯ হিজরীতে সঙ্কলিত হয়। মওলানা ইসমাঈল গজনবী কর্তৃক ১৯২৭ সালে উর্দুতে অনূদিত হয়। উপসংহারে কতিপয় কবিতা সংযোজিত হয়েছে (১০১-১১১ পৃঃ)

৮। ফৎহুল মাজীদ শরহে কিতাবিত্ তাওহীদঃ সঙ্কলন- শেখ আবদুর রহমান বিন হাসান আলে শায়খ (মৃঃ ১২৮৫ হিঃ) তৃতীয় সংস্করণ কায়রো ১৩৫৭ হিঃ)

৯। জিলাউল আয়নায়নে ফী মোহাকেমাতিল আহমদায়ন কৃত শেখ নো'মান খয়রুদ্দীন আলুসী বাগদাদী) মৃঃ ১৩১৭ হিঃ বোলাকঃ ১২৯৮ হিঃ)।

পুস্তকটি অত্যন্ত উপকারী এবং ব্যাপক বিষয়বস্তু সম্বলিত মনে করে আমি বারংবার তা পাঠ করি। সৈয়দ রশিদ রেযা মরহুম (১৩৫৩ হিঃ) স্বীয় আত্ম-জীবনীতে এর উচ্চতম প্রশংসা করেছেন। (দেখুন মা'-আরিফ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩৮)

১০। আল ইনতেকাদুর রজীহ ফী শরহিল এ'তেকাদিস সহীহঃ কৃত- নবাব সিদ্দিক খাঁন (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ - বোলাক ১২৯৮ হিঃ জিলাউল আইনাইনের টীকায়)

১১। তমবীহু যবিল আলবাবিস সলীমাহ্ আনিল ওয়াকুয়ে ফিল আল ফাযিল মুবতাদেআতিল ওখীমাহ।

http://www.shottanneshi.com

১২। তাবরিয়াতুশ শায়খায়লিন ইমামায়নে মিন আহলিল কিযবে ওয়াল মায়নে কৃত- সোলায়মান বিন সাহমান নজদী। উভয় পুস্তিকা মিসরে ১৩৪২ হিজরীতে মুদ্রিত হয়েছে।

(খ)

১৩। কিতাবুততাওযীহ আন তাওহীদিল খাল্লাক ফী জওয়াবে আহলিল ইরাকঃ কৃত- শেখ সোলায়মান বিন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব। শাহাদৎ ১২৩৩ হিঃ- মুদ্রিত মিসর ১৩১৯ হিঃ

১৪। মিনহাজুত্ তকদীছে ওয়াত্তাসীসে ফী কশ্ফে শুবহাতে দাউদ বিন জর্জিস। কৃত- শেখ আবদুল লতীফ বিন আবদুর রহমান আলে শায়খ (মৃত ১২৯৩ হিঃ বোম্বে ১৯০৭) এতে সুলহে এখওয়ানের জবাব দেয়া হয়েছে।

১৫। সিয়ানাতুল ইন্ছান আনওছওয়াসাতিশ্ শায়খ দাহলাল কৃত- শেখ মোহাম্মদ বশীর সাহসোয়ানী (মৃঃ ১৩২৬ হিঃ) সাধারণতঃ এ পুস্তিকার লেখকরূপে শেখ মোহাম্মদ বশীরের নামই উল্লেখ করা হয়।[৩১৯] কিন্তু আমাদের নিকট যে পুস্তিকা আছে তাতে লেখকের নাম আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবদুর রহীম সিন্ধী লিখিত আছে। সম্ভবতঃ কোন কারণবশতঃ এরূপ করা হয়েছিল। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এ পুস্তিকা শেখ ইসহাক বিন আবদুর রহমান বিন হাসানের ব্যবহারে ছিল। দিল্লীস্থ ফারুকী প্রেসে ১৮৭০ সালে মুদ্রিত) এর দ্বিতীয় সংস্করণ বিশুদ্ধভাবে অতি গুরুত্ব সহকারে মিসরের আল আলমানার প্রেসে ১৮৭০ সালে মুদ্রিত। (১৩৫১ হিঃ) এবং আসল লেখকের নামই রাখা হয়েছে। প্রথম দিকে আল্লামা সৈয়দ রশীদ রেজা (মৃতঃ ১৩৫৩ হিঃ) কর্তৃক প্রণীত ভূমিকা ও পরিচয় পত্র সংযোজিত হয়েছে।

১৬। আলবয়ানুল মুবদী লে শানাআতিল কওলিল মুজদীঃ কৃত- সোলায়মান বিন সাহমান নজদী। দাহলান কৃত 'আদ্দুর রুসসনীয়াহ এর প্রতিবাদ সিয়ানাতুল ইনসান। প্রতিবাদের প্রতিবাদ আল কওলুল মুজদী ফী রদ্দে আলা আব্দিল্লাহ বিন আবদুর রহমান সিন্ধীর নামে প্রকাশিত হয়েছে। আল বয়ানুল মুবদী আল কওলুল মুজদীর প্রতিবাদ (অমৃতসর ১৮৯৮ সাল)

(গ)

১৭। আস্ সওয়ায়িকুল এলাহিয়াহ ফীররদ্দে আলাল ওয়াহ্হাবীয়াহঃ কৃত- সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী হাম্বলী (মৃতঃ ১২০৮ হিঃ)

এ্ পুস্তক শায়খুল ইসলামের ভ্রাতা সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহ্হাব কর্তৃক প্রণীত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি পরে তওবা করেছিলেন। (১১৯০ হিঃ- ইবনে গান্নাম ২-১০৮ পৃষ্ঠা)

---

[৩১৯] তারাজীমে ওলামায়ে হাদীস হিন্দ, (১) ২৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

http://www.shottanneshi.com

শায়খের বিরোধীরা এ পুস্তিকার যথেষ্ট উল্লেখ করেন কিন্তু তওবা করার কথা মোটেই উল্লেখ করেন না। পুস্তিকার এ নাম সম্ভবতঃ পরে রাখা হয়েছে কারণ সোলায়মান কর্তৃক এ পুস্তিকা প্রায় ১১৬৭ হিজরিতে একটি পত্রের আকারে হোরায়মালাবাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছিল। এর উত্তরও স্বয়ং শায়খই দিয়েছিলেন। -রওযাতুল আফকার (২১-২৩-৫২ পৃঃ)। অথচ এ সময় (১১৬৭ ওয়াহ্হাবীয়া নাম নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল না। (মিসরে মুদ্রিত সন উল্লেখ নেই) তবে এর ১৯২৮ সালের পর মুদ্রিত হওয়া সুনিশ্চিত।

মূল পুস্তকাটি অতি সংক্ষিপ্ত। এতে কতিপয় পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে। ইউসুফ ওজুদী কর্তৃক লিখিত এবং এর অধিকাংশই ইবনে সউদের প্রাধান্য লাভের পর সঙ্কলিত হয়েছে।

১৮। * তাহাক্কুমূল মোকাল্লেদীন ফী মুদ্দাঈয়ে তজদীদিদীনঃ কৃত- মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন আফালিক এহ্সায়ী (১১৭০ হিঃ)

১৯। আল ফসলুল খিতাব ফী রাদ্দে যলালাতে ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবঃ কৃত- আহমদ আলকুবানী বসরী (অনুমান ১১৫৭ হিঃ)।

২০। আস সওয়ায়েকে ওয়ার রুউদঃ কৃত ইয়াফীফুদ্দীন আবদুল্লাহ বিন দাউদ আয্যুবায়রী হাম্বলী (মৃতঃ ১২২৫ হিঃ) পাণ্ডুলিপি মশরিকী কুতুব খানা ১২৩৮।

২১। মিসবাহুল আনাম[৩২০] ও জিলাউযযেলামঃ কৃত- সৈয়দ আহমদ আবদুল্লাহ হাদ্দাদ বাআলভী। মাশরিকী কুতুব খানার পাণ্ডুলিপি নং ১২৫৮

২২।* সুলহুল ইখওয়ান মিন আহলিল ঈমান ও বয়ানে দ্বিনিল কাইয়্যিম ফী তব্রেয়াতে ইবনে তাইমীয়া ও ইবনে কাইয়্যেমঃ দাউদ বিন সোলায়মান বিন জরজিস বাগদাদী (মৃঃ ১২৯৯ হিঃ) কর্তৃক প্রণীত।

এর প্রতিবাদে শায়খ আবদুল লতীফের মিনহাজূত্ তক্দীস প্রণীত হয়েছিল, বোম্বে ১৩০৫ হিঃ। আলুসি (মৃঃ১৩১৭ হিঃ) কর্তৃকও জিলাউল আইনাইনে (৩১৫ পৃঃ) সুলহুল ইখওয়ানের লেখকের ভ্রান্ত ধারণার দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

২৩। আদদুররুস সানীয়াহ ফির রদ্দে আলাল ওয়াহ্হাবীহঃ কৃত সৈয়দ আহমদ যয়নী দহলান (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ)

---

[৩২০] হিজরী এয়োদশ শতকের আলেম মিসবাহুল আনামের লেখক ভূমিকায় এমন কতিপয় পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন যা শায়খের প্রতিবাদে রচিত হয়েছিল কিন্তু কোন পাঠ্য তালিকায় তার উল্লেখ নেই। যথা (ক) আস্সারীমূল হিন্দী ফী উনুকিন নজদীঃ কৃত- শেখ আতা মক্কী, (খ) রিসালাতুল লিশ্ শায়খ আহ্মদ মিসরী এহ্সায়ী। মিসবাহুল আনাম মুদ্রিত হয়ে গেছে। ব্রকলমন (২) ৮১৩ পৃষ্ঠা।

* এ চিহ্ন যেসব পুস্তকে দেওয়া হয়েছে তা লেখক সংগ্রহ করতে পারেননি।

http://www.shottanneshi.com

এটি অতি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। দাহলানের খুলাসাতুল কালামেও সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত হয়েছে (২১৮-২৬১ পৃঃ) মওলানা বশীর শাহসোয়ানী এরই প্রতিবাদে সিয়ানাতুল ইনছান লিখেছেন। অতঃপর এ সম্পর্কেই হজরমী কর্তৃক আল কওলুল মুজ্দী প্রণীত হয়েছে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিগত ৬০/৭০ বৎসরব্যাপী সুফতী দাহলানের গ্রন্থসমূহ দ্বারা ভ্রান্তিমূলক বিবরণের ব্যাপক প্রচার সাধিত হয়েছে।

২৪। ফৎহুল মান্নান ফী তরজিহির রাজেহে ওয়া তযঈফিয্যায়েফ মিন সুলহিল ইখওয়ানস– কৃত মোহাম্মাদ বিন নাসের হাযেমী আল নজদী (মৃঃ ১২৮৩- আতহাফুন্ নুবালা ৪১৩ পৃষ্ঠা।)

এই শেষ কিতাব মধ্যস্থতা হিসাবে প্রণীত হয়েছে যা তার নাম আতহাফের উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা অনুমিত হয়।

যেহেতু উপরোল্লিখিত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশের উল্লেখ পূর্বে হয়ে গেছে, এ জন্য প্রমাণপঞ্জীতে অধিক আলোচনা পর্যালোচনার প্রয়োজন বোধ হয়নি। আলোচনা পর্যালোচনায় প্রমাণপঞ্জী দীর্ঘায়িত হতে পারে।[৩২১]

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

---

[৩২১] উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও প্রাসঙ্গিকভাবে নিম্নবর্ণিত পুস্তকাদি মৃত্যু-সন নির্দ্ধারণে ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেঃ

ক। সিল্কুদ দুরার ফী আইয়্যানিল করনিস্সানীআশার মুরাদী কৃত।

খ। আস সাহবুল ওয়াবেলাহ্ আলা যারাইহিল হানাবেলাহ (পাণ্ডুলিপি মাশারিকী লাইব্রেরী) এর লেখকও শায়খ ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে সীমালংঘন করে গেছেন।

গ। মোজামুল মৎবোআৎ (সির্কিস)

ঘ। আল এ'লাম কৃত-জরকলী (৩য় খন্ড)

ঙ। জার্মান প্রাচ্যবিদ (C. Brockelmann এর আরবী সাহিত্যের ইতিহাস Geschichte der Arabischen Iitterature) দুই খন্ড ১৮৯৫ খৃঃ নিম্নের দুই খন্ড ১৯৩৮ খৃঃ বিশেষতঃ নিম্নের দুই খন্ডে এই কাজে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

চ। আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দু কর্তৃক হিজরী ও ইংরেজী সাল সম্পর্কীয় নকশা।

-সমাপ্তঃ–

http://www.shottanneshi.com

পরিশিষ্ট

নজ্দ প্রসঙ্গে ভ্রান্ত ধারণা

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি হাদীসে 'নজদ' নামীয় স্থানের নিন্দা করা হয়েছে, সে হেতু কোন কোন লোক শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কেও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন। আমরা ভ্রান্ত ধারণার অবসান করার জন্য এসম্পর্কে বাস্তব ঘটনার কিঞ্চিত আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। সর্বপ্রথম হাদীসের অনুবাদ উদ্ধৃত করে দিচ্ছিঃ

বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি রেওয়ায়ত করেছেন যে, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোয়া করলেন যে, আল্লাহ আমাদের সিরিয়ায় বরকত নাযেল কর, আমাদের এ্যামনেও বরকত নাযেল কর (দু'বার) অতঃপর সাহাবাগণ নজদ সম্পর্কেও দোয়া করতে অনুরোধ করলে তৃতীয়বারে ইরশাদ করলেন, তথায় ভূমিকম্প হবে, বিভিন্ন ফেৎনার সৃষ্টি হবে এবং শয়তানের শক্তি সঞ্চয়ের উপকরণ প্রকাশিত হবে, যেখানে শয়তান পরাক্রান্ত হয়ে উঠবে। (বুখারী ১০৫১ পৃষ্ঠা)।

ইমাম বুখারী যে অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা এইঃ 'রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র উক্তি পূর্ব দিক হতে ফেৎনার সৃষ্টি হবে' এর অধ্যায়। তিনি এ অধ্যায়ে তিনটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। প্রথম হাদীসে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, এটি মদীনার মসজিদে মিম্বরের নিকট অথবা মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, দ্বিতীয় হাদীসে রয়েছে যে তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সেই দিকে ইঙ্গিত করেই এ কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন।

অতএব এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে নজদ হতে ফেৎনার সৃষ্টি হবে, যেখানে শয়তানের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে তা মদীনা হতে পূর্ব দিকে অবস্থিত। খাত্তাবী বলেছেন, নজদুম মিন জেহাতিল মাশারিকে ওয়া মান কানা বিল মাদীনাতে কানা নজদুহু বাদিয়াতুল ইরাকে ওয়া নাওয়াহিহা, ওয়া হিয়া' মাশরিকু আহলিল মদীনাতে। (ফতহুল বারী (১৩) ৩৬ পৃষ্ঠা)।

মদীনাবাসীরা ইরাকের পার্শ্ববর্তী উঁচু এলাকাকে নজদ বলে জানত। এ "নজদ" সম্পর্কেই বরকতের দোয়া করার জন্য তাঁরা হযরতের খেদমতে আবেদন করেছিলেন, উপরোক্ত মন্তব্যে তাও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লামা আইনী বুখারির টীকায় বলেছেন, যেহেতু পূর্বাঞ্চলের লোক তখন কাফের ছিলেন সেই হেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই দিকেই ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন যে, তথা হতেই ইসলাম জগতে ফেৎনা ফাসাদের দারোদঘাটিত হবে এবং বাস্তবে তাই ঘটেছে। যথা জমল ও সিফফিনের যুদ্ধ অতঃপর নজদে ইরাকে হতে অভ্যুদয় ঘটেছে"।

http://www.shottanneshi.com

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র দৌহিত্র এবং বেহেস্তের যুবকদের সর্দার খারেজী দলের ইমাম হুসাইনের হৃদয়বিদারক শাহাদৎ সংঘটিত হয়েছিল কাদের দ্বারা বিশ্ব মুসলিম তা সম্যক জ্ঞাত রয়েছেন।

ফল কথা এই যে, নজদ নামে দু'টি স্থান তখন বিশেষভাবে খ্যাত ছিল। একটি নজদে এ্যামান আর অপরটি নজদে এরাক। (ফতহুল বারী (১৩) ৩৬ পৃঃ এবং মূ'জামূল বুলদান (৮) ২৫৩ পৃষ্ঠা) এবং রসূলুল্লাহ (স) এই পরবর্তী নজদেরই (যা ইরাকের নিকট অবস্থিত) নিন্দা করেছেন। নজদে এ্যামনের নিন্দা করেননি। বরং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটির প্রশংসাই করেছেন। বিশেষতঃ শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব জন্মগ্রহণ করেছেন নজদে এ্যামনের বনু তমীম গোত্রে এবং এই গোত্রের বিশেষ প্রশংসা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র পবিত্র মুখে উচ্চারিত হয়েছে- বুখারী, বজ্জার প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।[৩২২]

حياة الشيخ

المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

علامة مسعود عالم ندوي

المترجم : الشيخ منتصر أحمد الرحماني

بنغلاديش

---

[৩২২] অতএর যারা নজদের নাম শ্রবণ করা মাত্রই নাক সিটকাইয়া থাকেন এবং শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের প্রতি (অজ্ঞতাবশতঃ) বিদ্বেষ পোষণ করে থাকেন তাদেরকে উপরোক্ত আলোচনা মনোযোগের সাথে পাঠ করতে অনুরোধ জানিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানছি। ইন্উরীদু ইল্লাল ইসলাহ্ ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্। (অনুবাদক)

http://www.shottanneshi.com

Contents

http://www.shottanneshi.com